স্বামী নির্বেদানন্দ

জীবনী
ও
রচনাদি সংগ্রহ

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্ট্‌স্‌ হোম
বেলঘরিয়া, চব্বিশ-পরগণা

প্রকাশক: স্বামী সন্তোষানন্দ, সভাপতি, প্রাক্তনী সংসদ,
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্ট্‌স্‌ হোম (বিদ্যার্থী আশ্রম),
পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা চব্বিশ-পরগণা

দেবীপক্ষ ১৩৬৬

প্রাপ্তিস্থান:

অদ্বৈত আশ্রম
ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা-১৩

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্‌, কলিকাতা-১২

ঈস্টএণ্ড প্রিণ্টার্স, ৩ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড হইতে
শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।।

গীতা, ৬।৫

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।।

মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।৮

প্রস্তাবনা

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্ট্‌স্‌ হোমের পুরাতন ছাত্রদের দ্বারা গঠিত 'প্রাক্তনী সংসদ'-এর পক্ষ হইতে স্বামী নির্বেদানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার রচনা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ এই পুস্তকের প্রকাশন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার অন্যতম সার্থক প্রচেষ্টা। প্রবন্ধ ছাড়া কয়েকটি ভাষণ ও কথোপকথনের সারাংশ এবং কয়েকখানি উচ্চভাবোদ্দীপক পত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐগুলি ও রেডিও-র কথিকাটি পুস্তাকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়া পত্রিকা-পরিচালকগণ এবং 'আকাশবাণী'র কর্তৃপক্ষ প্রকাশকগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

স্বামী নির্বেদানন্দ একাধারে অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কলা ও বিজ্ঞানে সমান ব্যুৎপন্ন, চিন্তাশীল, বার্তালাপপটু এবং সুলেখক ছিলেন। সদা হাসিমুখ, সাধন-সম্পন্ন এই প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী নিজ সপ্রেম ব্যবহার ও চরিত্র-মাধুর্যে সকলেরই মনোহরণ করিতেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁহার এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিশেষতঃ, প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ তিনি বাঙ্গলার যুবক-গণের উচ্চশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে একনিষ্ঠ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা অবিস্মরণীয়। তাঁহার কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক পূর্বেই সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলিও এই পুস্তকে সংগৃহীত হওয়ায় বহু জ্ঞানপিপাসুর তৃপ্তিবিধান করিবে। কোন কোন রচনায় তাঁহার গভীর রসবোধ পরিস্ফুট। পুস্তকখানি ছাত্রগণকে স্বামী নির্বেদানন্দের পদাঙ্ক-অনুসরণে অল্পাধিক উদ্বুদ্ধ করুক, ইহাই ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা।

স্বামী [signature]

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
প্রস্তাবনা			
স্বামী নির্বেদানন্দ (সংক্ষিপ্ত জীবনী)	...	...	
রচনাদি-সংগ্রহ :			
[বাংলা]			
১। পথের আলোক	...	...	৬১
২। 'জীব শিব' ও 'কাঁচা আমি'	...	...	৬৯
৩। 'আমি'র সন্ধানে	...	...	৮৩
৪। আমি কে ?	...	...	৯০
৫। বহিঃপ্রকৃতি ও মন	...	...	৯৪
৬। 'যমেবৈষ বৃণুতে'	...	...	৯৭
৭। রসস্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ (রম্যরচনা)	...	...	১০৩
৮। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য	...	...	১২৬
৯। জগতের ভাবী সভ্যতা	...	...	১৩০
১০। মিলনোৎসব-ভাষণ	...	...	১৪১
১১। রজতজয়ন্তী-উৎসব-ভাষণ	...	...	১৪৭
১২। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব	...	...	১৫৪
১৩। নমামি ত্বাং তারিণি (গান)	...	...	১৬১
১৪। কয়েকখানি পত্র	...	...	১৬০

[ইংরাজী]

1. A Prayer 1
2. Peace or Pleasure ? 3
3. Bearing of Hinduism on International Peace 6
4. Sri Ramakrishna (*radio script*) .. 12
5. Swami Vivekananda on India and Her Mission 20
6. The Spiritual Element in Our Educational Objective 32
7. Hindu Women's Path Ahead 39
8. Shafari's Logic 46
9. School Discipline 55
10. New Era of Spiritual Renaissance .. 62
11. Stray Thoughts 67
12. A Foreword 70
13. A Few Letters 73
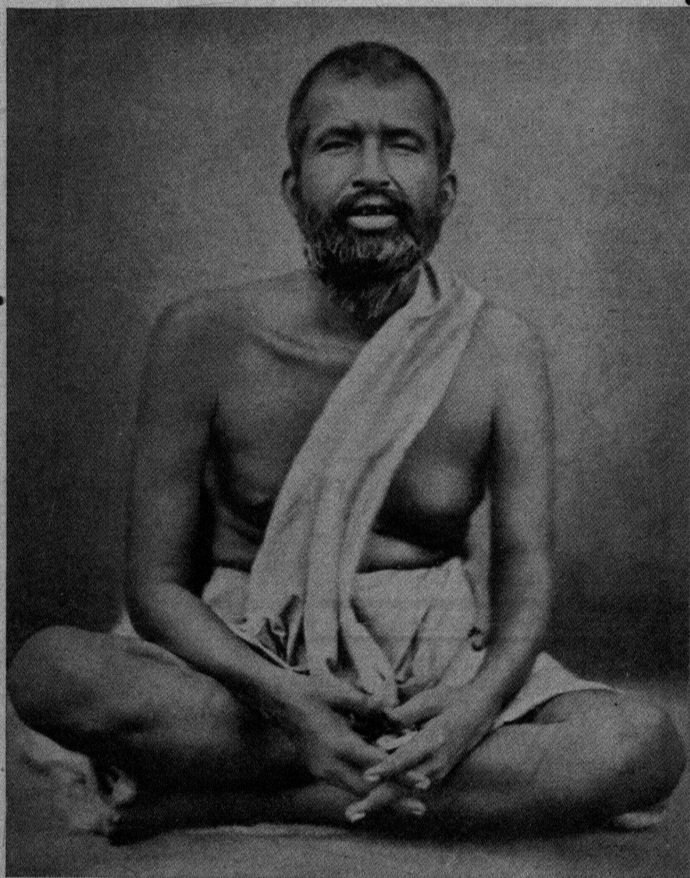
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামী নির্বেদানন্দ

[সংক্ষিপ্ত জীবনী]

উপক্রমণিকা

ভারতের ধর্মজীবন যখন অন্তঃসারশূন্য ও বাহ্যপ্রকাশ-মাত্রে প্রায় পর্যবসিত, ভারতবাসী যখন একদিকে বিজাতীয় রাজ-শক্তির অধীন ও অপর দিকে প্রাচীন আধ্যাত্মিক মহিমা ভুলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ দৈন্যজর্জরিত, মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে তাহার ভাগ্যগগনে অরুণোদয় ঘটে, গভীর অমানিশার অন্ধকার কাটাইয়া তাহার সর্ববিধ কল্যাণের পথে আলোকসম্পাত সুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান লীলা-সহায়ক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেহাবসানের পর দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তাহার দুঃখমোচনের উপায় নির্ণয়পূর্বক তদুদ্দেশ্যের সহায়তার জন্য বেলুড়মঠ স্থাপন করিয়া যান। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতমাতা সহস্র বীর-সন্তান বলি চান," বলিয়াছিলেন, "ভুলিও না—পশু নয়, মানুষ।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদগণের জীবনকালে তাঁহাদের চরণপ্রান্তে মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহায়তায় যে-সব মহাভাগ্যবান 'মানুষ' "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁহাদের অন্যতম।

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে ভাবিত হইয়া জীবন ও সমাজগঠন না করিলে ভারতের প্রকৃত কল্যাণ নাই, ভারতের কেন, জগতের কাহারই নাই, এবং ছাত্রজীবন, বিশেষ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভই ভাবগ্রহণ করিয়া জীবনে স্থায়িভাবে তাহা রূপায়িত করিবার উপযুক্ত সময়, ইহা

হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি কলেজের ছাত্রদের জন্য স্বামিজীর ইচ্ছানুরূপ প্রাচীন গুরুকুল প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের কাজটি কর্মযোগের সাধনরূপে বাছিয়া লইয়া ইহারই মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অপরিহার্য আত্মবিলুপ্তির প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।

স্বামিজীর এই ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণে এবং তৎসঙ্গে "মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবানলাভ"-এর পথে অগ্রসর হইতে তিনি কতদূর সফল হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন মুখ্যতঃ তাহারই বিবৃতি।

ঠাকুর বলিতেন, সাধু পণ্ডিত হইলে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়। এ জীবনে তাহাই হইয়াছিল। নিরভিমানিত্ব, ঈশ্বরেচ্ছায় আত্মসমর্পণ এবং বিবেক-বৈরাগ্যসমুজ্জ্বল, ত্যাগপূত, প্রেমস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচারপ্রবণতা, অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি।

"ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসিয়া জোটে।" এ ফুলটি ফুটাইয়া ঠাকুর যে সৌরভ ছড়াইয়াছিলেন, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া ধন্য হইয়াছিল বহুজন—দুঃখে সান্ত্বনা পাইয়া, বিপদে কূল দেখিয়া, অন্ধকার জীবনে অমৃতালোকের স্পর্শ লাভ করিয়া।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ভগবদ্-পাদপদ্মে নিবেদিত এই পুষ্পটির ক্রম-বিকাশ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা হইয়াছে সীমায়িত দৃষ্টিতে যতখানি দেখা গিয়াছে ততখানি মাত্র। ইহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমাদের ক্ষমতার অতীত।

পূর্বাশ্রমে

স্বামী নির্বেদানন্দজীর পূর্বনাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই বুধবার কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে হুজুরীমল লেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজকুমার মুখোপাধ্যায় বরিশাল সহরাঞ্চলে কাশীপুর

গ্রামে বর্ধিষ্ণু ও খ্যাতনামা পরিবারভুক্ত ছিলেন; পরিবারটি পুরুষানুক্রমে শক্তির উপাসক। গ্রামটি সহর হইতে দুই মাইলের মধ্যে, সম্প্রতি সহরতলী-রূপে গণ্য। রাজকুমার দীর্ঘকায়, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন, মেধাবীও ছিলেন খুব। বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পাশ করার পর এফ্. এ. পড়িতে পড়িতে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসা করিয়া ইনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন; হুজুরীমল লেনের বাড়ীটি তিনিই করিয়াছিলেন। শোনা যায় কালীঘাটে নাটমন্দিরে মায়ের চিন্তায় রাত্রিযাপনের সময় মা কালী একটি ছোট মেয়ের বেশে আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং মায়ের নিকট আর্থিক উন্নতির আশ্বাস পাওয়ার পর হইতেই রাজকুমারের ব্যবসায়ে উন্নতি দেখা দিয়াছিল। রাজ-কুমারের চার পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সর্বকনিষ্ঠ।

সুরেন্দ্রনাথ অতি শৈশবেই পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাবক হন। রাজকুমারের ব্যবসা ইনিই দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে ক্রমশঃ অবনতি দেখা দিল, ক্রমে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে হুজুরীমল লেনের বাড়ীটিও বিক্রয় করিতে হয়। তখন ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া শীতলচন্দ্র মেদিনীপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল হইয়া উঠিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতারা সকলেই মেধাবী ও কৃতবিদ্য ছিলেন। দ্বিতীয় সহোদর আনন্দমোহন মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন পড়িবার পর উহা ছাড়িয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং পরে এই চিকিৎসায় খুব সুনাম অর্জন করেন। অনেক নূতন ঔষধও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মজীবনও খুব উন্নত। কালীঘাটে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া সেখানে তিনি "কৃষ্ণকালী"র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শেষজীবনে সেখানেই থাকিতেন। সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁহার দেহান্ত হয়।

তৃতীয় সহোদর দেবেন্দ্রনাথ শিবপুর কলেজ হইতে বি. ই. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়ার বৃত্তি পাইলেও মাতার সম্মতি না থাকায় তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

মাতা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। স্বামী নির্বেদানন্দের মুখে শ্রুত বর্ণনায় ইঁহার সজ্ঞানে গঙ্গালাভকালের আচরণে যে ধীর, স্থির মনের পরিচয় পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহে বলা চলে তাহা অনেকখানি গভীর ধর্মসাধনা-প্রসূত।

৮।৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ মায়ের সঙ্গে কাশীতে কাটান। কাশী হইতে মা কাশীপুরে চলিয়া আসিলে সুরেন্দ্রনাথও সেখানে আসিয়া স্থানীয় স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন, কিছুদিন পরে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে পড়িতে থাকেন। ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ার সময় সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন ও সেখান হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বৃত্তি পাইয়া এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এই বছরের পর হইতেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা উঠিয়া যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি আই. এস্‌সি. ও ফিজিক্সএ অনার্স সহ বি. এস্‌সি. পাশ করেন। এম. এস্‌সি. ক্লাসে ভর্তি হইয়া কিছুদিন পরে উহা ছাড়িয়া দিয়া ১৯১৪ সালে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। পরে আর্থিক ও পারিবারিক অসুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইংলিশে এম. এ. পাশ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ খুব তীক্ষ্ণধী ছিলেন। আই. এস্‌সি. পরীক্ষায় তিনি সপ্তম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনে এবং পরজীবনে বহু প্রতিভাবান পুরুষ ও মহাপুরুষের সংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জগদীশচন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হেনরী ষ্টিফেন প্রভৃতির ও সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে প্রঃ সত্যেন বোস, ডাঃ মেঘনাদ সাহা,

ডাঃ জ্ঞান ঘোষ, ডাঃ জ্ঞান মুখার্জী, ডাঃ যোগীশ সিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সহিত সুরেন্দ্রনাথের বরাবর খুব হৃদ্যতা ছিল; পরবর্তী কালে বহুবার ইঁহারা স্টুডেন্টস্ হোমে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ যদিও তাঁহার এক ক্লাস উপরে পড়িতেন, তবুও বরিশালে পাঠ্যাবস্থা হইতেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। পরজীবনে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই গানবাজনা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ লক্ষিত হইত। ফুটবল, ভলিবল প্রভৃতি তিনি ভালই খেলিতেন; ৪২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভলি খেলিয়াছেন। গান কিছু গাহিতে পারিতেন, সুকণ্ঠ ছিলেন; অভিনয়ও দু-একবার করিয়াছেন। ব্যায়াম অভ্যাসের দিকেও নজর ছিল খুব। এম. এ. পড়িবার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে "ইয়ংমেনস্ ইউনিয়নের" সেক্রেটারীও ছিলেন বহুদিন। ছবিও আঁকিতেন কিছু কিছু। পরজীবনে কার্শিয়াং-এ বিখ্যাত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর সহিত কিছুদিন একবাড়ীতে বাসকালে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। এ-সময় নন্দলালবাবু এ-বিষয়ে তাঁহাকে কিছু কিছু নির্দেশও দেন। চিত্র অঙ্কনের একটি সাধারণ তথ্য এই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "বর্ণবিন্যাসকালে বর্ণসামঞ্জস্যে সন্দেহ উপস্থিত হলে 'নেচার স্টাডি' করবেন। 'নেচারের' ভেতর বর্ণবিন্যাসে কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই।" এই কালেই নন্দলালবাবু নিজের আঁকা একটি ছবি তাঁহাকে উপহার দেন। ছবিটি পরে "Cultural Heritage of India" গ্রন্থে "যোগমূর্তি গিরীশ" নামে প্রকাশিত হয়।

নীতিপরায়ণ, অমায়িক, স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা হইতেই। এম. এ. পড়ার সময় কলিকাতার কোন

অভিজাত ধনবানের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ও উচ্চতর শিক্ষালাভার্থে বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব সুরেন্দ্রনাথ তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

বি. এস্‌সি. পড়িবার সময় তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারিস্টার হইয়া সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কিছুদিন সুরেন্দ্রনাথকে সাহেবী ধরণে একত্রে বাস করিতে হয়। গতানুগতিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এই সময় তাঁহার মনে প্রবল হইয়া ওঠে এবং তাঁহার জন্য কাহারো কিছু ভাবিবার প্রয়োজন নাই, নিজের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়া লইবেন, বাড়ীতে ইহা জানাইয়া চিরদিনের মত তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" যে দেবজীবন যাপন করিবার জন্য তিনি দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন, তাহার আভাস তখন না পাইলেও গৃহত্যাগকালে একথা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে সাধারণের মত জীবন যাপন করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

গৃহত্যাগ ও পথের সন্ধান

মহৎ জীবনের এই অস্পষ্ট আলোকরশ্মি-উদ্ভাসিত পথ অবলম্বন করিয়া তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বহুবাজার অঞ্চলে ৩২ নং জেলেপাড়া লেনে ছোট দ্বিতল বাড়ীটির নীচের তলার একটি প্রকোষ্ঠে চলিয়া আসেন। বাড়ীটির ভাড়া দিতে হইত মাসিক দশ টাকা। সমাজসেবার উপযুক্ত স্বাধীন জীবন গঠন এবং পড়াশুনার ও নিজের ভরণপোষণের উপযোগী অর্থোপার্জনই তখন তাঁহার নিকটতম ভবিষ্যৎ লক্ষ্য। কোচিং ক্লাস করিয়া তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

অদৃষ্ট শক্তিকর্তৃক চালিত তাঁহার জীবনের লক্ষ্যের পূর্ণ রূপ কি, তিনি তাহা জানিতে না পারিলেও তাঁহার দেহমনরূপ যে যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁহার ভাবধারা বিতরণ করিয়া বহুজনের জীবন মধুময় করিবার আয়োজন

করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার বসিবার আসন তখন বিছানো হইয়া গিয়াছে; এবং প্রাচীন ভারতের গুরুকুলের আদর্শে ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমবায়ে ছাত্রজীবন-গঠনরূপ স্বামিজীর সমাজসেবার যে আদর্শটি সে যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ণ বিকশিত হইয়া ভবিষ্যতে বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার বীজও তখন সে হৃদয়ে উপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শীঘ্রই উহা অজ্ঞাতে অঙ্কুরিত হইল। বছরখানেক পরে ঐ বাড়ীটির দ্বিতল ভাড়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথ সেখানে উঠিয়া গেলেন। কোচিং ক্লাসের আয় তখন কিছু বাড়িয়াছে; স্থানীয় অঞ্চলের প্রায় পনেরটি ছাত্র তখন তাঁহার কাছে পড়ে, অবশ্য সকলের কাছ হইতে তিনি টাকা লইতেন না। ছাত্রেরা যে শুধু তাঁহার কাছে পড়িয়া যায় তাই নয়, সকলে খেলাধুলা এবং অবসর-বিনোদনেও সেখানে তাঁহার সঙ্গে কাটায়। ভালবাসা দিয়া তখনই তিনি তাহাদের আপনার করিয়া লইয়াছেন; তিনি শুধু তাহাদের শিক্ষক নন, আত্মীয়, বন্ধু, খেলার সাথীও। ছাত্রদের ভিতর দুজন তাঁহার সঙ্গে বাস করিত; একজন (পরে স্বামী বিশোকানন্দ) জেলেপাড়া লেনে আসিবার প্রথম হইতেই সঙ্গে থাকিতেন, গৃহত্যাগের পূর্বেও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সকলের খরচ সঙ্কুলান হইত কোচিং ক্লাসের আয় হইতে।

আর হৃদয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণের শুভপরশ লাগিল শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন আর শ্রীরাধা তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, এরূপ একটি ছবি আনিয়া দ্বিতলের ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা হইল। তাহার সামনে "জয় নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বলিয়া নিত্য সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিতে লাগিল। ছাত্রেরাও তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কীর্তনে যোগ দিত। কীর্তনের রোল কখন কখন এত উচ্চে উঠিত যে পাশের বাড়ীর জনৈক ভদ্রলোক বাড়ীওয়ালাকে

ডাকিয়া বলিতেন, "তোমার মেস কবে তুলবে?" এইরূপে দিন চলিতে লাগিল।

হৃদয় তখনও নিঃসংশয় নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তামার্জিত তীক্ষ্ণ বিচারপ্রবণতা বাল্যের সহজাত ভগবদ্-বিশ্বাসে সন্দেহ আনে, বিশ্লেষণ-পরায়ণ মন সে বিশ্বাসে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না, উহা হইতে সরিয়া আসিতেও চায় না। অশান্ত হৃদয় এ লইয়া একটা মস্ত সমস্যার সৃষ্টি করিল। এ সমস্যার সমাধান হইবে কোথায়? ভাবিয়া চিন্তিয়া সহজাত সারল্যবশে সুরেন্দ্রনাথ নিজ হৃদয়ের সমস্ত জিজ্ঞাসা প্রশ্নাকারে পর পর সাজাইয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিনের পর দিন উহা শ্রীকৃষ্ণের ছবির তলায় রাখিয়া দিতে লাগিলেন। আন্তরিকতায় ভরা কয়েকখানি পত্র শ্রীভগবানের কাছে প্রেরিত হইল। হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস, যদি তিনি থাকেন, উত্তর মিলিবেই!

আর মিলিবে না-ই বা কেন? সরল উদার কেহ আন্তরিকভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া চিরদিনই ত সাড়া পাইয়া আসিয়াছে! শীঘ্রই সে ডাক ভগবানের কানে পৌঁছিল, চিঠির উত্তরও পাইলেন তিনি অভূতপূর্ব উপায়ে।

ছেলেরা একদিন কথা তুলিল, বেলুড়মঠে যাইবে। ইতিপূর্বে দু-চারবার কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ও বেলুড়মঠে উৎসব উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজকর্ম করিয়া আসিলেও, এবং এই ব্যাপারে ভক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায়ের (কাইজার) সহিত আলাপ হওয়ায় তাঁহার কথায় তাঁহার সঙ্গে যাইয়া একবার শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আসিলেও বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের ধারণা তখনো তত পরিষ্কার নয়; ভাবিতেন, "আধ্যাত্মিক জগতের বহু ঊর্ধ্বে উঠে এঁরা বসে আছেন। আমাদের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবেন কি?" সেজন্য ছেলেদের বলিলেন, "বেলুড়ে না গিয়ে বরং দক্ষিণেশ্বরে ঘুরে এস।" ছেলেরা কিন্তু সে কথা সবটা মানিল না, বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর দুজায়গাতেই ঘুরিয়া আসিল। আসিয়াই খবর দিল, বেলুড়মঠের

একজন মহারাজ তাঁহাকে দেখা করিতে বলিয়াছেন। অপরিচিতের আপাত-দৃষ্টিতে অর্থহীন এই আকস্মিক ডাকে সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়স্তব্ধ হইলেন, চকিতের মত মানস-সায়র দুলিয়া উঠিল—"ভগবানের ডাক এল নাকি ?" যাই হোক, বেলুড়মঠে গেলেন একদিন। সেখানে প্রথম সাক্ষাৎ হইল স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে। সম্পূর্ণ অপরিচিত তিনি, তবু প্রণাম করিয়া উঠিতেই চিরদিনের পরিচিতের মত জীবনের সেই শুভলগ্নে বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কি রে, কেমন আছিস ?" প্রথম দর্শনে প্রথম কথাতেই হৃদয় অভিভূত হইল, সুরেন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তেই তাঁহাকে পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন: "ভাল আছি, মহারাজ।"

আর সব চেয়ে আশ্চর্য লাগিল তাঁহার পরের কথাগুলি শুনিয়া। কোন প্রশ্নের, কোন ভূমিকার অপেক্ষা না করিয়া তিনি অনর্গল কথা বলিয়া চলিলেন, সুরেন্দ্রনাথও স্তম্ভিত হইয়া একাগ্রহৃদয়ে শুনিয়া চলিলেন। কথা শেষ হইলে দেখিলেন, শ্রীভগবানের কাছে প্রেরিত তাঁহার পত্রের সবগুলি প্রশ্নেরই উত্তর মিলিয়াছে, মনের সব সংশয় মিটিয়া গিয়াছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগিল, পর পর যেভাবে তিনি প্রশ্নগুলি সাজাইয়াছিলেন, বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিয়া গিয়াছেন ঠিক সেই ক্রম অনুসারেই। এতদিন যে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া মাঝে মাঝে হৃদয়গগন আচ্ছন্ন করিতেছিল, উহা কাটিয়া যাওয়ায় হৃদয় আবার সহজ বিশ্বাসের বিমল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিল, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল, এতদিনের অনিশ্চিত, অস্পষ্ট জীবনপথ নবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তদের সাধারণ দুটি থাকে ভাগ করিতেন এবং বলিতেন, সকল ধর্মলাভেচ্ছুকেই সাধারণ এই দুটি ভাবের থাকে বিভক্ত করা যায়। অন্য ভাব অন্তরে থাকা সত্ত্বেও এ-দুটির

একটি ভাব সকল সাধকজীবনে বাহিরে প্রকট থাকে। একটি মদনান্তকারী, চরম ত্যাগের মূর্তি, শ্মশানবাসী শিবের ভাব; অপরটি মদনমোহন, দিব্যরূপ-সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠার মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের ভাব। প্রথম থাকের সাধকের মনে সৃষ্টিকে, পার্থিব রূপ-রসকে, সর্বতোভাবে অস্বীকার করিয়া, তাহাকে ভস্মাবশেষ করিয়া ভগবানের কাছে পৌঁছানোর প্রতি ঝোঁক প্রবলতর থাকে। দ্বিতীয় থাকের সাধকের বেশী ঝোঁক থাকে সৃষ্টির সর্বত্রই ভগবানকে দেখিয়া, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ ঈশ্বরীয় রূপসৌন্দর্যপ্রভাবে মনের সর্ববিধ নীচ বাসনাকে স্তব্ধ, মোহিত করিয়া তাহার ঊর্ধ্বে উঠিয়া শ্রীভগবানকে লাভ করার দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ অন্তরঙ্গদের অনেককেই নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, কে কোন অবতারে তাঁহার লীলাসহচর-রূপে ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সঙ্গী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ব্রজের রাখাল বলিয়া এবং স্বামী প্রেমানন্দকে শ্রীমতীর অংশ-সম্ভূত বলিয়া। সুরেন্দ্রনাথের শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির প্রতি প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ আসে, স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে পূর্বোক্ত অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে, এবং পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ হয়। পরবর্তী জীবনে দেখা যাইত স্বামী ব্রহ্মানন্দের মত ফুল-ফলের গাছ তিনি খুব ভাল-বাসিতেন, বাগান-তৈয়ারীর দিকে তাঁহার খুব নজর ছিল এবং সমস্ত জিনিস সাজাইয়া গোছাইয়া রাখা খুব পছন্দ করিতেন। কোমলতা ও অমায়িকতা তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈরাগ্যদীপ্ত, বজ্রদৃঢ় চরিত্রের বহিরাবরণরূপে চিরদিনই শোভিত ছিল।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন আসিল। ছাত্রদের জীবনকেও উহা প্রভাবান্বিত করিল। নূতন জীবন সুরু হইল। জেলেপাড়া লেনের ঘরটিকে তিনি আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণ মিশনের ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ছবি সরাইয়া কুলুঙ্গিতে "পূর্বগ শ্রীযুগসংস্কারকদিগের

পুনঃ-সংস্কৃত প্রকাশ" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি প্রতিষ্ঠিত হইল। সন্ধ্যার ভজন ক্রমে রূপ নিল বেলুড়মঠের আরাত্রিকে। সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যাও তখন বাড়িয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বই আসিয়া জমিতে লাগিল সেখানে নানাভাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিল।

এখন হইতে এম. এ. পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল সুরেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর আদর্শে নিজ জীবন গঠন করা এবং সেবার ভাব লইয়া স্বামিজীর আদর্শমত ছাত্রদের চরিত্র গঠন করা। এই কাজটি নিষ্কাম সেবা-ব্রতরূপে এখন হইতেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ এই সেবাব্রতেই সারাজীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য এই সেবাব্রত, পরে যাহা "স্টুডেন্টস্ হোম" বা "বিদ্যার্থী আশ্রম" নাম ধারণ করিয়া ক্রমবর্ধমান হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত। তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এরও ক্রমবিকাশ আমাদের লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই।

স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, প্রাচীন ভারতের গুরুকুলে যেমন ছাত্রেরা যাইয়া ঋষিদের আশ্রমে তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিয়া ছাত্রজীবন যাপন করিত, এবং ঋষিদের শিক্ষায় ও জীবনপ্রভাবে একদিকে জীবনযাত্রায় অপরিহার্য অর্থোপার্জনোপযোগী বিদ্যালাভ করিয়া এবং অপরদিকে দৃঢ় অথচ মধুর, লোককল্যাণ-ইচ্ছা-সমুজ্জ্বল, আধ্যাত্মিকতাদীপ্ত, দেবোপম চরিত্রের অধিকারী হইয়া বিদ্যাভ্যাসান্তে সমাজে প্রত্যাবর্তনপূর্বক আত্মীয়, সমাজ ও দেশের সর্ববিধ কল্যাণকারী যথার্থ মানুষ হইতে পারিত, বর্তমান যুগেও ভারতের তথা জগতের কল্যাণার্থে এদেশে আবার সেইরূপ যুগোপযোগী গুরুকুল আশ্রমের প্রবর্তন হয়। আত্মোন্নতির সঙ্গে স্বামিজীর এই আদর্শে ছাত্রজীবনগঠন করাই হইল সুরেন্দ্রনাথের জীবনব্রত এবং বিদ্যার্থী আশ্রমের

ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সে ব্রত তিনি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল পরে যখন বিদ্যার্থী আশ্রমের নামকরণ, মিশনের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন আশ্রমে পদার্পণ করিয়া সারাদিন সেখানে কাটাইয়া যান। ফিরিয়া গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখে এলাম, যেন সব ঋষি বালক।" এ ঘটনা ঘটে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে। ব্রহ্মানন্দজীর এই কথাতেই বোঝা যায় কী দুর্দমনীয় বেগে তখন সুরেন্দ্রনাথের নিজ জীবনগঠন ও ছাত্রচরিত্রগঠন চলিতেছিল।

স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই তাঁহার ভালবাসার প্রচণ্ড আকর্ষণে প্রায় প্রতি রবিবারেই সুরেন্দ্রনাথের মঠে যাওয়া-আসা চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের উদ্দীপনাময়ী বাণী, স্বর্গীয় ভালবাসা ও সঙ্গপ্রভাবে প্রতিবারেই নব বলে, নব আশায় পরিপূর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিতেন। বাবুরাম মহারাজের ভালবাসার গভীরতা-প্রসঙ্গে, পরজীবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার সাধু হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম মহারাজের ভালবাসায় সাধু হয়েছি। আপনারাও আমাকে ভালবাসেন ঠিক কথা, তবে আপনাদের ভালবাসার একটা অংশমাত্র আমি পাই আপনাদের অন্য সব ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। কিন্তু এখানে মনে হয় বাবুরাম মহারাজ তাঁর সমস্ত ভালবাসাটাই যেন আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।"

প্রথম দর্শনের দিনই স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "...তোরা মাকে দেখেছিস, ঠাকুরের দেশে জন্মেছিস, তোরা তো মহাভাগ্যবান।...দেখ, তোরা মাটি তৈরী করে নিয়ে আয়, আমরা তার ওপর একটা ছাপ দিয়ে দেবো। কি করে মাটি তৈরী করবি জানিস? সৎকর্ম, সচ্চিন্তা ও সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ কি?—এখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করবি। সৎকর্ম?—যা পারিস লোকের সেবা করবি। আর সচ্চিন্তা?—এই ঠাকুর-স্বামিজীর বই পড়বি।"

বাবুরাম মহারাজ যখন ঢাকায়, সেখানে তাঁহার নিকট একবার খবর গেল সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছেন। মঠে ফিরিয়াই ব্যাকুল হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ আসিলে যখন শুনিলেন সে খবর মিথ্যা, তখন আনন্দোৎফুল্ল জননীর মত আশ্বস্ত হইলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে সে কথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আগেই জানতাম ও বিয়ে করবে না।"

মঠে যাতায়াতের ফলে সুরেন্দ্রনাথের ক্রমে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণেরও সঙ্গলাভ হইতে লাগিল।

সাধনকাল ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ এম. এ. পরীক্ষা দিয়া পাশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে জেলেপাড়া লেনে স্থানাভাববশতঃ আশ্রম ১২১ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের পাঁচখানি ঘরসমন্বিত একটি ভাড়াবাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে, ভাড়া মাসিক ২৭৲ টাকা। পাশ করার খবর বাহির হইবার পূর্বে জোর গুজব রটিয়াছিল তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হইয়াছেন। নিজেরও খুব বিশ্বাস ছিল, ফার্স্ট ক্লাস পাইবেনই। ফল বাহির হইলে দেখা গেল সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে খুব জোর আঘাত লাগে এবং উহা তাঁহার বৈরাগ্যবর্ধনেরই সহায়ক হয়। খবর যেদিন পাইলেন তার পরদিনই সুরেন্দ্রনাথ সমস্ত পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

১৯১৭ সালে ১১৯/১ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। এতদিন পরে একটি গোটা বাড়ী পাওয়া গেল, স্থানও তখনকার পক্ষে প্রচুর। বাড়ীটির ভাড়া মাসিক ৪৫৲ টাকা হইলেও বাড়ীর মালিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ ২৭৲ টাকার বেশী ভাড়া লইলেন না, বাকী টাকাটা ছাড়িয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আরব্ধ কর্মের জন্য সাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইলেন এই প্রথম। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই বাড়ীতে থাকা হয়।

১৯১৬ সালে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে আসার পর হইতে আরম্ভ করিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে থাকার কালটি সুরেন্দ্রনাথের জীবনের উপর দিয়া ঝড়ের মত প্রবাহিত হইয়া বিপুল বেগে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে তাঁহার ধর্ম ও কর্মকে বিপুল গতিতে বন্ধুর পথের উপর দিয়া আগাইয়া লইয়া যায়। এই সময়ের ভিতরই তাঁহার যোগ ও জ্ঞানের সাধন, মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্যদীক্ষা ও সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ হয়; এই সময়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের ছয়জন পার্ষদের চরণ-ধূলিতে তাঁহার সেবাকেন্দ্র বিদ্যার্থী আশ্রম পবিত্র হয়। এই সময়েই বিদ্যার্থী আশ্রমও তার আদর্শ নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, এই সময়েই পাঠ-সমাপনান্তে কৃতবিদ্য প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা প্রায় সকলেই তাঁহার প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রত্যক্ষ করাইয়া সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশপূর্বক আশ্রমের আদর্শকে স্থায়িভাবে হৃদয়ে বহন করিয়া জীবনে তা প্রতিফলিত করিতে সুরু করে। এই সময়ের ভিতরেই আবার কয়েক মাস তিনি মরণাপন্নভাবে অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী থাকায় এবং সেজন্য আশ্রমের একমাত্র আয়ের পথ কোচিং ক্লাস বন্ধ হওয়ায় বিদ্যার্থী আশ্রমের এক সঙ্কটমুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়।

স্বামী প্রেমানন্দের সহিত প্রথম দর্শনের কিছুকাল পরে স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) সঙ্গে যখন সুরেন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয়, প্রণাম করিবার পর মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ বলিলেন, "দেখ, চাষা চাষ করে, বীজ ছড়ায়। তার জন্যে ভগবান আগে থাকতে সব ব্যবস্থা করে রাখেন, যথাসময়ে রৌদ্র-বৃষ্টি সব এসে হাজির হয়। বীজটি অঙ্কুরিত হয়ে, বড় হয়ে, যথাকালে ফলপ্রদ হয়। মানুষের জীবনেও তেমনি যার যখন যা দরকার, ভগবান আগে থেকেই তার ব্যবস্থা করে রাখেন। ঠিক সময়মত সব এসে হাজির হয়।...... স্বামিজীর রাজযোগ পড়েছ? তার 'ইনট্রোডাকশন'টা পড়ে দেখো।"

ঠিক এইদিনই মঠ হইতে জ্ঞান মহারাজ বিদ্যার্থী আশ্রমের জন্য কয়েকটি পুরাতন বই দিলেন। তাহার ভিতর স্বামিজীর লেখা রাজযোগও একখানি ছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথ উহা পড়িয়া ফেলিলেন, এবং অবাক হইয়া দেখিলেন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আধ্যাত্মিক সত্যলাভের পথ তাহাতে দেখানো হইয়াছে। মন হর্ষোৎফুল্ল হইল, পথটি ইচ্ছানুরূপ হইল। মহাপুরুষ মহারাজের ইঙ্গিত বুঝিতে বিলম্ব হইল না। শীঘ্রই তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজযোগ-সাধনের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, মহাপুরুষজীও সম্মত হইয়া সানন্দে তাঁহাকে ঐ পথে পরিচালনা করিতে সুরু করিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে সাধনপ্রসঙ্গে একদিন বলেন, "দেখ, এক রকম ছেলে থাকে, যারা সব সময় পড়ছে; অনেক পড়ে তবে তারা কোন গতিকে পাশ করে। আর এক রকম ছেলে আছে, যাদের অত পড়াশুনা করতে হয় না, সামান্য পড়েই পাশ করে যায়। তুমি সেই দলের। তোমাকে বেশী খাটতে হবে না, অল্পতেই হবে।"

স্বামিজী মঠ-মিশনের জন্য যে নিয়মাবলী করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনাদি মহারাজ একবার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর হচ্ছেন বেদ, আর স্বামিজী তার ভাষ্য। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না।"

ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণের সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ঘটিতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দের (হরি মহারাজের) নিকট হইতে জ্ঞানযোগের উপদেশ লাভ করিয়া, তাঁহার কৃপা-ছায়ায় থাকিয়া তিনি জ্ঞানযোগের সাধনা করেন। এইকালে সুরেন্দ্রনাথ গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রাদি পাঠ করিতেন, এবং নিয়মিতভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট হইতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এ বিষয়ে মনের সমস্ত সংশয় মিটাইয়া লইতেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমিটাকে একেবারে থেঁতলে না ফেললে হবে না।" সুরেন্দ্রনাথ একবার তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "মনোনাশ না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না ; আবার ব্রহ্মজ্ঞান না হলে মনের একেবারে নাশ হয় না। কোনটা আগে হয় ?" হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "Simultaneous action ; দুটোই একসঙ্গে হয়।"

একবার কাশীতে থাকাকালীন স্বামী অদ্ভুতানন্দের (লাটু মহারাজ) সঙ্গে একটি ঘটনা ঘটে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, প্রণাম করিয়া বসিবার পর কথায় কথায় বিদ্যার্থী আশ্রমের কথা ওঠে। সব শুনিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলেন, "যা করছ, খুব ভাল কাজ, বহুৎ লোকের কল্যাণ ওতে হোবে। বাকী ভগবানলাভ ওতে হবেক নাই। তাঁর জন্যে রাস্তার ভিখিরি হতে হোবে।" শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে তুফান উঠিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদের এই কথায় হৃদয় তোলপাড় হইয়া গেল। সেদিন সারারাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। এক একবার এতদূর পর্যন্ত ভাবিতেছিলেন যে ওখান হইতেই হিমালয়ে চলিয়া যাইবেন, কলিকাতায় আর ফিরিবেনই না। পরদিন সকালে লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ সুরেন, রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) হামাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ; সে যা বলবে, তাই করবে।"

তবু মন একেবারে শান্ত হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি স্থির করিলেন, বিদ্যার্থী আশ্রম ছাড়িয়া মঠে চলিয়া আসিবেন। একদিন মঠে গেলেন সিদ্ধান্ত পাকা করিতে। ঠাকুর প্রণাম করিয়া নীচে নামিতেই দেখেন, মঠ-বাড়ীর বারান্দায় বেঞ্চির উপর মহাপুরুষ মহারাজ বসিয়া আছেন। কিছু বলিতে হইল না। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "তোমায় দেখে আমার মনে হচ্ছে, যে কাজ করছ, কর। বহু লোকের কল্যাণ হবে।" সুরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "কেন মহারাজ, আমার মঠে আসার আগ্রহ কম দেখে কি এরকম

বলছেন ?" মহাপুরুষ মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিলেন, "না, তা নয়। তুমি তোমার নিজের ধাতমত একটা কাজ বেছে নিয়েছ, এ কাজে তোমার কল্যাণই হবে। এটা স্বামিজীর অভিপ্রেত কাজ। লোক অভাবে আমরা এতদিন আরম্ভ করতে পারিনি। তুমি যখন প্রভুর ইচ্ছায় আরম্ভ করে দিয়েছ, লেগে থাক। বহু লোকের কল্যাণ হবে এতে।" সুরেন্দ্রনাথ সম্মতি জানাইলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ ইতিপূর্বে তাঁহাকে মঠে চলিয়া আসিবার জন্য বলিয়াছিলেন। সে সময় সুরেন্দ্রনাথের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে ও মাতৃ-শ্রাদ্ধাদির জন্য তাঁহাকে কিছু ঋণ করিতে হয়। বাবুরাম মহারাজকে সে কথা জানাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে ঋণ শোধ করিয়া তিনি মঠে চলিয়া আসিবেন। মহাপুরুষ মহারাজের সহিত পূর্বোক্ত কথাবার্তা হইবার কালে বাবুরাম মহারাজ ঢাকায় ছিলেন। ঢাকা হইতে ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখে সব শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষের কথা দৈববাণী বলে জানবি।"

ইহার পরেও ঠাকুরের পার্ষদগণের সর্বক্ষণ সান্নিধ্য-লাভের আশায় তাঁহার মনে মঠে চলিয়া আসিবার বাসনা বহুবার জাগিয়াছে, এবং প্রতিবারই মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। এই সময় বিদ্যার্থী আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মঠে চলিয়া আসিবার ইচ্ছা সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আবার প্রবল হইয়া দেখা দেয়। একদিন মঠে যাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, "আমি মঠে থাকবো।" মহারাজ তাহা শুনিয়া বলেন, "আমি তো বাবা এখানকার কেউ না, উপরে মহাপুরুষ আছেন, তাঁকে গিয়ে বল।" ব্রহ্মানন্দজীর কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া সুরেন্দ্রনাথ মহাপুরুষজীর নিকট যাইয়া নিজ ইচ্ছা নিবেদন করেন। মহাপুরুষ মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, "যা করছ, কর। দেখ, আমি বলছি, ওখানে থেকে যাও।

বহু লোকের কল্যাণ হবে ওতে। এ কাজে তোমার 'স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রেস' মোটেই বাধা পাবে না। আমি বলছি, কোন রকম দেরী হবে না। আর যদি একটু হয়ও বা—হবে না—যদি একটু হয়ও, স্বামিজীর কাজের জন্য একটা জীবন কি 'স্যাক্রিফাইস' করতে পারবে না?" ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "তারকদা, ছেলেটিকে টেনে নিন।" মহাপুরুষ মহারাজ কহিলেন, "ও একটা ভাল কাজ করছে, করুক।" রাজা মহারাজ বলিলেন, "ও একা মানুষ হলে লাখ মানুষ করবে।" পরে বলিলেন, "ওর তো দীক্ষা হয় নি দেখছি, দীক্ষা দিয়ে দিন।" মহাপুরুষজী হাসিয়া বলিলেন, "আমি তো দীক্ষা দিই না, তুমি দিয়ে দাও।" রাজা মহারাজও হাসিয়া বলিলেন, "দেন না বলেই তো বলছি; অনেক জমেছে, কিছু ছাড়ুন।" মহাপুরুষ মহারাজ তবু রাজা মহারাজকেই দীক্ষা দেবার কথা বলায় মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অনুমতি হলেই লেগে যেতে পারি।"

সুরেন্দ্রনাথ ঘর হইতে চলিয়া আসার পর রাজা মহারাজ মহাপুরুষজীকে বলেন, "তারকদা, ছেলেটিকে আমায় দিন।" মহাপুরুষ মহারাজ শুনিয়া বলেন, "সে কি রাজা, তোমারই তো সব।" স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আবার বলিলেন, "ওকে আমি চেলা করবো, ওকে আমার চাই।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সুরেন্দ্রনাথকে কৃপা করিবার পূর্বোক্ত আগ্রহ দেখিয়া খানিকটা অনুমান করা যায়, ধর্মজগতে সুরেন্দ্রনাথ কত উন্নত আধার ছিলেন। উপযুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরূঢ় করাইবার জন্য গুরুর এইরূপ ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ধর্মজগতে বিরল নহে।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের নিকট হইতে বহুভাবে বহুবার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সেবাকার্যে সমর্থন, আশ্বাস ও আশীর্বাণী লাভ করিয়াছেন। হৃদয়ে কত বল, কর্মে কত উৎসাহ তাহাতে আসিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঠাকুরের লীলাসহচরগণের সান্নিধ্যলাভ করিলেও ইহার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথের মনে দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনবোধ আসে নাই। একবার মহাপুরুষ মহারাজকে তিনি জিজ্ঞাসাই করিয়াছিলেন, "গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?" মহাপুরুষ মহারাজ বলেন, "তোমার নিজের মনে এখন কি প্রয়োজনবোধ হচ্ছে?" উত্তরে তিনি বলেন "না।" ইহাতে মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, "তবে এখন ও নিয়ে ভাববার দরকার নাই।" এবারে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মনে দীক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দিল, এবং পূর্বোক্ত ঘটনার স্বল্পকাল পরেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট উহার জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি সম্মত হইয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন।

দীক্ষার পূর্বদিন বিকালে সুরেন্দ্রনাথ মঠে গিয়া হাজির হইলেন। তাহার দু-একদিন পূর্বে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের শরীর গিয়াছে। রাজা মহারাজকে দীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে তিনি বলিলেন, "এই দেবব্রতের শরীর গেল, মন বড় খারাপ, বাবা।" সুরেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আপনাদের আবার মন খারাপ হয় নাকি?" মহারাজ কহিলেন, "আমাদের আরো বেশী লাগে।" সুরেন্দ্রনাথ তবু বলিলেন, "তেমন আপনারা আবার মন তুলেও নিতে পারেন।" শুনিয়া মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি তো আজ আছ। কাল দেখা যাবে।" পরদিন সকালেই দীক্ষা হইয়া যায়।

"সময়ে সব হয়" এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় ছিল বলিয়া পরজীবনে অনাদি মহারাজ দীক্ষাগ্রহণের জন্য অপরকে প্ররোচিত করিতেন না। বিদ্যার্থী আশ্রমের বহু ছাত্রের দৃষ্টি তাঁহার অসীম ভালবাসা ও সহানুভূতিময় সাহচর্য এবং তাঁহার নিরভিমান জলন্ত জীবনের সংস্পর্শের ফলেই আধ্যাত্মিক জগতে আলোর সন্ধান পায় ও সেদিকে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যার্থী আশ্রমের যে-সব ছাত্র আশ্রমে আসার পর মঠ হইতে দীক্ষার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু কদাচিৎ দু-একজন ছাড়া

তিনি নিজ হইতে কাহাকেও দীক্ষাগ্রহণের কথা বলেন নাই। শুধু দীক্ষাগ্রহণ কেন, তাঁহার জীবিতকালে একত্রিশজন ছাত্র পাঠসমাপনান্তে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের কাহাকেও তিনি নিজ হইতে উহা করিতে বলেন নাই, বরং তাঁহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে উল্টা কথা বলিয়া ভালভাবে দেখিয়া লইয়াছেন, তাহাদের অন্তরের বৈরাগ্য কতখানি গভীর ও উহা স্বতঃস্ফূর্ত কিনা। তাঁহার শিক্ষাপ্রদানের অদ্ভুত ক্ষমতা ও কৌশল ছিল, এবং তাহা স্বামিজীর ভাব হইতেই গৃহীত। নিজে জীবন্ত আদর্শ দেখাইয়া, অপরের চিন্তাধারা অভ্রান্তরূপে ধরিয়া ঠিক তাহার গ্রহণযোগ্য ভাবে ও ভাষায় তিনি আলোচ্য বিষয়ের একটি চিত্তাকর্ষক নিখুঁত সুস্পষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রহবান জিজ্ঞাসুর মনে তাহা চিরমুদ্রিত হইয়া যাইত। শুধু ধর্মপ্রসঙ্গে নয়, কোচিং ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক পড়ানো, সাধারণভাবে সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই তাঁহার চরিত্রের এই দিকটি শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করিতই। বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্র ছাড়াও বাহিরের অনেকেই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া জীবনে বহু আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন।

১৯১৯ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হইতে সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যদীক্ষা-লাভ করিয়া ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য নামে ভূষিত হন। ব্রহ্মচর্যের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এখন কোথায় থাকবো ?" ব্রহ্মানন্দজী বলিয়াছিলেন, "এখন থেকে ঠাকুর হাত ধরে রইলেন, যেখানে খুসী থাক, কোন ভয় নেই।" ব্রহ্মচর্যের নাম হইতেই তাঁহার "অনাদি মহারাজ" নাম চলিয়া আসিতেছে। প্রবীণেরা কেহ কেহ তাঁহাকে "সুরেন মহারাজ" বলিয়াও ডাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বরাবর "সুরেনবাবু" বলিয়া ডাকিতেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একদিন বলিয়াই ছিলেন, "আপনি 'সুরেনবাবু' বলিয়া ডাকেন, একটু তফাৎ তফাৎ বোধ হয় তাতে।"

ব্রহ্মানন্দজী শুনিয়া জিভ কাটিয়া বলেন, "সে কি বাবা, ও কি জ্ঞান, ওটা অভ্যেস।" চিরবিদায়ের পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এ বিষয়ে তাঁহার মনের সব খেদ মিটাইয়া দিয়া যান। মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি যখন অভয় দিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতেছিলেন, "বাবারা, আমার বাবারা সব, ভয় কি বাবা?" সে সময় তাঁহাকে সর্বপ্রথম "সুরেন, সুরেন" বলিয়া ডাকিলে তিনি কাছে আগাইয়া গেলে বলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" অনাদি মহারাজকে পরে বলিতে শুনা গিয়াছে, "মাস্টার মহাশয়, ঠাকুর যখন কথা বলিতেন 'যেন অমৃতক্ষরণ হইতেছে' বলিয়া কথামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন। উহা পড়িয়াছিলাম মাত্র। মহারাজের এই সময়কার অতুলনীয়, অতি মধুর কথা শুনিয়া খানিকটা বুঝিয়াছিলাম 'অমৃতক্ষরণ' বলিতে কি বুঝায়।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই বিদ্যার্থী আশ্রমের রামকৃষ্ণ মিশনে অন্তর্ভুক্তি ঘটে। স্বামী সারদানন্দ একদিন সুরেন্দ্রনাথকে বলেন, "তোমাদের আশ্রমটি এখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে 'অ্যাফিলিয়েট' করিয়ে নাও না?" অনাদি মহারাজ কহিলেন, "অ্যাফিলিয়েট করাতে হলে আশ্রমের টাকাকড়ি, ঘর-বাড়ী এসবের দরকার হয় শুনেছি।" স্বামী সারদানন্দ তাহা শুনিয়া বলেন, "আমরা লোক দেখি, টাকাকড়ি দেখি না।" সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে বলেন, "তা হলে আপনার যা ইচ্ছা।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "তবে একটা কথা। শেষ পর্যন্ত ওখানে লেগে থাকতে পারবে তো?" অনাদি মহারাজ বলেন, "আপনি কি তার প্রয়োজন আছে মনে করেন?" শরৎ মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।" অনাদি মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "যতদিন 'ফিজিক্যালি' সম্ভব তা করবো। কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের বাধা এতে হবে না তো?" শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "না, তা হবে না, সে আমরা দেখে নেবো। কিন্তু তুমি ঠিক ভাব রেখে চলতে পারবে তো?" অনাদি মহারাজ "চেষ্টা করবো" বলায় আবার বলিলেন, "তা হলেই হল।

দেখ, যারা ভাব রেখে চলতে পারে, তাদের এখানেও হয়, আর যারা তা না পারে, তাদের হিমালয়ে জপতপ করলেও কিছু হবে না।"

ইহার কিছুদিন পরেই অক্টোবর মাসে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইল। নাম হইল, "রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ হোম"। মহাপুরুষ মহারাজ এই নাম রাখিয়াছিলেন। অনাদি মহারাজ আশ্রমটির এই নাম সার্থক করিয়াছেন। নামকরণের পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত ছেলেরা এখানে বাড়ীর মতই সহজভাবে আশ্রমের বাসিন্দাদের সঙ্গে স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী জীবনে আশ্রমের উপর বাড়ীর মত টানটুকু তাহাদের থাকিয়াই যায়। 'অ্যাফিলিয়েশন'-এর সময় স্টুডেন্টস্ হোমের বৎসরের শেষে তহবিল ছিল মাত্র তিন টাকা পৌনে ছয় আনা; স্বামী সারদানন্দের "আমরা লোক দেখি" কথার সার্থকতা বহন করিতেছে আজিকার স্টুডেন্টস্ হোম।

আশ্রমের সেক্রেটারী হইলেন তখনকার একমাত্র সাধু কর্মী অনাদি মহারাজ। এই সময় হইতে সুরু করিয়া ১৯৪৯-এ রক্তচাপাধিক্যে প্রথম স্ট্রোক হওয়ার অল্প কিছুদিন পর পর্যন্ত তিনি স্টুডেন্টস্ হোমের সেক্রেটারী ছিলেন।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে বিদ্যার্থী আশ্রম থাকার প্রথম দিকে অনাদি মহারাজের দৈহিক কঠোরতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে কোচিং ক্লাসের আয় গ্রীষ্মাবকাশকালে কমিয়া মাসিক ২৭৲ টাকায় দাঁড়ায়। এই সময় একজন মাত্র উৎসাহী ছাত্রকে আশ্রমে রাখিয়া সকলকে তিনি বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই মাস কাল সকালে শুধু দুই পয়সার ছাতু খাইয়া এবং রাত্রে নিজেরা কুকারে ভাত রান্না করিয়া খাইয়া মহানন্দে তাঁহারা কাটাইয়াছিলেন। শারীরিক কঠোরতা অভ্যাসের জন্য একবার তিনি জুতা পরাও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। খালি পায়ে বহুদিন কলিকাতায় চলাফেরা ও মঠে যাতায়াত করিতেন।

১৯১৭ সালে আশ্রমে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা হয়। উৎসাহী

ছেলেরাই পূজার ব্যয়ভার বহন ও সমস্ত কাজকর্ম নিষ্ঠার সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। সুরেন্দ্রনাথ তন্ত্রধারক ছিলেন, পূজা করিয়াছিলেন আশ্রমেরই জনৈক ছাত্র (পরে স্বামী বিশোকানন্দ)। আশ্রমে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এই একবারই হইয়াছিল। কালীপূজা এই সময় হইতে সুরু করিয়া প্রতি বছরই হইয়া আসিতেছে, এবং স্টুডেন্টস্ হোমের সবচেয়ে বড় উৎসব এটি। ছেলেরাই এখনো উৎসবের কাজকর্ম সব পরিচালনা করে। ইহাতে তাহাদের কর্ম-পরিচালনা শক্তির উন্মেষ হয় এবং সারারাত্রি ভজন ও পূজায় অতিবাহিত করায় যে বিমল আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদ পায় তাহার ছাপ খুব গভীরভাবে মনে বসিয়া যায়। এইসব দিক দিয়া স্টুডেন্টস্ হোমের কাছে এই উৎসবটির মূল্য খুবই বেশী। ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে কালীপূজার দিন অনাদি মহারাজ "নমামি ত্বাং তারিণি" গানটি রচনা করেন।

১৯১৯ সাল হইতেই স্টুডেন্টস্ হোমের কাজের চাপ অনাদি মহারাজের উপর খুব ভালভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল। এখন পর্যন্ত সব কাজ একাই তাঁহাকে করিতে হইত। খুব প্রতিভাশালী ছিলেন তিনি। নিজে সায়েন্সের ছাত্র হইলেও আশ্রমের ও বাহিরের ছেলেদের কোচিং ক্লাসে সায়েন্সের বিষয় ছাড়া ইকনমিক্স, ফিলজফি প্রভৃতিও খুব যোগ্যতার সহিত পড়াইতেন। ইহার উপর নিয়মিত 'সোসিও-রিলিজিয়াস' ক্লাস হইত প্রতি শনিবারে। তা ছাড়া সৎপ্রসঙ্গ লাগিয়াই থাকিত; সদ্ভাব ও সচ্চিন্তা বিতরণকারী, তীক্ষ্ণধী, বৈজ্ঞানিক চিন্তামার্জিত, অতি উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্ম বিচার-পরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও বিবেকবৈরাগ্যসম্পন্ন ত্যাগদীপ্ত, উৎসাহী বক্তা, এবং শ্রদ্ধাবান, অকপট জ্ঞানলিপ্সু ছাত্র,—কেহই ইহার জন্য সময়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, যখন হউক অবসর মিলিলেই হইত। তা ছাড়া তিনি নজর রাখিতেন ছেলেদের প্রত্যেকের কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অগ্রগতির প্রতি, এবং কখনো আদর করিয়া, কখনো প্রশংসা করিয়া ও কখনো বা তিরস্কার করিয়া

পদে পদে সস্নেহে তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন ও উৎসাহিত করিতেন আলাদা আলাদা ভাবে। তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, সে সব প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের প্রত্যেকের নিকটেই ইহা সুবিদিত। সর্বোপরি অর্থচিন্তাও বড় কম চাপ ছিল না। এসময়কার ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া ক্রমে ৯ জন হয়, ৭ জনের সমস্ত খরচ স্টুডেন্টস্ হোম বহন করিত। এতদিন পর্যন্ত কোচিং-এর আয়ই ব্যয়-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন ছিল। পূর্বে স্বামী শর্বানন্দ দু-একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এভাবে একজনের আয়ের উপর নির্ভর করিলে এ ধরণের 'পাবলিক ইনস্টিটিউশন' এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকে। সেকথা অনাদি মহারাজের মনে দাগ কাটিলেও এ পর্যন্ত আশ্রমে চাঁদা দিবার লোক যোগাড় হইয়াছিল মাত্র তিনজন।

এ সময় একজন সহকর্মীর খুব প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন অনাদি মহারাজ। এ বিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে ১৯২০ সালের প্রথম দিকে একদিন বলেন, "দেখ বাবা, স্টুডেন্টস্ হোমের ভালর জন্য তোমাকে একটা কথা বলবো। স্টুডেন্টস্ হোমের জন্য কর্মী যেন ওখান থেকেই তৈরী করে নিও। তাতে শান্তি ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে, আশ্রমের উন্নতির জন্য তা বিশেষ দরকার।" ঐ কথা অনাদি মহারাজের মনে গাঁথিয়া গেল এবং দৈববাণীর মত অদূর ভবিষ্যতে তাহা সফল হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর একজন ছাত্র (পরে স্বামী সন্তোষানন্দ) সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তাঁহার সহকর্মীরূপে আশ্রমে রহিয়া গেলেন। ঠিক প্রয়োজনের সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ইহা ঘটিল। ইনিই অক্লান্ত উদ্যমে সাধারণের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিলেন এবং এ কাজে এতদূর সফল হইলেন যে শীঘ্রই অনাদি মহারাজকে অর্থের জন্য আর কোচিং ক্লাস করিতে হইল না, সাধারণের প্রদত্ত অর্থ হইতেই উহার ব্যয় সঙ্কুলান হইতে লাগিল। দুবছর পরে আর একজন ছাত্র (স্বামী বিশোকানন্দ) পাঠ সমাপনান্তে সঙ্ঘে

যোগদান করিয়া আশ্রমের কর্মীরূপে রহিয়া গেলেন। বছর খানেকের মধ্যে আরো চারিজন ছাত্র সঙ্ঘে যোগদান করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরূপে অন্যত্র (বিদ্যাপীঠ) চলিয়া যান। এইরূপে পরে পরে বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বামী নির্বেদানন্দের জীবনকালে এখান হইতে যাঁহারা সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা একত্রিশজন, তন্মধ্যে নয়জন এখনো স্টুডেন্টস্ হোমে কর্মীরূপে রহিয়াছেন।

১৯২০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পাদস্পর্শে স্টুডেন্টস্ হোম ধন্য হয়। (ইহার পূর্বে ১৯১৭ সালে স্বামী শিবানন্দজী একদিন আসিয়া স্টুডেন্টস্ হোমে কাটাইয়া যান।) সেদিন এখানেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়াছিলেন। সারাদিন এখানে কাটাইয়া বিকালে তিনি অন্যত্র গমন করেন। বেশ ঘটা করিয়া সেদিন উৎসব হয়, এবং আজ পর্যন্ত সেই শুভ দিনের স্মরণে ২৪শে ডিসেম্বর এখানে উৎসব হইয়া আসিতেছে। "মহারাজের উৎসব" নামে উহা পরিচিত। রাজা মহারাজের সঙ্গে মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী, রামলাল দাদা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র), সাহিত্যিক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছিলেন। এই দিনটি অনাদি মহারাজের ও স্টুডেন্টস্ হোমের কাছে দিব্য-আনন্দোজ্জ্বল একটি বিশেষ দিন। এ বিষয়ে স্বামী নির্বেদানন্দের নিজের বর্ণনা এখানে দিতেছি : "ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং এসেছেন, অতি মধুর, মহিমোজ্জ্বল, উৎসাহপ্রদ সেদিনের স্মৃতি মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে।......সারাদিন বাড়ীটি দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে ছিল। কোন মোহিনী শক্তিতে এরকমটা হল নাকি?

অন্তস্তল আলোড়িত হয়েছিল, মানবতা ও দেবত্বের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে চির আনন্দ ও মাধুরীর রাজ্য যেন একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছিল। সে সময়ের জন্য ভগবান হাতের নাগালের ভেতর এসে যাননি

কি? তবু এ ইন্দ্রজাল নয়, সত্যিই সেদিন ভগবানের আশীর্বাদ এই শিশু প্রতিষ্ঠানটির মস্তকে বর্ষিত হয়ে তাকে পুণ্যতর করেছে।'

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকাকালীনই বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরো পাঁচজন পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্টুডেন্টস্ হোমে পদধূলি প্রদান করেন।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আদর্শ-গঠন

১৯২০ সালের ভিতরেই বিদ্যার্থী আশ্রমের আদর্শ সুস্পষ্ট রূপ নিল। স্বামী নির্বেদানন্দেরই কথা উল্লেখ করিতেছি: "১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'অ্যাফিলিয়েশন' এর পর হইতেই এটি কি ধরণের শিক্ষা-কেন্দ্র ও তার কার্য-বিস্তারের সীমাই বা কতদূর, তার আবছা ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে রূপ নিচ্ছিল। এটা স্টুডেন্টস্ হোম; বাংলা দেশের হিন্দু জাতির সব বর্ণেরই ছাত্রদের, বিশেষ করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের, নিজের বাড়ী এটি। কলেজের ছাত্রদের ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়-লব্ধ শিক্ষা ছাড়া তাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আরো যা সব দরকার ছাত্রাবাসের নিজস্ব শিক্ষা দিয়ে তার সেই সব দিক কতখানি পূরণ করা যায়, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে তা দেখতে হবে এখানে। ছেলেদের নিজ শক্তিতে বিশ্বাসী করাতে হবে। বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ধারার সঙ্গে প্রাচীনকালের গুরুকুল-প্রথার ভাব ও আদর্শগুলিকে যতদূর সম্ভব খাপ খাইয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্থকরী বিদ্যালাভ ও আধ্যাত্মিক বিদ্যালাভ—অপরা ও পরা বিদ্যার্জন—একসঙ্গেই চলবে। ছাত্রদের অন্ত-র্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত করার পথে সাহায্য করতে পারে—এমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে এখানে। শিক্ষাকে মূলতঃ মানুষ গড়ার উপযোগী

* Silver Jubilee Souvenir (1941)

করে তোলার জন্য আচার্য বিবেকানন্দ যে ভাব দিয়ে গেছেন—তা থেকেই এর উদ্ভব।"* প্রথম হইতেই অজ্ঞাতে এই ভাবাদর্শে বিদ্যার্থী আশ্রম গড়িয়া উঠিলেও এতদিনে উহা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল এবং সমাজের বরেণ্য বহু চিন্তাশীল মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু ১৯২০ সালে স্টুডেন্টস্ হোম দেখিতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া অনাদি মহারাজকে বলেন, "জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলুম বলা চলে, কিছুই করতে পারলুম না, সারা জীবন বুনোহাঁস ধরার বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করেছি। আপনি ঠিক পথেই চলেছেন।...... 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়ে গেলাম, এখান থেকে যে-সব ছাত্র পাঠাবেন, আমার কলেজে তারা সকলেই বিনা বেতনে পড়তে পারবে।"* ১৯২২ সালে স্যর মন্মথনাথ মুখার্জী প্রথম বিদ্যাথা আশ্রমে আসয়া এর আদশ ও ভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমার জীবনের একটা বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সফল হতে চলেছে দেখছি।" ১৯২০ সালে শ্রীযুত কুমার-কৃষ্ণ দত্ত (সলিসিটার) বিদ্যার্থী আশ্রম পরিদর্শনে আসেন, এবং তার স্বল্পকাল পরেই ৫০০৲ টাকা 'ডোনেশান্' দেন। এই টাকা এবং স্যর দেব-প্রসাদ সর্বাধিকারীর প্রচেষ্টায় আহৃত আরো ৫০০৲ টাকা দিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমের স্থায়ী তহবিলের সূত্রপাত হয়। ১৯২৩ সালে লালগড়ের রাজা শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সাহসরায় আশ্রমের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ৪০০০৲ টাকা দান করায় 'বিল্ডিং ফণ্ড'-ও খোলা হয়। স্টুডেন্টস্ হোম-এর কথা তখন সাধারণের মধ্যে কয়জনই বা জানে? কত ছোট তখন সে প্রতিষ্ঠান। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সন্তানগণ অনাদি মহারাজের এই ভাব ও আদর্শ এবং তার রূপায়ণ বিদ্যার্থী আশ্রমের কল্যাণ-গৌরবময় ভবিষ্যৎকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার অন্তরকে প্রথম হইতেই উৎসাহিত ও আশীর্বাদ-স্নিগ্ধ করিয়া

Silver Jubilee Souvenir (1941)

আসিতেছিলেন, এখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে উহার সমর্থন ও কার্যকরী অর্থসাহায্যের সূত্রপাতে তাঁহার সেবাব্রতে অধিকতর গতিবেগের সঞ্চার হইল। দুইজন উৎসাহী ত্যাগী কর্মীকে তিনি সহায়করূপেও পাইয়াছেন ততদিনে।

১৯২১ সালে অনাদি মহারাজের ও স্টুডেন্টস্ হোমের জীবনের এক সঙ্কট-মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। অনাদি মহারাজ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় দুইমাসকাল ইহাতে শয্যাশায়ী থাকেন। ব্যাধি খুব প্রবল হয়, জীবনের কোনও আশা ছিল না। কয়েক মাস পূর্বে প্রথম কর্মীটি (স্বামী সন্তোষানন্দ) না আসিলে এ সময় কি অবস্থা হইত ভাবা কঠিন। রোগীর চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা এবং কোচিং ক্লাস বন্ধ হওয়ার দরুণ স্টুডেন্টস্ হোমের অর্থসমস্যার সমাধান—এই দুটি গুরুতর কাজের জন্যই যেন ঠিক সময়মত দৈবী যোগাযোগে তিনি আসিয়াছিলেন। ভালবাসা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এ দুটি কাজ তিনি সুসম্পন্ন করিলেন। অবশেষে অনাদি মহারাজ নীরোগ হইয়া উঠিলেন। এই কর্মীটি এবং স্বামী বিশোকানন্দ কর্পোরেশন স্ট্রীট হইতে সুরু করিয়া স্বামী নির্বেদানন্দের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার বন্ধু ও কার্যের প্রধান সহায়করূপে বিদ্যার্থী আশ্রমে রহিয়াছেন এবং ১৯৫০ সালে আশ্রমের "ম্যানেজিং কমিটি" গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বিদ্যার্থী আশ্রম পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব ইঁহাদের তিনজনের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

১৯২৩ সালে অনাদি মহারাজ স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করিয়া স্বামী নির্বেদানন্দ নামে ভূষিত হন। এই বৎসরই কর্পোরেশন স্ট্রীটের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া ৬/এ, বাঁকারায় স্ট্রীটে স্টুডেন্টস্ হোম উঠিয়া আসে। এখানে আসিবার পর বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা ১৪ জন পর্যন্ত হয়; তাহার ভিতরে দুজন মাত্র নিজ ব্যয় বহন করিত। টাকা দিয়া দু'এক-

স্বামী নির্বেদানন্দ

(জুলাই ১৯, ১৮৯৩—নভেম্বর ১৫, ১৯৫৮)

জন ছাত্র পূর্ব হইতেই আশ্রমে থাকিয়া পড়াশুনা করিত বটে, তবু শুধু দরিদ্র ছাত্রদের জন্যই এ প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তোলার দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে থাকার সময় প্রথম দিকে একদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে স্বামী নির্বেদানন্দকে বলেন, "যদি আন্তরিকভাবে আশ্রমে থেকে কেউ চরিত্র গঠন করতে চায়, বড়লোকের ঘরে জন্মানোটাই তার পক্ষে একটা বাধা হওয়া উচিত না।" কথাটি মনে লাগিল এবং তখন হইতে এদিকে নজর দেওয়া হইল। তবে, পরে প্রতিষ্ঠানটির স্বরূপই না পাল্টাইয়া যায়, সেজন্য নিয়ম করা হইল, নিজের খরচ বহন করিতে পারে এরূপ ছাত্র এখানে ভর্তি করা হইলেও তাহাদের সংখ্যা মোট ছাত্রসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী যেন কখনো না হয়। আজ পর্যন্ত বিদ্যার্থী আশ্রমে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। স্বামী নির্বেদানন্দ বহুবার বলিয়াছেন যে এর ফলে জীবন-গঠনে উভয়বিধ ছাত্রেরাই লাভবান হয়। এই উভয়বিধ ছাত্রদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া ও আশ্রমজীবনের খুঁটিনাটি অন্যান্য সর্বব্যাপারেই কোন বৈষম্যের আত্ম-প্রকাশের পথ ভালবাসায় তিনি রুদ্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্টুডেণ্টস্ হোমে চাকর, পাচক, ছাত্র, কর্মী সকলেই সাম্য ও ভালবাসার ডোরে বাঁধা একটি অখণ্ড পরিবার। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা, দৌর্বল্য ও অহঙ্কার-প্রসূত বিরোধের ঘূর্ণাবর্ত এখানে কদাচিৎ উঠিয়াছে, এবং উঠিলেও তাঁহার ভালবাসার চির-অপরাজেয় শক্তিতে স্বল্পকাল মধ্যে তাহা শূন্যে বিলীন

বিদ্যার্থী আশ্রমের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ

বাঁকারায় ষ্ট্রীট হইতে ১৯২৫ সালে ৭নং হালদার লেনের বাড়ীতে বিদ্যার্থী আশ্রম উঠিয়া যায়, সেখান হইতে ১৯৩১ সালে স্থানান্তরিত হয় ৭/১,

অভয় হালদার লেনে। এখানে স্বল্পকাল থাকিবার পরই ১৯৩২ সালে আশ্রম দমদম এরোড্রোমের পার্শ্বস্থ গৌরীপুরের নিজস্ব আবাসে চলিয়া যায়।

স্টুডেণ্টস্ হোমের শিক্ষাদর্শের যে সুস্পষ্ট রূপ কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে থাকাকালীন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অধিকাংশই বাস্তবে পরিণত হয় এবং বাকীটুকু সম্পূর্ণ হয় গৌরীপুরে যাইয়া। এই কালের মধ্যে তাঁহার সহকর্মীদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগ ও প্রচেষ্টায় বিদ্যার্থী আশ্রম সাধারণের কাছে আরও পরিচিত হয়, সাধারণের অর্থসাহায্যও লাভ করে বহুভাবে। এই সময়েই, ১৯২৬ সালে "অ্যাডভাইসরী বোর্ড" গঠিত হয়, সভাপতি হন স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। এই কালের ভিতরই নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থানে আশ্রমকে লইয়া যাইবার পরিকল্পনা, সম্ভাবনা ও সফলতা ঘটে। এই সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ১৯২৩ সালে একবার বাঁকারায় ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্বল্পকালের জন্য গিয়াছিলেন এবং ১৯২৫ সালে শেষবার তিনি হালদার লেনের বাড়ীতে পদধূলি দেন ও সেখানে রাত্রিবাস করেন। ঠাকুরের পার্ষদগণের মধ্যে এই একজনই স্টুডেণ্টস্ হোমে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন স্বামী সুবোধানন্দজী এবং মঠের প্রায় ৫০ জন সাধু। সারাদিন উৎসবের মধ্যে মহানন্দে কাটে। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতা 'শ্রীম' আশ্রমে পদধূলি দিয়া আনন্দ আরও বাড়াইয়া তোলেন।

শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে স্টুডেণ্টস্ হোমের ছাত্রদের জীবনধারা স্বামী নির্বেদানন্দ যেভাবে যে বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আস্তে আস্তে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, এখানে তার কিছু উল্লেখ করা গেল। মনকে শান্ত, একাগ্র করিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদ লাভের জন্য ছেলেরা ভোরে উঠিয়া ঠাকুরঘরে ভজনাদি করিবে। তখন একটী ঘর এজন্য আলাদা রাখা হইত। পরে গৌরীপুরে আশ্রম চলিয়া গেলে কিছুদিন একটি টিনের বাংলোয়

ঠাকুরকে রাখা হয় ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবের সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী সারদানন্দের নিকট স্বামী নির্বেদানন্দ ঠাকুর-সেবার মারফৎ ছেলেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যার্থী আশ্রমে ঠাকুরের নিত্যসেবার ব্যবস্থা চালু রাখিবার প্রস্তাব তুলিলে স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরঘর রাখবে, তবে খুব কম করে খরচ করবে।" ঠাকুরঘর মোছা, পূজার বাসনমাজা, পূজা প্রভৃতি ঠাকুরসেবা সংক্রান্ত সব কাজই এবং নিজেদের থাকার ঘর পরিষ্কার রাখা, ড্রেন ও পায়খানা পরিষ্কার করা, বাজার করা, খাওয়ার পর নিজেদের থালা পরিষ্কার করা প্রভৃতি সব কাজই ছেলেরা করে, স্বাবলম্বী হইবার জন্য। অবশ্য পড়াশুনার সময় যাহাতে বেশী নষ্ট না হয়, সেজন্য রুটীন করিয়া সকলের মধ্যে কাজগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, রুটীন ছেলেরাই করে। বিভিন্নদিকে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য ছাত্র-পরিচালিত একটি হস্তলিখিত মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে "যুগবাণী" নাম লইয়া এই পত্রিকাটির আবির্ভাব এবং দুবছর পরে এর নাম হয় "বিদ্যার্থী"। সম্প্রতি তিন বছর পর পর পত্রিকাটির মুদ্রিত প্রকাশনও বাহির হইতেছে। হৃদয়ের বিস্তারের জন্য, কেহ অসুস্থ হইলে তাহার সেবাও করে ছেলেরা। বিকালে খেলাধুলার পর মন্দিরে আরাত্রিকে যোগ দেয় সকলে। গৌরীপুরে আশ্রম স্থানান্তরিত হইবার সময় হইতেই কলেজ হইতে ফিরিবার পরে খেলার আগে কিছুক্ষণ বাগানে কাজ করাও আরম্ভ হয়। স্বামী নির্বেদানন্দকে এবিষয়ে বলিতে শোনা গিয়াছে, "কলেজে সারাদিন কাটিয়ে 'আমি কুলীমজুরদের থেকে আলাদা শ্রেণীর' এই বোধরূপ যে অভিমানের বিষ মনে জমেছে, একটু কোদাল হাতে করে কাজ করলেই তা কেটে যাবে।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রথম দিকে ছেলেরা একদিন কুলির কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছিল। হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদহ

স্টেশন ও মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে সবাই যখন ফিরিয়া আসিল, দেখা গেল কয়েক আনা মাত্র রোজগার হইয়াছে, কারণ জামা খুলিয়া গেলেও ভদ্র চেহারা দেখিয়া কেউ মোট দিতে রাজী হয় নাই। তবু ছাত্রেরা যে আত্মতৃপ্তি সেদিন পাইয়াছিল, তাহার তুলনা আছে কি? বহুদিন এম. এ. ক্লাসের ছেলেরাও বই, ফল প্রভৃতি রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইয়াছে, কলিকাতায় আশ্রম থাকিবার বিভিন্ন সময়ে। বিদ্যার্থী আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ ও এই সব কাজ ছেলেরা করিত সানন্দচিত্তে, নিজেদের কল্যাণ হইবে ইহাতে, ভিতরের সত্যকার মানুষটি ফুটিয়া বাহির হইবে, এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া।

স্বামিজীর কথাগুলিকেই স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁহার মানুষ গড়ার শিক্ষা-পদ্ধতির মূলসূত্ররূপে লইয়া কার্যে পরিণত করিতেন—"Maximum of freedom, minimum of restraint," "চারাগাছকে টেনে বাড়াবার কারো সাধ্য নেই, নিজেই সে বাড়বে। তার পুষ্টির উপযোগী সার দেওয়া এবং বাইরের উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বেড়া দিয়ে রাখা, এইটুকু মাত্র আমাদের করণীয়।" এই ভাব নিয়েই তিনি ছেলেদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিয়া, তাহাদের দৃষ্টি সবদিকে সর্ববিষয়ে প্রসারিত করাইয়া কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, সব কিছুই ভালভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহাদের ভিতব নিজে বুঝিবার শক্তি ও ইচ্ছা জাগাইয়া দিতেন। এ কাজও হইত খুব স্বাভাবিকভাবে; সহজ সরলভাবে জীবন-প্রবাহের সঙ্গে এ সব চিন্তাধারা তিনি মিশাইয়া দিতেন। আর, সর্বোপরি নিজ জীবনে আদর্শ রূপায়িত করিয়া চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতেন। স্বামিজী বলিয়াছেন, আদর্শ জীবন গঠনই হইল সবচেয়ে বড় প্রচার কার্য। স্বামী নির্বেদানন্দের বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রদের চরিত্র গঠন কার্যে তাঁহার প্রচেষ্টার সফলতা স্বামিজীর এই কথাটিকে মূর্ত করিয়া রাখিয়াছে। দৈনন্দিন কাজকর্মও নিজে করিয়া দেখানোর দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আশ্রম তখন

গৌরীপুরে। সেখানে একবার পরপর দুই তিন দিন মেথর না আসায় পায়খানায় আর যাওয়াই চলে না, এইরূপ অবস্থা হয়। সকলেই ভাবিয়া অস্থির, কি করা যায়। হঠাৎ দেখা গেল অনাদি মহারাজ চুপিচুপি নিজেই ময়লা পরিষ্কারে লাগিয়া গিয়াছেন। কাহারো নজর পড়ায় তাঁহাকে অবশ্য আর কিছু করিতে হইল না। নিজেদের রুটীনের কাজ কেহ করিতে ভুলিয়া গেলে, তাহাকে কিছু না বলিযা অনাদি মহারাজ নিজেই তাহা করিয়া রাখিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সব কারণে ছেলেদের মনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা জাগিত নিয়ম ঠিকমত পালন করিয়া চলার। জোর করিয়া কাউকে কিছু করিতে বলিতেন না তিনি, নিয়ম পালনের ভাল দিকটার ছবি মনে আঁকিয়া দিতেন আর নিজে অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই অপরকে সহজে স্বাধীনতা দিতে পারিতেন। অবশ্য শক্তিমান সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন তাহার চলার পথে, যাহাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া নিজের কোন গুরুতর অকল্যাণ সে টানিয়া না আনে। তাঁহার অবগতি বা অনুমোদনের জন্য কোন কিছু বলিলে তাঁহার মুখে প্রথম কথা শোনা যাইত, “বেশ তো”, প্রয়োজন হইলে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন তার পরে, এবং অবাঞ্ছিত হইলে অতি ধীরে ধীরে কথায় কথায় ইচ্ছাটির অসঙ্গতি বা খারাপ দিকটি দেখাইয়া দিতেন। ফলে মন সানন্দে প্রতিনিবৃত্ত হইত ঐ বিষয় হইতে। এই অবাধ স্বাধীনতা প্রদানের ফলেই সহজে, নিজেরই অজ্ঞাতে সকলে তাঁহার অনুগত হইত, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। এর পরে শিক্ষা-প্রদানের পথটি হইত অতি মসৃণ। সামাজিক সর্ববিধ প্রধান মতবাদ ও ঘটনার সঙ্গে সকলকে পরিচিত করাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন তিনি, এবং সেগুলির ভালমন্দ উভয় দিকই পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিতেন।

সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর পাঠ ও ভোজনান্তে আশ্রমের কর্মী ও ছাত্রেরা

সকলে এক জায়গায় সমবেত হইয়া গল্পগুজব করা হয়। এটির নাম "নক-টারন্যাল গ্যাদারিং"। ইহার উদ্দেশ্য হইল, সারাদিন নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকার পর এই সময় একসঙ্গে মিশিলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা গভীরতর হয়, সমাজপ্রিয়তা বাড়িয়া যায়। শরীর খুব খারাপ হইবার পূর্ব পর্যন্ত অনাদি মহারাজ এই গ্যাদারিং-এ নিত্য উপস্থিত থাকিতেন। পরে ব্লাডপ্রেসার ও ডাইবিটিস বাড়িয়া যাওয়ায় শেষের দু-তিন বৎসর ইহাতে সব সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা আর শরীরে কুলাইত না, রাত্রে বিশ্রাম করিতে যাইবার পূর্বে সহকর্মীরা আসিয়া তাঁহার সহিত "গুড্‌নাইট" করিয়া যাইতেন। জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাল ভাবগুলির মিলন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করিতেন তিনি, তাহা হইতেই এই "শেকহ্যাণ্ড" করিয়া "গুড্‌নাইট" জানানোর প্রথাটির উদ্ভব হয়। আশ্রম পরিত্যাগের বহু বৎসর পরেও বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থীর মুখে শোনা গিয়াছে, এই গ্যাদারিংএর আনন্দের কথা তাহারা তখনো ভুলিতে পারে নাই। গভীর চিন্তাপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার সহিত হালকা গল্প, খেলাধুলা প্রভৃতিকে জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া কিভাবে যে মানুষের অন্তরের প্রচ্ছন্ন শক্তি ও দেবত্বকে বাহিরে লইয়া আসিতে হয়, তাহা তিনি খুব ভালভাবেই জানিতেন ও করিতে পারিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ব্যক্তিত্বকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া বিপরীত চিন্তার খরস্রোতে ভাসমান কতজনকেই না সস্নেহ করে মধুময় কল্যাণের পথে তুলিয়া আনিয়াছেন, কতজনকেই না দ্বিধার অন্ধকারে পথের আলোক দেখাইয়াছেন! আর, স্টুডেণ্টস্ হোমে প্রধানতঃ দরিদ্র ছাত্রদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া কত দুঃস্থ পরিবারেই না কল্পনাতীত আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি আনিয়া দিয়াছেন! তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, হৃদয় ছিল খুবই প্রসারিত, আধ্যাত্মিকতায় ছিলেন সাধারণ হইতে বহু ঊর্ধ্বে। মহাপুরুষ মহারাজ কথায় কথায় একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "You have become one with us. —তুমি আমাদের

সঙ্গে একেত্তর হয়ে গেছ।” তাঁহার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। যাহার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলিতেন, তখন তাহার মনের সমভূমিতে নামিয়া আসিয়া তাহারই ভাবে ও ভাষায় জিজ্ঞাস্য সব বিষয়েরই উত্তর দিতে পারিতেন। এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বড় বিরল।

স্টুডেন্টস্ হোমের ছেলেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি সবচেয়ে বড় আশ্বাস পাইয়াছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে। একদিন স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁহাকে বলেন, “মহারাজ, ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা বা শিক্ষার দিকগুলির ব্যবস্থা না হয় আমরা করলাম ; কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিক দেখবে কে ?” স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, “কেন, তোমরাই দেখবে।” অনাদি মহারাজ তাহাতে বলেন, “আমরা আর কতটুকু দেখতে পারি ? স্বামী তুরীয়ানন্দ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি বলছি, ঠাকুর স্বয়ং ওখানে থেকে ছেলেদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ দেখবেন।”

বিদ্যার্থী আশ্রমের দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বরাবর। এখানকার ছাত্রদের শরীরের জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সবই পরিমাণমত যাহাতে তাহারা পায়, সেজন্য গভীর চিন্তা দিয়া তিনি গোটা সপ্তাহের খাবারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং আর্থিক সঙ্কটের সময়ও ইহার বেশী ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া হয় নাই কখনো।

স্টুডেন্টস্ হোমের সাপ্তাহিক খাদ্য-তালিকায় তিনি প্রথম হইতেই একটি চমৎকার জিনিস প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। এদেশে বহুলোককে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া উদরপূরণ করিতে হয়, সকলের দুবেলা তাহাও জোটে না। এ কথা মনে রাখিয়া তাহাদের প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবেলা সহানুভূতি দেখাইবার জন্য এখানে শুক্রবারদিন সকালে শুধু ডাল আর ভাত খাওয়া হয়, অন্য কোন তরকারি না। একটি ভাল অভ্যাসও হইয়া যায় ইহাতে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের জন্য আহৃত চাঁদা হইতে নিজের ও কর্মীদের জন্য খরচ

যত কম করিয়া পারা যায়, সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন সর্বদা। এই উদ্দেশ্যে আশ্রম হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের আয়ে "Self-help Fund" নামে একটি স্থায়ী তহবিল তিনি খুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের জন্য অসুখের সময় ঔষধ ও পথ্যাদি বাবদ যে-সব খরচ হইত, আশ্রমের তহবিল হইতে তাহা লইতে হয় নাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় বাহির হইতে তাহার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল।

সময়ানুবর্তিতায় বিশেষ নিষ্ঠা ছিল তাঁহার। নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যখন যাহা করিবার কথা, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাহা সমাধা করিতেন, অনিবার্য কারণ ছাড়া কখনো তাহার এদিক ওদিক হইতে দিতেন না। আশ্রমের দৈনন্দিন কাজকর্মও যাহাতে ঠিক সময়মত সব হয়, সেদিকেও সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন।

নিজের জন্য অপরের উদ্বেগ সৃষ্টি যাহাতে না হয়, সে বিষয়েও তিনি সতর্ক ছিলেন খুব। তাঁহার অসুস্থতা বা অবসাদ সমীপাগত কাহারো মনে সাধারণতঃ ছায়াপাত করিত না। বহুবার তাঁহার মুখে শোনা গিয়াছে, ঠিক ঠিক সাধুর একটি গুণ হচ্ছে, "যস্মাৎ নোদ্বিজতে লোকাঃ"। মনের স্থৈর্য তিনি সর্বাবস্থায় বজায় রাখিতে পারিতেন বলিয়া আশ্রমের সঙ্কটের সময়েও দুশ্চিন্তার পরিধি অতি অল্প পরিসরের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিত, সহকর্মীদের সকলের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাইবার অবকাশ কখনো পাইত না। আশ্রমে একটা আনন্দময় সহজ জীবনের পরিবেশ বজায় রাখিতে সব সময় চেষ্টা করিতেন তিনি।

সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল চির-মধুর। সকালে চায়ের সময়, দুপুরে খাওয়ার পর এবং বিকালে চায়ের আসরে সকলে নিয়মিতভাবে মিলিত হইতেন তাঁহার ঘরে। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ বাহিরে বসিতেন, তখনো কথাবার্তা হইত কিছু কিছু। সন্ধ্যারতির কিছু পরে তাঁহার ঘরে আবার

সকলে সমবেত হইতেন ; শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও ঠাকুরের সন্তানদের কথা হইতে কিছুক্ষণ ধরিয়া পাঠ হইত এ সময়। এ বৈঠকের নাম দিয়াছিলেন তিনি মৌতাতের আসর। সোদপুরে থাকার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া এটি চলিয়া আসিতেছে।

গৌরীপুর আশ্রমে

চরিত্রবান ও সমাজের কল্যাণক্ষম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছাড়া আরও কিছু অর্থকরী বিদ্যা লাভ করিতে পারে, সেদিকেও স্বামী নির্বেদানন্দের দৃষ্টি বরাবর সজাগ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্টুডেন্টস্ হোম প্রসঙ্গে একদা তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত ছিল, এবং ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতরূপেই তিনি সে কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—"খুব ভাল কাজ। তবে বাড়ীটা ছোট। আশ্রমের নিজস্ব একটা জায়গা চাই। জেলায় জেলায় এরকম প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার। কলিকাতার প্রতিষ্ঠানটি বড় রকমের হবে, তার সঙ্গে একটা ভোকেশন্যাল কলেজও থাকবে।" এই প্রেরণাতেই কলিকাতায় থাকাকালীন মাঝে মাঝে বই ও ছবি বিক্রী করা, টেলারিং ক্লাস, বই বাঁধানো, খাতা বাঁধানো প্রভৃতি নানাভাবে অর্থোপার্জনের পথের সঙ্গে ছেলেদের পরিচিত করানো হইতেছিল। ১৯২০ সালে সোদপুরে এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ীতে একবার তিনজন ছাত্র চাষীদের মত গামছা পরিয়া, টোকা মাথায় দিয়া, লাঙ্গল ধরিয়া চাষও করিয়াছিল। ১৯২৮ সালে গৌরীপুরে শ্রীরজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত ২০ বিঘা জমি পাওয়া গেলে সেখানে ডেয়ারী ও সবজি চাষের ব্যবস্থা করা হইল। স্টুডেন্টস্ হোমের ভোকেশন্যাল শাখা খোলা হয় এইভাবে। ১৯৩২ সালে গৌরীপুরে স্টুডেন্টস্ হোম স্থায়িভাবে উঠিয়া আসিবার পর, সেখানে ধান, কড়াই, সবজি ইত্যাদির চাষ এবং সাবান, ফিনাইল প্রভৃতি তৈয়ারী করার

কাজও আরম্ভ হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের এ-সব বিষয়ে অনুরাগী ও শিক্ষিত করান এবং বিদ্যার্থী আশ্রমের কিছুটা খরচ এইভাবে তুলিয়া লওয়া। স্বাধীনচেতা স্বামী নির্বেদানন্দ চাকুরী করার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করা পছন্দ করিতেন বেশী এবং ছেলেদের এবিষয়ে উৎসাহিতও করিতেন। গৌরীপুরে থাকাকালীন কখনও কখনও তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, "চাকুরী করার চেয়ে বিড়ি বেঁধে টাকা রোজগার করাও ভাল।"

১৯২২ সাল হইতেই বিদ্যার্থী আশ্রমের স্থায়ী বাসস্থানের কথা ভাবা হইতেছিল এবং এজন্য জমিও খোঁজা হইতেছিল। একবার যাদবপুরে ও একবার মতিঝিলে জমির সন্ধান পাওয়া যায়, নানা কারণে তাহা কেনা হয় নাই। ১৯২৮ সালে গৌরীপুরের জমি লওয়া হইল ভোকেশন্যাল শাখার জন্য। জমি অনুন্নত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। স্বামী বিশোকানন্দ জমি-উন্নয়নের ভার লইয়া সেখানে গমন করেন, একটি চালাঘর তৈয়ারী করিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে কাজ আরম্ভ হয়। প্রাক্তন বিদ্যার্থী ৺ফণিভূষণ মান্না সঙ্গে ছিলেন। কিছুদিন পরে আর একজন প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীমথুরামোহন দে, তাঁহার কাজে সাহায্য করার জন্য সেখানে যান ও দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। শীঘ্রই জমি-ভরাট প্রভৃতি শেষ হইলে ডেয়ারী ও ফার্ম খোলা হইল।

জমির উন্নত চেহারা দেখিয়া এ সময় এখানে বিদ্যার্থী আশ্রমকে স্থায়িভাবে আনার কথা হয় এবং শীঘ্রই আরো জমি কিনিয়া সেইমত কাজও আরম্ভ হয়। লালগড়ের রাজা শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সাহসরায়ের প্রদত্ত অর্থে ঐ জমি-সংলগ্ন গভর্ণমেন্টের আরো প্রায় তেষট্টি বিঘা জমি কেনা হইল। ১৯২২ সালে নিজ পুত্রকে কর্পোরেশন স্ট্রীটের আশ্রমে রাখিতে আসিয়া স্বামী নির্বেদানন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ফলে ক্রমে তাঁহার মঠে যাতায়াত ও মহাপুরুষ মহারাজের কৃপালাভ ঘটে। পরে স্বামী নির্বেদানন্দের উৎসাহ ও পরিকল্পনায় লালগড়ে তিনি একটি অবৈতনিক

বিদ্যালয় খোলেন। বিশ্রামের জন্য স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁহার অতিথি হইয়া লালগড়ে বহুবার কাটাইয়া আসিয়াছেন।

গভর্ণমেন্টের জমি ছাড়া গৌরীপুরে আরো কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া ঘরবাড়ী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইল। এখানে আশ্রমের ঘরবাড়ী কি ধরণের হইবে, কোন বাড়ী কোথায় বসিবে, স্বামী নির্বেদানন্দ কত চিন্তা দিয়া যে তাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই বোঝা যায়: "সব দিক দিয়েই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে হবে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মত, অথচ আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের উদ্দেশ্যও তাতে সিদ্ধ হওয়া চাই। এ একটা সমস্যা, এবং প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি গঠনেই এ সমস্যার সমাধান করে চলতে হবে। এই হল মূল পদ্ধতি, বাকী সব কিছুকেই এর সঙ্গে সুসামঞ্জস্যে মিলিয়ে দিতে হবে। কাজেই সাইট-প্ল্যান ও বাড়ীর ডিজাইনের সময় চিন্তা করতে হবে খুবই সাবধানে। এর গুরুত্ব খুব, কারণ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ রূপ এতে ফুটে উঠবে। বাইরের চেহারার সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সেজন্য যতদূর সম্ভব সতর্ক হয়ে দেখতে হবে যাতে স্টুডেন্টস্ হোমের মূলগত ভাব ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ছাপটি এর বাইরের চেহারায় ফুটে ওঠে। সামান্য অদলবদল করেও কলকাতার হোস্টেলগুলির অনুকরণ করলে ঘনবসতিপূর্ণ শহরের ইউরোপীয়ান হোস্টেলের মতই তা দেখাবে, এবং শ্রমশিল্পের যুগপ্রারম্ভে পাশ্চাত্যে দ্রুতবর্ধমান নাগরিক সভ্যতা যে চেহারা নিচ্ছে, তার ছাপ এতে থাকবেই। কিন্তু শান্ত, গভীর চিন্তার যে জীবন, তার পরিবেশের জন্য মোটেই উপযোগী নয় এধরণের হোস্টেলগুলি। তা ছাড়া স্থানসঙ্কুলানের প্রশ্ন যেখানে ওঠে না, সেখানে এধরণের বাড়ী করার কথাও উঠতে পারে না। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মূল ভিত্তি হল আধ্যাত্মিকতা। সাদা-সিদে জীবন যাপন করে উচ্চচিন্তা করাই হল এর মূল সুর। প্রাচীনকালে এইজন্যই শহর হতে দূরে পল্লীর অঙ্কে কুঁড়েঘর দিয়ে গড়া ব্রহ্মচর্য আশ্রম

স্থাপিত হত। আজও তা না হবার কোন কারণ নেই। উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তি ও স্বজ্ঞা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে পবিত্রতা ও মনের একাগ্রতা অর্জন করা, আর তার জন্য এরূপ পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। পবিত্রতা ও মনের একাগ্রতা ছাড়া শিক্ষার কোন অর্থই হয় না। পবিত্রতা, অনাড়ম্বর জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরতা এবং শান্ত ধ্যান হতে যা কিছু পাওয়া যায়, ছাত্রজীবনে তার সবকিছু পরিবেশন করার বিশেষ আয়োজন করতে হবে। অল্পস্বল্প কঠোরতাও সে জীবনে খাপছাড়া নয়। এর ফলে শারীরিক ও মানসিক দুরকমেরই সবলতা আসবে। এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেই তবে যুবকেরা উচ্চ ও মহৎ আদর্শ আঁকড়ে থেকেও জীবনের জটিলতার সম্মুখীন হবার মত শক্তিতে বলীয়ান হতে পারবে। এইটেই হচ্ছে প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মূলগত ভাব। ......অলডাস হাকস্‌লি বলেছেন, সারা জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাপদ্ধতি এইভাবেই ঢেলে সাজা দরকার। বাস্তবিকই, আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য আশ্রম জুড়ে দেবার সময় এসে গেছে। স্টুডেন্টস্ হোমের সাইট-প্ল্যান ও বাড়ীর ডিজাইন করার পেছনে এতসব ভাববার জিনিস ছিল।"*

পরিকল্পনা পাকা করিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ারীর কাজ সুরু হইল। ঠিক হইল মাঝখানে একটি পুকুর থাকিবে, তার দুপাশে ছেলেদের থাকার বাড়ী, একদিকে মন্দির ও অন্যদিকে লাইব্রেরী। কুঁড়েঘরের কথা ছাড়িয়া দিতে হইল দীর্ঘদিন স্থায়িত্বের কথা ভাবিয়া। অবশ্য স্বামী নির্বেদানন্দ এবং অপর কয়েকটি সাধুকর্মীও গৌরীপুরে বহুদিন কুঁড়েঘরে বাস করিয়াছেন। ব্লাডপ্রেসার ধরা পড়ার পর তাঁহাকে পাকাবাড়ীতে লইয়া আসা হয়। ঝিলের পাড়ের নির্জনতায় কুটীরের সেই ছবিটি এখনও বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থীর মনে জ্বলজ্বল করিতেছে। সেখানে কত উচ্চ প্রসঙ্গের মারফৎ

*Silver Jubilee Souvenir (1941)

কতজন না বহু বিপরীত জীবনাদর্শের অরণ্যে অমৃতের পথের সন্ধান পাইয়াছে। জীবনের বহু মধুময় স্মৃতির সঙ্গে তপোবন-কুটীরবাসী এই ঋষির সঙ্গলাভের স্মৃতি অনেক প্রাক্তন বিদ্যার্থীর কাছে এখনো পরম সম্পদ।

কুঁড়েঘরের পর টিনের ঘরের কথা ভাবা হইল। একটা বাংলোও তোলা হইল এইভাবে। গৌরীপুরে আশ্রম উঠিয়া আসার পর মন্দির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি ঠাকুরঘররূপে ব্যবহৃত হইত। এইসব নানারকম করিয়া দেখিবার পিছনে আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। এখানকার বেশীর ভাগ ছেলে পল্লীগ্রাম হইতে আসিবে। কম খরচে কিভাবে সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণ করা যায় এখান হইতে তাহার একটি ধারণা ও তৎপ্রতি অনুরাগ তাহারা লইয়া যাইবে। সবদিক ভাবিয়া বর্তমান যুগের উপযোগী ছোট ছোট পাকা-বাড়ী করাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

অবশেষে আশ্রমের পরম সুহৃদ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় নিজ ব্যয়ে একটি ছোট পাকাবাড়ী করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে উহা খুব জমকালো নয়, সাদাসিধা ধরণের এবং উহার নির্মাণ-ব্যয়ও বেশী হইবে না। বাড়ীটি মনের মত হইল এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী ছাত্রাবাস গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীতে তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরে চারজন করিয়া ছাত্র থাকিতে পারে। এইরূপ ছোট ছোট অনেকগুলি বাড়ী থাকিবে, একটু দূরে দূরে।

ছেলেদের থাকিবার একটি বাড়ী (শিবানন্দধাম), একটি রান্না ও ভাঁড়ার ঘর, একটি টিনের বাংলো এবং কয়েকটি কুটীর নির্মিত হইলে ১৯৩২ সালের ২২শে অক্টোবর কলিকাতা হইতে গৌরীপুরে বিদ্যার্থী আশ্রম উঠিয়া আসে। ছাত্রসংখ্যা তখন ২৪ জন। স্বামী নির্বেদানন্দ এখন হইতে প্রধানতঃ গৌরীপুরেই বাস করিতেন। কলিকাতায় ৫৩নং গড়পাড় রোডে একটি ছোট দ্বিতল বাড়ী শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস দান করিয়াছিলেন আশ্রমকে। সেখানে

দুজন কর্মী ও তিনজন ছাত্র থাকিতেন। কাজের জন্য স্বামী নির্বেদানন্দকে সেখানে যাইয়া মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করিতে হইত। কয়েক বছরের মধ্যেই আরো কয়েকটি বাড়ী ও মন্দির তৈয়ারী হইয়া গেল। ১৯৩৭ সালে বিদ্যার্থী আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ঠাকুরকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৮ সালের মধ্যে পর পর আরো কয়েকটি বাড়ী ওঠে।

গৌরীপুর আশ্রম শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনজন পার্ষদের পদধূলি লাভ করিয়াছিল—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজীর।

গৌরীপুরে থাকাকালীন ১৯৩৬ সালে স্বামী নির্বেদানন্দের রক্তের চাপবৃদ্ধি ধরা পড়ে। ইতিপূর্বে বহুদিন হইতে তিনি অনিদ্রায় ভুগিতেছিলেন। তাছাড়া টাইফয়েডের পর হইতেই শরীর খানিকটা জখম হইয়া গিয়াছিল। কাজের তো আর বিরাম ছিল না, অর্থচিন্তারও না। একবার শরীর সারানোর জন্য তাঁহাকে নিয়মিত দুধ খাইতে বলা হয়। কিন্তু তিনি খান নাই, বলিয়াছিলেন, "ছেলেদের সকলের জন্য যখন দুধের ব্যবস্থা করতে পারবো তখন খাবো।" বছর খানেক পরে বহুমূত্র রোগও দেখা দিল। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে চলিতে লাগিল। হোমিওপ্যাথির উপর তাঁহার খুব আস্থা ছিল, নিজেও এ চিকিৎসা জানিতেন কিছু কিছু। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অসুখ সারাইবার নিজস্ব ক্ষমতা ছাড়া আরো একটি দিক তিনি দেখাইতেন। এদেশের লোকের যা আয়, তাহাতে কতজনের পক্ষেই বা ব্যয়সাধ্য অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করানো সম্ভব? হাজার হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। যদি হোমিওপ্যাথিতে তাহাদের আস্থা আনা যায়, তাহা হইলে অসুখের সময় প্রায় সকলেই একটা চিকিৎসাধীনে থাকার সুযোগ পায়। ১৯৪৯ সালে সোদপুরে থাকাকালীন প্রথম "স্ট্রোক" হইয়া

জীবন সংশয়াপন্ন হওয়ার পরেও কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীনে ছিলেন।

১৯৩৬ সালে অসুখ ধরা পড়ার পর উহা ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল। পরবৎসর বহুমূত্র রোগও দেখা দিল। আশ্রমের অন্যান্য চিন্তার সহিত অর্থচিন্তাও তখন খুব প্রবল। অসুখের ভিতরই ১৯৩৬ সালে বেলুড়মঠ হইতে প্রস্তাব আসিল, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঠ হইতে যে প্রকাশন বাহির করা হইবে (Cultural Heritage of India) তাহাতে মঠের পক্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও মঠ-মিশনের ভাবধারা সম্বলিত যে অংশ থাকিবে, তাহা স্বামী নির্বেদানন্দ লিখিলে সকলের মনোমত হয়, সকলের ইচ্ছা, তিনিই উহা লিখুন। শরীরের দিক দিয়া ডাক্তাররা নিষেধ করিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ অজিতনাথ রায়চৌধুরী এতদূর পর্যন্ত বলিলেন, "ঠাকুরের কাজের জন্য যদি উনি জীবন বিসর্জন দিতে চান তো আমাদের আর বলবার কি আছে?" ইহা সত্ত্বেও ঠাকুরের ইচ্ছা জানিয়া তিনি ঐ কাজ আরম্ভ ও সুসম্পন্ন করিলেন। অধ্যায়টির নাম হইল "Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance"। ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্লাডপ্রেসার সত্ত্বেও শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কয়েকস্থানে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হয়।

১৯৪১ সালে গৌরীপুরে বিদ্যার্থী আশ্রমের "সিলভার জুবিলী" উৎসব হইল। যে সেবাব্রত তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, একমাত্র ভোকেশন্যাল কলেজ ছাড়া তার আর সব দিকই তখন ভালভাবে চালু হইয়া গিয়াছে। স্থায়ী বাসস্থানে স্টুডেন্টস্ হোম উঠিয়া আসিয়াছে, ছেলেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী তিনি যেমন চাহিতেন সেইভাবেই তখন সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। ছেলেদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করিয়াছেন, কয়েকজন এম. এ., এম. এস্‌সি. পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস

ফার্স্ট'ও হইয়াছেন, কর্মজীবনে বিশেষ প্রলোভনের ক্ষেত্রেও নিজ আর্থিক অসচ্ছলতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সৎপথে থাকিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন অনেকেই, আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে অনেকে অবিবাহিতও রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর কেহ কেহ নিজের সামর্থ্য ও উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণ ও শিক্ষায় নিয়োগ করিয়াছেন, এবং বেশ কয়েক-জন ঠাকুরস্বামিজীর কাজে সারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে "Silver Jubilee Souvenir" নাম দিয়া একখানি সচিত্র গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। স্বামী নির্বেদানন্দ উহাতে বিদ্যার্থী আশ্রমের ইতিহাস লিখিয়া দেন।

১৯৪০ সালে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্বামী নির্বেদানন্দ স্বামী সন্তোষানন্দকে সঙ্গে লইয়া একবার তীর্থভ্রমণে বাহির হন। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি ঘুরিয়া প্রায় মাস আড়াই পরে তাঁহারা গৌরীপুরে ফিরিয়া আসেন। সাধুজীবনে ইহাই তাঁহার একমাত্র দীর্ঘভ্রমণ। ইহার বহুপূর্বে কাশীধামে তিনি কয়েকবার গিয়াছিলেন। পরে পুরীতে একবার যাওয়া হয়।

Silver Jubilee উৎসবের আনন্দের পরই স্বামী নির্বেদানন্দকে একটি ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে সামরিক প্রয়োজনের জন্য বিদ্যার্থী আশ্রমের জমি ও ঘরবাড়ী গভর্ণমেণ্ট দখল করিয়া লওয়ায় আশ্রম সেখান হইতে সরাইয়া আনিতে হয়। প্রথমে গভর্ণমেণ্ট উহা ভাড়া লইয়াছিল, কয়েক বৎসর পরে একেবারে কিনিয়া লয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর চিরনির্ভরশীল স্বামী নির্বেদানন্দ বাহ্যদৃষ্টিতে এই বিষম দুর্ঘটনার ভিতরেও ঠাকুরের মঙ্গলময় ইচ্ছাই দেখিতে পাইলেন এবং একটুও বিচলিত না হইয়া ধীরস্থিরভাবে অটল, নিপুণ কর্ণধারের মত দীর্ঘদিনব্যাপী বহুবিধ দুর্যোগের মধ্যে বিদ্যার্থী

আশ্রমকে পরিচালিত করিয়া লইয়া চলিলেন। এত দিনের এত চেষ্টায় গড়া জিনিস হঠাৎ স্বপ্নের মত শূন্যে যেন বিলীন হইতে চলিল। কিন্তু তিনি ইহা গড়িয়াছিলেন, এ-বোধ তাঁহার সত্যই ছিল না, "ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়েছে" এই বোধই হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সেজন্য বাহিরের কেহ ত দূরের কথা, যাঁহারা দিনরাত্রি তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন তাঁহাদেরও কেহ কখনো তাঁহাকে এজন্য বিমর্ষ হইতে বা দুঃখপ্রকাশ করিতে দেখেন নাই।

১৯৪১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী সারদানন্দজীর তিথিপূজার দিন গৌরীপুর আশ্রমের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া আশ্রম পরিত্যাগ করা হয়। তাহার পূর্বেই ছাত্রদের অধিকাংশকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অল্প কয়েকজন ছাত্র ও কয়েকজন কর্মী শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ জিনিসপত্র বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের একটি গৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল দূরে টাকী আশ্রমের নিকট হাসনাবাদে একটি পুরাতন বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। উহা মেরামত না করিয়া বাস করা চলে না বলিয়া প্রথমে টাকী আশ্রমে উঠিয়া মাসখানেক পরে সেখানে যাওয়া হয়।

গভর্ণমেণ্ট আশ্রম দখল করার প্রস্তাব দিবার কিছুদিন পূর্ব হইতেই রেঙ্গুনে বোমা পড়া সুরু হওয়ায় কলিকাতার বাসিন্দারা চঞ্চল হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছিলেন। বিদ্যার্থী আশ্রম এরোড্রোমের একেবারে সংলগ্ন। কাজেই বোমা পড়ার ভয় সেখানে সর্বাগ্রে। এ অবস্থায় কি করা যায় তাহা ভাবিয়া প্রস্তাব উঠিয়াছিল, ছেলেদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া দুএকজন সাধুকর্মীমাত্র জীবন সংশয়াপন্ন করিয়াও আশ্রমের জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ঠাকুর-সেবার জন্য সেখানে থাকিয়া যাইবেন। আরো নানারূপ ভাবা যাইতেছিল, কিন্তু কোনটাই তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না। আর একটি মস্তবড় ভাবিবার বিষয় ছিল। সকলের এই সঙ্কটের সময় সাধারণের নিকট হইতে অর্থ

সংগ্রহই বা কতখানি হইবে? এইসব সমস্যার কথা গভীরভাবে ভাবিয়া স্বামী নির্বেদানন্দ গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে যেদিন প্রস্তাব আসে সেইদিন সকালেই ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন, "গভর্ণমেণ্ট আশ্রমের ঘরবাড়ী ভাড়া নেবার প্রস্তাব করলে সব সমস্যার সু-সমাধান হয়।" বিকালেই গভর্ণমেণ্টের লোক আসিল প্রস্তাব লইয়া। অনাদি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছেন।"

বিদ্যার্থী আশ্রমের যাযাবর জীবন ও পুনর্বাসন-কালে

আশ্রমের আবার ভাড়াবাড়ীতে বাস সুরু হইল। কথায় কথায় স্বামী নির্বেদানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন, "যে ভাব এখানে গড়ে উঠেছে, সেইটেই হল আসল আশ্রম। সেটা যতক্ষণ আছে, ঘরবাড়ী জমিজায়গা থাক আর নাই থাক, আশ্রমের সবই রয়েছে জানবে।" ১৯৪২ সালে ৮৯/সি, গড়পাড় রোডে ৫৩নং-এর বাড়ীটির কাছে আর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। অল্প কিছুদিন পরে সেখান হইতে ২৭৯/৩ নং আপার সার্কুলার রোডে অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ীতে উঠিয়া আসা হইল। ১৯৪৩ সালে এখানে হাসনাবাদ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া আসা হয়। এই সময় বিদ্যামন্দির হইতে জিনিসপত্রও সব ফিরাইয়া আনা হইল। পরে এই বৎসর ডিসেম্বরে সেখান হইতে ২০নং হরিনাথ দে রোডে একটি বড় বাড়ীতে স্টুডেণ্টস্ হোম উঠিয়া আসে এবং ১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিল বেলঘরিয়ায় চলিয়া আসিবার পূর্ব পর্যন্ত এ বাড়ীটি রাখা হইয়াছিল। হরিনাথ দে রোডে আসার পর ৫৩নং গড়পাড় রোডের বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় হাসনাবাদের বাড়ীটির আর প্রয়োজন ছিল না। এই সময় আশ্রমের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীরামচন্দ্র সুর তাঁহার সোদপুরের একটি নূতন বাড়ীতে যতদিন প্রয়োজন আশ্রম স্থানান্তরিত

করিয়া থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর হাসনাবাদ ছাড়িয়া দিয়া সেখানে চলিয়া আসা হয়। এখন হইতে প্রায় ১৪ জন ছাত্র সোদপুরে থাকিত, বাকী প্রায় ৩৬ জন হরিনাথ দে রোডে।

যতদিন হাসনাবাদে আশ্রম ছিল স্বামী নির্বেদানন্দ কলিকাতা হইতে যাইয়া মাঝে মাঝে সেখানে বেশ কিছুদিন করিয়া কাটাইয়া আসিতেন। শরীর ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাওয়ায় কলিকাতার হৈ চৈ তাঁহার ঠিক সহ্য হইতেছিল না। পরে ঠাকুরের ইচ্ছায় সোদপুরের বাড়ীটি পাওয়া গেলে সেখানেই বেশীর ভাগ সময় থাকিতেন, কাজের জন্য সপ্তাহান্তে কলিকাতায় আসিয়া দুইদিন কাটাইয়া যাইতেন।

এই সময় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গৌরীপুর আশ্রমের ভাড়া বাবদ মাসে ১০০০৲ টাকা করিয়া পাওয়া যাইতেছিল বলিয়া স্টুডেন্টস্ হোম পূর্বের মত চালানো সম্ভব হইয়াছিল। এই কালের একটি ঘটনায় অনাদি মহারাজের বিশেষ হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই কালের ভিতরই ঠাকুরের ইচ্ছায় স্টুডেন্টস্ হোমের আর্থিক অবস্থা স্থায়িভাবে অনেকখানি সচ্ছল হইয়া আসে। তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভাড়ার টাকা পাওয়া সত্ত্বেও স্টুডেন্টস্ হোমের ছাত্রসংখ্যা পূর্বের মত রাখা সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। এই সময় দুইজন সহৃদয় ভদ্রলোক অনাদি মহারাজের কাছে প্রস্তাব আনিলেন, তাঁহারা জনসেবার জন্য ২০,০০০৲ টাকা দান করিতে চান। কিন্তু কিভাবে উহা খরচ করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। একবার ভাবিতেছেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার জন্য দিবেন, আবার ভাবিতেছেন ইহা তো সাময়িক ; বিদ্যার্থী আশ্রমে টাকাটা দিলে সেখানে স্থায়িভাবে বহু জনের সেবায় লাগিবে। সেইজন্য বিদ্যার্থী আশ্রমকে টাকা দেওয়ার জন্যই বেশী ঝোঁক হইতেছে। সব বলিয়া অনাদি মহারাজের মতামত জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন ঘরে আগুন লাগে, তখন আর সব ভুলে

আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হয়। বহু লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে—দেবার যখন ইচ্ছা হয়েছে, স্টুডেণ্টস্ হোমের কথা না ভেবে তাদের সেবায় টাকা দেওয়াই উচিত।” উত্তরে তাঁহারা খুব প্রীত হন, এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবাকল্পে ২০,০০০৲ টাকা তো দিলেনই, স্টুডেণ্টস্ হোমের স্থায়ী তহবিলেও ২০,০০০৲ টাকা দান করিলেন। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় একটি স্থায়ী বাসভবনের জন্য ইঁহারাই ৫০,০০০৲ টাকা দেন, এবং এই বৎসরের শেষের দিকে বিদ্যার্থী আশ্রমের স্থায়ী তহবিলে ২,০০,০০০৲ টাকা দান করেন। স্বামী নির্বেদানন্দের উৎসাহে ইঁহারা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে আরো বহু টাকা দান করিয়াছেন।

অনাদি মহারাজের ব্লাডপ্রেসার ও ডাইবিটিস বাড়িয়াই চলিয়াছিল। বিশ্রামের জন্য একবার তিনি শ্রীরামচন্দ্র সুরের অতিথি হইয়া দার্জিলিং-এ কিছুদিন, এবং শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিশনের কালিম্পং আশ্রমে বেশ কিছুদিন কাটাইয়া আসেন। ডাইবিটিসের রোগীর পক্ষে পাহাড়-বাস খুব উপকারী, কিন্তু বিদ্যার্থী আশ্রমের পক্ষে এজন্য খরচ করা সম্ভব নয় বলিয়া এবং স্বামী নির্বেদানন্দও এরূপ করিতে চাহিবেন না জানিয়া শ্রীমৃগাঙ্ক মোহন সুর তাঁহার কার্শিয়াং ও গিরিডির বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে কয়েকবার দীর্ঘদিন ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ঔষধ-পথ্যাদি বাবদ যে খরচ হইত, সে ব্যয়ভারও স্বেচ্ছায় তিনি বরাবর বহন করিয়া আসিয়াছেন। এই সব অবসরের দিনগুলিও অনাদি মহারাজ বই লেখা প্রভৃতি গভীর অভিনিবেশের কাজে ব্যয় করিতেন।

ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট স্থির করিল গৌরীপুরের সম্পত্তি কিনিয়া লইবে। দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর উহার মূল্য প্রভৃতি বাবদ প্রায় সওয়া সাতলাখ টাকা পাওয়া গেল। নতুন আবাসের জন্য নানাস্থানে জমি খুঁজিয়া অবশেষে বেলঘরিয়ায় জমি কেনা স্থির হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বিভাগের

একটি রাইফেল রেঞ্জ এখানে ছিল প্রায় সাড়ে তিনশত বিঘা জমির উপর। উহার কিছুটা কিনিয়া লইয়া তথায় বিদ্যার্থী আশ্রমের পুনর্বাসন করানো স্থির হইল। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে জমির দখল পাওয়া যায়। জমিটি খুব নীচু ছিল, জলা ও হোগলাবন, একটিও গাছ ছিল না। ১৯৫১ সালের ৭ই জানুয়ারী হইতে দুইজন কর্মী এখানে থাকিয়া জমির উন্নয়ন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করেন। প্ল্যান ও ঘরবাড়ী সব পূর্বের মতই হইল। অধিকন্তু সরকারের কাছে গৃহনির্মাণাদি বাবদ পরে আরও প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা পাওয়ায় কর্মীদের থাকিবার দুটি বাড়ী, ছেলেদের জন্য একটি দোতলা বাড়ী, লাইব্রেরী ও জিমনাসিয়াম—যাহা গৌরীপুরে ছিল না—নির্মিত হইল। প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা অবশ্য আগেই নিজেদের উদ্যোগে ব্যায়ামাগার নির্মাণের জন্য একহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিল, গৌরীপুর ত্যাগ করিবার ত্রয়োদশ বৎসর পরে, বিদ্যার্থী আশ্রম পুনরায় নিজস্ব আবাসে ফিরিয়া আসিল। অনাদি মহারাজ কখনো কখনো হাসিয়া বলিতেন, "পাণ্ডবদের মত আমাদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস হয়ে গেল।" বেলঘরিয়ায় প্রথম দুটি ছাত্রাবাস সারদানন্দধাম ও শিবানন্দধাম, মন্দির ও বিবেকানন্দধামের ভিত্তিস্থাপন করেন পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী ; অখণ্ডানন্দধাম, প্রেমানন্দধাম, নিরঞ্জনানন্দধাম, রামকৃষ্ণানন্দধাম, ব্রহ্মানন্দধাম ও তুরীয়ানন্দধামের ভিত্তিস্থাপন করেন পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী। স্বামী নির্বেদানন্দজী বিজ্ঞানানন্দধাম, যোগানন্দধাম, ব্যায়ামাগার ও ওয়ার্কশপের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

১৯৫৪ সালের ১১ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরকে হরিনাথ দে রোডের বাড়ী হইতে আনিয়া বেলঘরিয়ায় সারদানন্দধামে রাখা হয়। স্বামী নির্বেদানন্দজী ঠাকুরকে সে ঘরে বসান। পরে ১৯৫৪ সালে ১৫ই এপ্রিল শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী সেখান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই

পুনর্বাসন উপলক্ষ্যে বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে চারিদিন ধরিয়া উৎসব চলে। প্রথমদিন মন্দির-প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়দিন মিলনোৎসব, তৃতীয়দিন শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসব ও চতুর্থদিন পুনরায় মিলনোৎসব। দীর্ঘদিন পরে প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা ও আশ্রমের শুভানুধ্যায়ীরা আবার একত্রিত হইয়া এরূপ উৎসব করার সুযোগ পাওয়ায় এই পুনর্বাসন-উৎসবটি অতি আনন্দ-মধুর হইয়াছিল। স্বামী নির্বেদানন্দ বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের মিলনসভায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই অসুখও হয়েছে ঠাকুরের ইচ্ছায় ভালর জন্য। নইলে বেলঘরিয়ার এই পতিত জমি কেনা আমা দ্বারা হত না। ভরতের (স্বামী সন্তোষানন্দের) উৎসাহে এটি ঘটল। নইলে আশ্রমের পুনর্বাসন আরো পিছিয়ে যেত, এত তাড়াতাড়ি হত না।"

স্বামী নির্বেদানন্দ শিবানন্দধাম, সারদানন্দধাম, যোগানন্দধাম ও ওয়ার্কশপের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বিবেকানন্দ-ধামের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, আর বাকী সব বাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী।

বেলঘরিয়া আশ্রমে গাছপালা যেখানে যাহা বসানো হইয়াছে, স্বামী নির্বেদানন্দ বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহা করাইয়া গিয়াছেন। জমি যখন খোঁজ করা হইতেছে, তাহারই মাঝখানে ১৯৪৯ সালের ২৬শে আগষ্ট সকালে স্বামী নির্বেদানন্দের রক্তচাপাধিক্যে প্রথম স্ট্রোক হয়। তখন প্রায় দশটা, ছেলেরা আশ্রমের বাস লইয়া কলেজে চলিয়া গিয়াছে। আশ্রমে ছিলেন স্বামী নির্বেদানন্দ, দু'জন কর্মী ও একজন পাচক। অসুখের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত থাকিয়াও তিনি সম্পূর্ণ অচঞ্চলভাবে হাসিমুখে সব বলিয়া দিতে লাগিলেন, কিভাবে কলিকাতায় খবর পাঠাইতে হইবে, ওষুধই বা কি দিতে হইবে তখন। সর্বাবস্থায় স্থির, শান্ত ভাব হইতে কখনো তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই।

একজন কর্মী এই খবর লইয়া তখনি কলিকাতায় যান এবং সন্তোষানন্দজীকে ও তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যার সময় ডাঃ তড়িৎকুমার ঘোষ ও ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার রোগ পরীক্ষা করেন। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে চলিতে থাকে। তিন চার দিন পরে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা সুরু হয়। অসুখ সারিতে বেশ কিছুদিন লাগিল।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি দেওঘর যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। সেখানে সপ্তাহ তিনেক কাটাইবার পর আবার স্ট্রোক হয়; এবারে দক্ষিণাঙ্গ খানিকটা অবশ হইয়া যায়। খবর পাইয়া কলিকাতা হইতে ডাঃ তড়িৎকুমার ঘোষ তাঁহাকে দেখিতে যান। পরে ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এবং ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সুচিকিৎসায় ও দেওঘর বিদ্যাপীঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকর্মীদের আন্তরিক সেবা-যত্নে সেবারেও কোনরূপে তিনি সারিয়া উঠিলেন। অবশ্য কলিকাতায় ফিরিবার মত সামর্থ্য আসিতে প্রায় মাস তিনেক লাগিয়াছিল।

ইহার পর ছোটখাট স্ট্রোক সময়ের ব্যবধানে কয়েকবার হইয়াছে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কাটিয়াও গিয়াছে। শেষ স্ট্রোক হয় ১৯৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর সকাল ৬টার সময়।

১৯৪৯ সালে স্ট্রোক হওয়ার পর হইতে শরীরের দিক দিয়া তাঁহার পক্ষে সেক্রেটারীর কাজ করা আর সম্ভবপর হইল না। ১৯৫০ সালে বিদ্যার্থী আশ্রমের 'ম্যানেজিং কমিটি' গঠিত হইল। স্বামী নির্বেদানন্দ ইহার প্রেসিডেন্ট ও স্বামী সন্তোষানন্দ সেক্রেটারী হইলেন।

সেক্রেটারীর কাজ করা সম্ভব না হইলেও তাঁহার পূর্ণ সজাগ দৃষ্টির পরিচালনা হইতে বিদ্যার্থী আশ্রম কখনো বঞ্চিত হয় নাই, তাঁহার উপস্থিতিই

ছিল এর পক্ষে যথেষ্ট। বিদ্যার্থী আশ্রমের সব কাজেরই এবং কর্মীদের সকলেরই ধর্ম ও কাজকর্মে প্রেরণার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ উৎস, অক্ষমতায় ছিলেন উৎসাহ, দুঃখে সহানুভূতি ও আনন্দে অংশীদার।

বিদ্যার্থী আশ্রমের বাইরে

বিদ্যার্থী আশ্রমের কাজ ছাড়াও বহু কাজে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। বাস্তব জীবনে স্বামিজীর কর্মযোগের এই আদর্শটিকে তিনি পালন করিয়া চলিতেন—কাজ নিজে টানিয়া আনিওনা, আপনা হইতে যে কাজ আসিয়া পড়িবে, তাহাকে এড়াইবারও চেষ্টা করিও না। সেজন্য স্বামিজীর সেবা-ধর্মানুপ্রাণিত যে-কোন কাজ বাহির হইতে আসিত, তিনি গভীর মনোযোগ দিয়া তাহা করিবার চেষ্টা করিতেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠের তিনি ছিলেন সহ-প্রতিষ্ঠাতা, স্বামী সম্ভাবানন্দের সঙ্গে একযোগে সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছেন বহুদিন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টী ও গভর্ণিং বডির বিশিষ্ট সভ্যদের অন্যতম ছিলেন তিনি এবং সাধারণভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের উন্নতির জন্য গভীর চিন্তা দিয়াছেন বহু বিষয়ে, অনেক কিছু করিয়াও গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সকলেই তাঁহাকে স্নেহ, ভালবাসা বা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'এডুকেশন বোর্ড' বিশেষ করিয়া তাঁহারই প্রচেষ্টায় গঠিত হয়; উহার সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিদ্যার্থীদের জন্য তিনি "বিদ্যার্থি-ব্রত-হোম" প্রবর্তিত করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনকালেই তিনি এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, এদেশে পুরুষ-দের মত স্ত্রীলোকেরাও যতদিন না শিক্ষিত হইয়া ওঠে, ততদিন সামগ্রিক জাতীয় উত্থান সম্ভব নয়, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান অসম্ভব। সেজন্য যথোচিত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনার্থে তিনি সাধ্যমত সচেষ্ট ছিলেন। নিবেদিতা

গার্লস স্কুলের কাজ যাহাতে আরো ভালভাবে চলে, তাহার জন্য স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ তাঁহাকে উহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন তিনি উহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বামিজীর পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ স্থাপনে যাঁহারা বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। লালগড়ের রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ সাহসরায়কে বলিয়া সেখানে "রামকৃষ্ণ স্বর্গাশ্রম" নামে সাধুদের বিশ্রামের জন্য একটি স্থান করাইয়া গিয়াছেন। প্রায় ৭৫ বিঘা জমি, চারটি কুটির ও একটি ইঁদারা সহ আশ্রমটি সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দান করা হইয়াছে। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। উহার গঠনেও তাঁহার অবদান কম নহে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার স্থাপনেও তাঁহার সক্রিয় অংশ অনেকখানি, উহার মেম্বারও ছিলেন বহুদিন। ইহা ছাড়া তিনি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কর্মনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বহুদিন, উহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারেও জড়িত ছিলেন যথেষ্ট। হাওড়া বিবেকানন্দ আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শেষ পর্যন্ত, হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউসনেরও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বহুদিন।

গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাপূর্ণ কতকগুলি পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে লিখিয়াছেন Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance, Our Education, Religion and Modern Doubts, Hinduism at a Glance এবং Great Women of India গ্রন্থের The Holy Mother শীর্ষক অধ্যায়টি; বাংলায় লিখিয়াছেন হিন্দুধর্ম, ভারত-কল্যাণ এবং ছোটদের জন্য ধর্ম-পরিচয়। বাঁকারায় স্ট্রীটে থাকাকালীন স্বামিজীর Complete Works হইতে সংগ্রহ করিয়া Swami Vivekananda on India and Her Problems এবং Swami

Vivekananda on Religion and Philosophy নামক দুইটি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। বিশেষ করিয়া Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance গ্রন্থটি পণ্ডিতমহলেও খুবই সমাদৃত হইয়াছে। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "রামকৃষ্ণ-দর্শনের" নিদর্শন-গ্রন্থরূপে Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance গ্রন্থটি পড়ান হয়। তাঁহার লেখা Our Educationএর স্ত্রী-শিক্ষার অংশটি UNESCO-র *Education Abstracts*-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; "ভারত-কল্যাণ" পুস্তকখানি গত চারবৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক উচ্চবিদ্যালয়ের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। Hinduism at a Glance গ্রন্থখানির রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ মঠ হইতে তামিল ভাষায়, মহীশূর কেন্দ্র হইতে কানাড়া ভাষায় ও কালাডি কেন্দ্র হইতে মালয়ালম ভাষায় অনুদিত প্রকাশন বাহির হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় অনুদিত পাণ্ডুলিপিও তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে"র Sri Ramakrishna the Great Master নামে যে ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে The Book and its Author শীর্ষক ভূমিকাটি স্বামী নির্বেদানন্দ লিখিয়া দিয়াছেন।

স্বামী নির্বেদানন্দ বক্তৃতা দিয়াছেন কয়েকবার। খুব উচ্চাঙ্গের বক্তা ছিলেন তিনি। ১৯২৫ সালে খৃষ্টোৎসবে এবং ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশন মহা-সম্মেলনে বেলুড়মঠে বক্তৃতা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাঁচী, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় (সভাপতিরূপে) এবং কলিকাতা ধর্মমহাসভার অধিবেশনে ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সভাপতি। তাঁহার ভাষণ পাঠের পর স্বামী নির্বেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়া-ছিলেন, দুএকজন উহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহার নিকট প্রকাশও করিয়াছিলেন।

তবে ভাল বক্তৃতা করিতে পারিলেও এদিকে তাঁহার ঝোঁক কখনো ছিল না, তুচারজন জিজ্ঞাসুকে লইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করাই তিনি পছন্দ করিতেন সবচেয়ে বেশী।

শেষ

বেলঘরিয়ায় আসিয়া গৌরীপুরের মতই 'ভোকেশন্যাল' বিভাগের কাজকর্ম চলিতে থাকে, কিছু বাড়ানও হয়। ধান, আখ, গম, কড়াই, সবজি প্রভৃতির চাষ, ফলের বাগান, গোয়াল প্রভৃতি সবই আবার করা হইয়াছে। একটি ছোট ওয়ার্কশপও খোলা হইয়াছে; তাহাতে ধানভাঙ্গা কল, আটা তৈয়ারীর কল, ঘানি ও বেকারী রহিয়াছে। ১৯৫৭ সালে বেলঘরিয়ায় আশ্রমেব শাখা-রূপে একটি টেকনিক্যাল কলেজ খোলার প্রস্তাব আসে; গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবে, পরিচালনার ভার আশ্রমের। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যে ভোকেশন্যাল কলেজের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১লা জুন স্বামী মাধবানন্দজী উহার ভিত্তি-স্থাপন করেন। ১৯৫৮ সালের ২৫শে জুলাই হইতে ১৮৬টি ছাত্র লইয়া কলেজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্বামী মাধবানন্দজী ইহার দ্বারোদ্ঘাটনও করেন।

এইভাবে মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি স্টুডেণ্টস্ হোমের পরিপূর্ণ রূপ ও সফলতা দেখিয়া গিয়াছেন। ৩রা অক্টোবর তাঁহার একটি ছোটখাট স্ট্রোক হয়, শেষের দিকে তিনি উহা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। শেষের ৪।৫ দিন তো খুবই ভালো ছিলেন। পূর্বের নিয়মমত চলাফেরা সুরু হইয়াছিল, শরীর-মনে বেশ প্রফুল্লতার ছাপ। ১০ই নভেম্বর কালীপূজার দিন রাত্রে ভজনের আসরে তুবারে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসেন। কালীপূজার পরদিন সহকর্মীদের ও অনুরাগীদের একসঙ্গে সামনে বসাইয়া খাওয়াইলেন,

যাহা কয়েক বছরের মধ্যে সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। কিছুদিন পূর্বে বেলুড়মঠে সাধু-সম্মেলনেও প্রথম দিন যোগ দিয়া একঘণ্টা কাটাইয়া আসেন, এই উপলক্ষ্যে দূরের কেন্দ্রের বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কালীপূজা উপলক্ষ্যে বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থী ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। এইরূপে তাঁহাকে লইয়া একটা আনন্দ ও নিরুদ্বেগের ভাব সকলের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া হঠাৎ ১৫ই নভেম্বর সকালে তিনি মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। এইদিন সকালে 'সেরিব্র্যাল হেমারেজ' হয়। ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া যথারীতি ইজিচেয়ারে বসিয়া স্তবপাঠাদি করিতে লাগিলেন। এইসময় সামান্য একটু অন্যমনস্কতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ যা করেন তার চেয়ে অনেকক্ষণ বেশী পাঠ করিতে দেখিয়া সেবক তাঁহার সহিত দু-একটি কথা বলার চেষ্টা করিলেন। উত্তর আসিল ভাসাভাসা। তার-পর বসিয়া চায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, হঠাৎ বমির বেগ আসিল। এর সামান্য কিছুক্ষণ পরে বাহ্যসংজ্ঞা প্রায় আর ছিল না, বাম অঙ্গ অসাড় হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, স্ট্রোক হইয়াছে, তবে কাটিয়া যাইতে পারে। ইজিচেয়ার হইতে ডাক্তারের উপস্থিতিতেই বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। ৯॥টার কাছাকাছি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, ১০টা হইতে অক্সিজেন দেওয়া সুরু হয়, ১১টার সময় ডাক্তার বলিলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। সেইমত বেলুড়মঠ ও অন্যান্য যত জায়গায় সম্ভব খবর দেওয়া চলিতে লাগিল। বিকাল ৪॥টার পর হইতে অবস্থা হঠাৎ ভালর দিকে চলিতেছে বলিয়া মনে হইল। রক্তচাপ ২৭০ উঠিয়াছিল, কমিয়া এইসময় ১১০ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিকের চাইতেও সরল হইয়া আসে। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাপ ফিরিয়া আসিল। দেখিয়া পরিষ্কার বোঝা গেল, শরীরে অসুস্থতাজনিত কোন অবসাদ নাই, যেন শান্ত-ভাবে ঘুমাইতেছেন। হঠাৎ সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিটের সময় মন্দিরের আরতি শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু চোখ খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। চক্ষু প্রথম হইতেই মুদ্রিত ছিল।'

বিকাল হইতে ঘরে নামকীর্তন চলিতেছিল। প্রথম হইতেই বাহ্যজ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা না যাইলেও মাঝে মাঝে করে জপ করিতেছিলেন, দুএকবার দুহাত তুলিয়া কপালে ঠেকাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, চোখের কোণে বহুবার অশ্রু দেখা গিয়াছিল, একবার "মা" এই কথা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, মুখে মাঝে মাঝে মৃদু হাসিও দেখা দিতেছিল। শেষের দিকে মুখের প্রশান্ত উজ্জ্বলভাব আরও বাড়িয়া ওঠে। ৫টার পর হইতে মুখ রোমাঞ্চিত হইয়াই ছিল।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর চেহারা অপরূপ হইয়া ওঠে। মঠ, কলিকাতা ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান হইতে বহু সাধু ও অনুরাগী ভক্ত আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০॥টায় ফুলমালায় ভূষিত করিয়া গাড়ীতে তাঁহাকে কাশীপুর শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। অত রাত্রেও শেষ দর্শনের জন্য কাশীপুর শ্মশানঘাটে প্রায় তিন চারশো লোক সমবেত হইয়াছিলেন। যথারীতি গঙ্গাস্নান, আরাত্রিকান্তে শেষকৃত্য আরম্ভ হয়। চিতাগ্নি নির্বাপিত হয় রাত্রি সাড়ে তিনটায়।

স্বামিজীর একটি ইচ্ছাকে রূপ দিবার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়া জীবনের সর্বস্ব তাহাতে আহুতি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি সু-উদ্‌যাপিত করিয়া গিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দের নিকট যে কথা তিনি দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যার্থী আশ্রমে কাটাইয়া। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঈপ্সিত কলেজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আর মহাপুরুষ মহারাজের কথামত আশ্রমের মারফৎ কতজনের কত কল্যাণ যে হইয়াছে ও হইতেছে, লিখিয়া তাহার সবটুকু জানান সম্ভব নয়।

যাঁহারাই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মনে

তাঁহার অদর্শনে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার গভীরতা দেখিয়াই বোঝা যায় শ্রীভগবানের কতখানি প্রকাশ এ দেহ-মন-রূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শেষের দিকে সর্ববিষয়ে নিঃস্পৃহতার, সকলের উপর ভালবাসার প্রকাশ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল, কাহারো দোষের কথা বলিলে সহ্য করিতে পারিতেন না, বলিতেন, "মা-ই তো সকলের বুদ্ধির ভিতর রয়েছেন।"

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সুসমঞ্জস জীবনের যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। শরীরনাশের সঙ্গে এসব জীবনের বিলুপ্তি ঘটে না, সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া ইঁহাদের ভাবরাশি চিরদিন জগতের কল্যাণ সাধন করে। স্থূল শরীরে থাকাকালীন, সত্য নিজ শক্তিতেই জয়ী হয়, প্রচারের অপেক্ষা রাখে না—ইহা স্থির বিশ্বাসে জানিয়া তিনি যেমন নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাপিত প্রার্থীর হৃদয়ে চিরদিন তেমনিভাবে নিঃশব্দে তাঁহার স্নেহস্পর্শ আসিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবে, অমৃতের পথে আগাইয়া চলিবার প্রেরণা ও শক্তি জোগাইবে।

—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

রচনাদি-সংগ্রহ

পথের আলোক

[উদ্বোধন, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৪৩]

মানব-সমাজে বিধাতার শুভ্র আশীর্বাদের মত সত্যসাধনায় সমাহিত আর্য ভারতের আবির্ভাব। পারমার্থিক সত্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত—শান্তি, প্রেম ও করুণায় পূর্ণ তাহার ধ্যানশুদ্ধ অন্তর, আর সেই পূর্ণতা হইতে নিঃসৃত বিশ্বকল্যাণের জন্য তাহার অমৃতময়ী বাণী। প্রেম-মৈত্রী-করুণার শান্ত জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া আর্য ভারতের এই বাণী চীন, পারসিক, ইহুদী, গ্রীক, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সভ্যতার মধ্য দিয়া যুগে যুগে মানব-সভ্যতার অভিযানের পথ আলোকিত করিয়াছে। মহান আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার অপূর্ব সংস্কৃতির প্রভাবে পুণ্যভূমি আর্যস্থান কত বিচিত্র জাতিকে নিজের ক্রোড়ে স্থান দিয়াছে এবং তাহাদিগকে মিলনের সূত্রে গ্রথিত করিয়া মহামানবতার উদ্বোধন করিয়াছে।

কিন্তু আর্য ভারত ইতিহাসের এক অতীত অধ্যায়। আর্য ভারতের অক্ষয় অবদান আজ ভূগর্ভের কোন বিস্মৃত অন্তঃপুরে প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রতীক্ষায় সমাহিত।

বর্তমান ভারত হতশ্রী, লুপ্ত-গৌরব, দারিদ্র্যের বিকট ও বিশাল লীলাভূমি। জগতের বরেণ্য-সভায় ভারতের আসন নাই। মুমূর্ষুর মত দুর্বল, নিস্তেজ, সংজ্ঞামাত্র-সম্বল ভারতবাসী জগতের অবজ্ঞা, উপেক্ষা অথবা করুণার পাত্র।

ধর্মপ্রাণ ভারতে একদিকে গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের নির্লজ্জ ব্যভিচার, অপরদিকে অভ্যুত্থানরত অধর্মের দৃপ্ত আস্ফালন।

ঋষি-প্রবর্তিত সনাতন আর্যসংস্কৃতি শূন্যগর্ভ অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত। ধর্মের নামে সমাজে সঙ্কীর্ণতা, কপটতা, ঘৃণা, বিদ্বেষের অবাধ অত্যাচার। ধর্মের কথায় এখনও হৃদয়ে ক্ষীণ স্পন্দন ওঠে সত্য কিন্তু ঐ স্পন্দন ক্ষণিকের স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াই বিলীন হইয়া যায়। অশুদ্ধ হৃদয়ে, নিস্তেজ মস্তিষ্কে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিবার সামর্থ্যও লুপ্তপ্রায়। আচার-মাত্র সম্বল, অন্তঃসারশূন্য আর্য-সন্তানের কাছে আজ স্নায়বিক দুর্বলতা আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভীরু, দুর্বল, অলস, অদৃষ্ট-বাদী, পরমুখাপেক্ষী, বিকৃতমস্তিষ্ক, মূর্তিমান স্নায়বিক দুর্বলতা অসঙ্কোচে দাবী করিতেছে ধার্মিকের পবিত্র আসন। বর্তমান ভারতের এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের মধ্যে অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস।

সমাজের কল্যাণকামী, সুস্থমস্তিষ্ক এবং স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত কোন ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা অসম্ভব। তাই স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ আধুনিক ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে এই ধর্ম অসমর্থ। দুই একজন মনীষী এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের আশু সংস্কার প্রয়োজন মনে করিয়া ধর্মসংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশই এই বিকৃত ধর্মকে যথার্থ ধর্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া আর্যসভ্যতার মূলভিত্তি আধ্যাত্মিকতাকেই বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যথার্থ ধর্মের স্বরূপ, প্রভাব ও প্রয়োজনের প্রতি অন্ধ হইয়া বর্তমান ভারতের কোন কোন মনীষী ধর্মকে জাতীয় জীবনের হলাহল বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন এবং উহাকে নির্বাসিত করিয়া জাতিকে সুস্থ, সবল, উদ্যমশীল, স্বাধীন এবং বরেণ্য করার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বর্তমান জগতের ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে নিরীশ্বরবাদের অসার তথ্য আহরণ করিয়া ঈশ্বর, পরকাল, জন্মান্তর, কর্মফল, জীবের বন্ধন ও মুক্তি প্রভৃতিকে দুর্বলতার পরিপোষক অন্ধ কুসংস্কারমাত্র মনে করিয়া ভারতের জীবনীশক্তির মূল

প্রস্রবণ পারমার্থিকতাকেই লোপ করিতে ইঁহারা উদ্যত। ধর্মপ্রাণ আর্যস্থানে ধর্মত্যাগের এই বিপুল উৎসাহের মধ্যেও অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস।

আজ ভারতের মহা সঙ্কট। ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে ভারত আজ পথভ্রান্ত। নূতন করিয়া আলোক-সম্পাত না হইলে শৌর্য, বীর্য, সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি ও অমৃতত্ব লাভের ঋষি-প্রবর্তিত সনাতন পথের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। উচ্চ ভাব ও আদর্শলাভের জন্য মানবজাতির সকল সাধনাই বুঝি ধূলিসাৎ হইয়া যায়। বৈদিক ঋষিদের ব্যাকুল আহ্বান, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্যের মর্মস্পর্শী বাণী বুঝি শূন্যে লীন হইয়া গেল!

ভারতের চতুর্দিকে দিগন্তবিস্তৃত নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকার। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া গৈরিকধারী জ্যোতির্ময়বপু এক নবীন সন্ন্যাসী পথভ্রান্ত ভারতবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—"ভয় নাই। পথের সন্ধান পাইয়াছি। চোখ খুলিয়া দেখ, অপূর্ব এক আলোক-সম্পাতে আর্যস্থানের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের পথ উদ্ভাসিত।" এ সন্ন্যাসীর কথা মিথ্যা হইবার নহে। বুঝি ভারতের বিবেক আনন্দঘন-রূপে মূর্ত হইয়া মুহ্যমান ভারতবাসীকে অভয় দিতেছে।

ভারতবাসীর হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া ভারতের বিবেকানন্দ অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া অপূর্ব এক আলোকস্তম্ভের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছেন আর বলিতেছেন, "চক্ষুষ্মান, দেখিয়া লও। বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও। ঐ আলোকের সাহায্যে শাস্ত্রের জটিল রহস্য সহজ, সরল ও সরস হইয়া উঠিবে—ধর্মের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আর্যসংস্কৃতি আবার মহিমান্বিত হইবে—ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের যুগপৎ সাধনায় ভারত-দেহে নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে—ঐ আলোকের সাহায্যে জগতের সকল ধর্ম, সকল মত স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের নরনারীকে শান্তির পথে, মহামিলনের পথে, মহামানবতার উদ্বোধনের পথে চালিত করিবে।"

তর্জনী-নির্দেশে আচার্য বিবেকানন্দ ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অপূর্ব আলোকের দিকে। ভারতের সকল সাধনা, সকল সংস্কৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের অদ্ভুত সমাবেশ—বিবেক-বৈরাগ্যের জীবন্ত অভিব্যক্তি—প্রেম ও করুণার অমৃত-নির্ঝর, সকল ধর্মমতের মহাসম্মিলনী শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব জীবন। সমুদ্রের মত গভীর, আকাশের মত উদার শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে জগতের নিখিল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব। তাই এই জীবনের আলোকে ঋষি-প্রদর্শিত অমৃতত্বলাভের সনাতন পথ পুনরায় আলোকিত। সত্য ও শান্তি লাভের জন্য বিশ্বমানবের বহুযুগব্যাপী সাধনাকে আদর্শের দিকে সুনিয়ন্ত্রিত করাতেই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সার্থকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সরল ও মর্মস্পর্শী বাণীতে জটিল সমস্যার সমাধান হয়, সংশয় দূর হয়, হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হয়—ধর্ম বাস্তব হইয়া উঠে।

উপনিষদের ঋষি উপলব্ধিজনিত দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর দাঁড়াইয়া বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া উদাত্তস্বরে বলিয়াছিলেন,—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।" ঠিক তেমনি দৃঢ়, তেমনি স্পষ্ট, অথচ সহজ ও সরল ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাই, তোমাকে যেমন দেখছি ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখি।"

"ঈশ্বরকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়।" বিংশ শতাব্দীর মনঃসমীক্ষকের নিকট এই বাণী বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। এই সন্দেহ দূর করার জন্যই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—"হ্যাঁগো, চৈতন্যের চিন্তায় কি মানুষ অচৈতন্য হয়ে যায়?"

অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক এবং নিরাকারবাদী দার্শনিক মনে করিতে পারেন সৃষ্টির মূল কারণ দেশকালনিমিত্তের অতীত ঈশ্বরকে দেখা, তাঁহাকে স্পর্শ

করা এবং তাঁহার সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব ব্যাপার। ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। যেমন জল আর বরফ। ভক্তিহিমে জমে যেন ঈশ্বর সাকার; আবার জ্ঞানসূর্যের তাপে গলে নিরাকার।" আর যিনি বিচারমাত্র অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করার দাবী বাতুলতা; সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী উপেক্ষা করিবার বিচারসঙ্গত উপায় নাই।

বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন, ব্যক্তিবিশেষের একটি বিশেষ উপলব্ধির মূল্য দিতে বিজ্ঞান প্রস্তুত নয়। ঐরূপ উপলব্ধি সকলেরই গোচর হইবার সম্ভাবনা থাকিলেই উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই কথার উত্তরেই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হলেই তাঁকে পাওয়া যায়।" সমীক্ষাপদ্ধতি নির্দেশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকেই এই সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

বর্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক, প্রপঞ্চের জড় আবরণ ভেদ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির রহস্যময় লীলার পরিচয় পাইয়াছেন সত্য, নিউটনকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার উৎসাহ চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, তথাপি এখনও বৈজ্ঞানিক অতলস্পর্শ প্রকৃতি-পারাবারের কূলে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিতেছেন। প্রকৃতির মূল কারণ তাঁহার দৃষ্টির অনেক দূরে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে তাঁহার বিস্ময় হইতে পারে, অবিশ্বাসও হইতে পারে—কিন্তু সমীক্ষার আহ্বান গ্রহণপূর্বক এই কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর না হইয়া ইহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে বৈজ্ঞানিকও পারেন না।

ভারতের জাতি-সংস্কারক মনে করিতে পারেন, ঈশ্বরকে দেখা যাউক আর নাই যাউক তাহাতে জাতীয় উন্নতির কি আসে যায়? বরং ঈশ্বরকে দেখিবার

জন্য ব্যাকুল হইবার ফলে জগৎ অসার ও তুচ্ছ হইয়া উঠিবে। লোক ইহকাল-বিমুখ হইবে, এবং ইহকাল-বিমুখতা লইয়া যাইবে জাতিকে ধ্বংসের দিকে। এই যুক্তির অসারতা দেখাইবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভেদ—যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। আমি দেখেছি কোশাকুশি ঘরদুয়ার সব চৈতন্যে জড়ে রয়েছে।··· জীবে দয়া কি? শিবজ্ঞানে জীবের সেবা কর্তে হয়।" এই দৃষ্টিতে জগৎ অসার বা তুচ্ছ না হইয়া বরং ইহা মানুষের ভগবৎ-ভাবোদ্দীপক পবিত্র সাধনার ক্ষেত্র হইয়া উঠে। মানুষের প্রতি শিবজ্ঞানে সেবার প্রেরণা দিয়া এই অধ্যাত্মদৃষ্টি জাতীয় জীবনকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য অদম্য শক্তি ও উৎসাহ উদ্বুদ্ধ করে। এই দৃষ্টি জাতির যাবতীয় দুর্বলতা ও মলিনতা দূর করিয়া, মানুষের অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া, হৃদয়ের দেবতাকে প্রকট করিয়া, অমিততেজ দৈবশক্তির প্রভাবে জাতিকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। যে ধর্মামৃত আকণ্ঠ পান করার ফলে অর্জুনের মত বীর, বুদ্ধের মত হৃদয়বান, শঙ্করের মত মেধাবী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া একদিন এই জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সেই ধর্মকে জাতীয় জীবনের অহিফেনসদৃশ বিষ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিলে এই জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাত্মদৃষ্টি-বর্জিত, ইহকালসর্বস্ব কোন এক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের অন্তঃসারশূন্য বাক্যের প্রতিধ্বনি না করিয়া, জাতি-সংস্কারক অবহিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই সারগর্ভ বাণীর মধ্যে জাতির জয়যাত্রার পথের সন্ধান দেখিয়া লউন।

ধর্মপ্রচারক মনে করেন যে তিনি যে ধর্মমতটি প্রচার করিতেছেন উহাই পরমার্থ-লাভের একমাত্র উপায়। এই প্রচারের ফলে ধর্মমতের অসংখ্য

প্রাচীর উত্থিত হইয়া মানবসমাজকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মমতের ধ্বজা উড়াইয়া বিভিন্ন নরনারী পবিত্র ধর্মের নামে ঈর্ষ্যাদ্বেষের বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মানবসমাজে রাক্ষসী লীলার উৎকট অভিনয় করিতেছে। এই অভিনয়ের অবসান করিয়া, সকল প্রাচীর চূর্ণ করিয়া মানবসমাজকে মহামিলনের শান্তিক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যত মত তত পথ।" পথ স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু সকল পথই সেই এক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। "ঈশ্বর এক, তবে তাঁর নাম বহু, কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ কৃষ্ণ, কেউ গড্, কেউ আল্লা।" বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ, বৈষ্ণব, খ্রীষ্ট ও ইস্‌লাম মতে সাধনা করিয়া এবং তত্তৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্বক অনুভূতি-ভূমিতে সকল ধর্মমতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মহা সমন্বয়ের এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। এই মহামন্ত্রের সাধনায় ধর্মের সার্বজনীন রূপ পরিস্ফুট হইবে। ধর্মমতগুলি স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষত রাখিয়া পরস্পরের মধ্যে উদ্দেশ্যগত মহান ঐক্যের সন্ধান পাইবে এবং এই ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক বিরাট সার্বভৌম ধর্মে পরিণত হইবে। ধর্মের আসরে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার পরিবর্তে বিরাজ করিবে প্রেম, শান্তি ও উদারতা। জগতের মনীষীগণ যে কল্পিত মহামানবতার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব, এই মহামন্ত্রের সাধনায় সেই কল্পনা বাস্তব হইয়া উঠিবে।

গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম ও অভ্যুত্থানকারী অধর্মকে প্রতিহত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যে সনাতন ভারতের লুপ্তগৌরব আর্যসংস্কৃতি নূতন আলোকে ভাস্বর হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। মহাশক্তির প্রেরণায় নবজীবন-প্রাপ্ত এই অপূর্ব ধর্মমূলক সংস্কৃতি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পুনরায় মানব-প্রগতিকে উচ্চতম আদর্শের অভিমুখী করিবে। গ্রীকসংস্কৃতির প্রভাবে একদিন ইউরোপে যেভাবে নবজাগরণ আসিয়াছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রচারে এশিয়াখণ্ডে যেভাবে নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবে ভারতের এই

নবজীবনপ্রাপ্ত আর্যসংস্কৃতির প্রভাবে জগৎব্যাপী গ্রীকো-রোমান সভ্যতার মধ্যে এক নব অভ্যুদয় সম্ভাবিত হইয়াছে। অনুভূতিমূলক অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোকে বুদ্ধিমাত্রসহায় পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিযুক্ত প্রাচ্য, ধর্মের নিগূঢ় তথ্য অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে এবং যথার্থ ধর্মের ভিত্তির উপর মানবসভ্যতার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইতে এক শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্বেই পাশ্চাত্যখণ্ডের কোন কোন মনীষী তাঁহার জীবনের মধ্যে মানবধর্মের মহাজাগরণের শক্তি নিহিত দেখিয়া পুলকিত হইয়াছেন এবং পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশের বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অধ্যাত্মজীবন গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। কালের রথচক্র যতই অগ্রবর্তী হইবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ততই দিগন্তবিস্তৃত হইতে থাকিবে। অমৃতের অধিকারী মানব! শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মের শতবার্ষিক-বাসরের এই পুণ্যতিথিতে শোক, মোহ, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের পরিবর্তে প্রেম ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পথভ্রান্ত জগতের পথপ্রদর্শক জ্যোতিঃ-স্তম্ভরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন কর। অধ্যাত্মপথের যাত্রি! এই শুভ লগ্নে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া শান্তি ও কল্যাণের পতাকা উত্তোলন করিয়া 'জন-গণ-মন অধিনায়কের' জয়গান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মের দ্বিতীয় শতাব্দে পদার্পণ কর এবং মহামানবের মহামিলনোজ্জ্বল ভাবী জগৎকে প্রকট করিবার জন্য বজ্রের মত দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হও।

'জীব শিব' ও 'কাঁচা আমি'

[উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৪]

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত জীবের ক্রমোবিবর্তন (evolution) ; বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট অভ্রান্ত প্রমাণের সহায়ে প্রকৃতির এই গূঢ় রহস্যটি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই সত্যটি মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে এ যাবৎ কোন বলবান সঙ্গত যুক্তি কোন তরফ হইতে আসে নাই। এই ক্রমোবিবর্তন কোন্ শক্তির প্রভাবে এবং কি ভাবে সংঘটিত হয় এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা বৈজ্ঞানিকের আসরে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে সকল সমস্যার মীমাংসা আজও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। কি ভাবে ইহা সংঘটিত হয়, এই সম্বন্ধে অবশ্য কয়েকটি অতি সন্নিকট কারণের (immediate cause) সন্ধান তাঁহারা দিয়াছেন, কিন্তু কি মূলশক্তির প্রভাবে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইল তাহা তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া বলিতে আজও অক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই বিষয়ে একটা সুমীমাংসার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেমন বট-বীজের মধ্যে পূর্ণাবয়ব বটবৃক্ষে পরিণত হইবার একটি অদৃশ্য এবং অমোঘ শক্তি আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়, ঠিক সেই রকম ভাবেই স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্ষুদ্রতম জীবাণুর মধ্যেই বুদ্ধত্বে পরিণত হইবার বিপুল শক্তি বিদ্যমান, ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে ক্রমোবিবর্তনের মধ্য দিয়া একদিন 'বুদ্ধের' আবির্ভাব জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের ক্রমাভিব্যক্তির একটা রহস্যময় ইতিহাস। ক্রমশঃ নৈসর্গিক উপায়ে উপরিস্থিত কঠিন আবরণ যতই অপসৃত হয়, ততই হয় জীবের পূর্ণতার দিকে ঊর্ধ্বগতি। ইহা অপেক্ষা যৌক্তিক এবং সহজ ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদের আর কি হইতে পারে ?

এখন প্রশ্ন, কোন্ আবরণের আড়ালে এই পূর্ণতারূপী শিব প্রচ্ছন্ন থাকেন ? হিন্দুশাস্ত্র বলেন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ শক্তির দ্বারাই এই আবরণ গঠিত। উদ্ভিদ্ ও নিম্নস্তরের প্রাণীর কথা বাদ দিয়া, প্রাণী-জগতের উচ্চস্তরে পৌঁছাইলে শিবের আবরণ এক কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায় 'কাঁচা আমি'। স্বার্থসর্বস্ব হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-ভোগ ও জীবনধারণের জন্য যথেচ্ছ প্রচেষ্টা করাই এই 'কাঁচা আমি'র স্বভাব। নিজের সুখের জন্য অপরের দুঃখ উৎপাদন করিতে ইহার তিলমাত্রও লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। স্বভাব-চালিত হইয়া প্রবৃত্তির পথে ভয় ছাড়া অপর কোন বাধাকেই ইহা গ্রাহ্য করে না। ভোগলোলুপ, স্বার্থান্বেষী, হিংস্রস্বভাব এই 'কাঁচা আমি'টির পরিপূর্ণ মূর্তি দেখা যায় পশুজগতে।

আদিমযুগে প্রকৃতির ক্রোড়ে যখন মানুষের প্রথম জন্ম হয় তখনও তাহার উপর পশুর মতই ছিল এই ভোগলোলুপ, স্বার্থান্ধ, জিঘাংসাপরায়ণ 'কাঁচা আমি'র অপ্রতিহত অধিকার। ঠিক পশুরই মত নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখা এবং যথেচ্ছ ভোগ আহরণ করার জন্য কঠিন বিপদসঙ্কুল আবেষ্টনীর সঙ্গে নিয়ত লড়াই করাই ছিল আদিম মানুষের কাজ। কিন্তু একটা নৈসর্গিক কারণেই আদিম মানুষ ক্রমে 'কাঁচা আমি'কে সংযত, গণ্ডীবদ্ধ, শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন অনুভব করিল। কোন এক শুভলগ্নে অপরকে ভালবাসার এক অভিনব বৃত্তি, বহুকে লইয়া সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার এক অদম্য স্পৃহা এবং প্রয়োজনবোধ আদিম মানুষের নির্মম হৃদয়কে রসসিক্ত করিয়া তুলিল। এই বিশেষ রসভোগের আয়োজন করিতে গিয়া সে দেখিল যে ইহার বিনিময়ে তাহার 'কাঁচা আমি'র অবাধ স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দেশ করা প্রয়োজন। তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ হইল না। কারণ, রিপুর তাড়না তাহার কাছে যতটা স্বাভাবিক, সমাজপ্রেমের আকর্ষণও তাহার কাছে ততটাই স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। 'কাঁচা আমি'কে যতটুকু বাঁধিয়া সমাজের মধ্যে শান্তি ও

শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়, এই অভিনিবেশের মধ্য দিয়াই সামাজিক বিধি-নিষেধ, রাজার আইন-কানুন প্রভৃতির উদ্ভব। ইহাই মানব-সমাজের ক্রমোবিবর্তনের সাধারণ এবং নৈসর্গিক ধারা। সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যষ্টির 'কাঁচা আমি'টিকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়াই হইয়াছে মানবসভ্যতার বিরাট অভিযান।

কিন্তু নিছক সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রয়োজনেই এই দুর্দমনীয় 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। অবাধস্বাধীনতাকামী যথেচ্ছাচারপ্রিয় এই 'কাঁচা আমি' কোন প্রকার বিধি-নিষেধের বশ্যতা স্বীকার করিতে নারাজ। পশুরই মত ইহা ভয় করে শুধু প্রবলের কঠিন শাসন। অন্তরের অসন্তোষ ও তীব্র প্রতিবাদ লইয়া সে একটুখানি মাথা হেঁট করে শুধু ভয়েরই কাছে। কিন্তু পশু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি থাকায় মানুষ সুযোগ বুঝিয়া শাসনের কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। আর যাহারা অত্যন্ত দুর্দান্ত-প্রকৃতির তাহারা সমাজ বা রাজার শাসনকে উপেক্ষা করিয়াই সংযমের নির্দিষ্ট কোঠার বাহিরে চলিয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই অধুনাতন সমাজেও দেখা যায় যে কঠোর ফৌজদারী-দণ্ডের ব্যবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করার লোকের অভাব নাই। যাহারা দুর্বল তাহারা শাসন মানিয়া লয় শুধু ভয়ে; ঐ শাসনের কঠোরতা শিথিল হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে 'কাঁচা আমি'র প্রবল প্রেরণায় উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বরণ করিয়া লইতে পারে ইহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃই মানুষের এই দাম্ভিক, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ, হিংস্রস্বভাব 'কাঁচা আমি'টিকে শুধু বাহিরের শাসন দিয়াই সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব বলিলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু বিপদ শুধু এইটুকুই নয়। এই 'কাঁচা আমি'র দানবীয় প্রভাব শুধুই

ব্যক্তির জীবনে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের জীবনেই নিবদ্ধ থাকে না। যদিও বা কোন সমাজের কড়া শাসনের প্রভাবে ঐ সমাজের ব্যক্তিদের জীবন কতকটা সংযত হইয়া উঠে, তথাপি কৌশলী 'কাঁচা আমি' অপর এক দিক দিয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বসে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজেই (জাতি বা সম্প্রদায়) একটা সমষ্টিগত 'কাঁচা আমি' সৃষ্ট হয়। নরহত্যা, ব্যভিচার, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি গুরু অপরাধ নিজ নিজ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে দণ্ডনীয় হইলেও, যখন একটি ক্ষুদ্র সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই অপরাধগুলি স্বদেশ বা স্বজাতির নামে মহিমান্বিত হইয়া উঠে, জগতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই চিত্র উজ্জ্বলভাবেই অঙ্কিত রহিয়াছে।

বর্তমান জগতের ইতিহাস বোধ হয় অতীতকে লজ্জা দিবার জন্যই এই উৎকট লীলার রেকর্ড ভঙ্গ করিতে উদ্যত। ইউরোপখণ্ডে মহাপরাক্রমশালী 'কাঁচা আমি' 'নেশন' নাম লইয়া খাড়া হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের এক বিশেষ দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। দুর্বলের উপর প্রবলের অবৈধ এবং নির্লজ্জ অত্যাচার আধুনিক মানবসমাজের দৈনন্দিন ব্যাপার। জড়প্রকৃতি মন্থন করিয়া বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞানরূপী অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে বিষও তুলিয়াছে যথেষ্ট। বিজ্ঞানের সহায়ে 'নেশন'গুলি লোক ও জনপদ বিধ্বস্ত করার নূতন নূতন লোমহর্ষণ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, ইহাদের ভয়ে পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলির শঙ্কা ও ব্যথার সীমাই নাই। ইহাদের কাহারও লুব্ধ এবং সকোপ দৃষ্টি পড়িবামাত্রই দুর্বল জাতির মৃত্যুর পথে যাত্রা করিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ভয় শুধু দুর্বল জাতিরই নয়। দুর্বল ও সবল শুধু আপেক্ষিক শব্দমাত্র। সবল হইতেও সবলতর আছে। তাই ভয় আপেক্ষিক সবলতাকেই। এইজন্যই বর্তমান ইউরোপখণ্ডে 'নেশন'গুলির অনেকের মধ্যেই দেখা যায় সবলতম হইবার দুর্নিবার উদ্যম। তাই সমগ্র জগতের শান্তিরক্ষার জন্য

আন্তর্জাতিক সভাসমিতির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই বড় 'নেশন'গুলির মধ্যে চলিয়াছে রণসজ্জার প্রতিযোগিতায় এক অভূতপূর্ব সাধনা। একটি বীভৎস মহাসংগ্রামের নিদারুণ স্মৃতি লোপ পাইবার পূর্বেই আর একটি মহাসমরের ঘন-ঘটায় জগতের রাজনৈতিক আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই অবশ্য বুঝিতেছেন যে এই পথে অগ্রসর হইলে, বিগত মহাসমরের আর দুই একবার পুনরাবৃত্তি হইলে, সমগ্র মানবসমাজকেই বোধ হয় পৃথিবী হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তথাপি দুর্দমনীয় সঙ্ঘবদ্ধ 'কাঁচা আমি'কে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সংযমের কোটায় বাঁধিয়া রাখিবার সাধ্য যেন কাহারই নাই।

বস্তুতঃ 'কাঁচা আমি'টাই সকল অনর্থের মূল। ইহার অবাধ সেবা অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থপরতা ও ভোগসর্বস্বতার কাছে আত্মসমর্পণ করাই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন বিষময় করিয়া তোলে। ইহারই অপ্রতিহত প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডীর মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসে এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ইহাই সমগ্র মানবসমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। 'কাঁচা আমি'র প্রভাবে শুধু পশুবৃত্তি লইয়াই যদি মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অধুনালুপ্ত অতিকায় পশুগুলির মত মানুষেরও একদিন পৃথিবীর বুকে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ তাহার কঙ্কালটি রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

দেখা গেল, মানুষের 'কাঁচা আমি'র প্রবল প্রতাপ—ইহাকে সংযত করা কত কঠিন এবং করিতে না পারার ফল কত বিষময়; গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করার পথে ব্যর্থতার কি করুণ কাহিনী, এবং এই ব্যর্থতার পশ্চাতে ধ্বংসের চিত্র কত বীভৎস!

কিন্তু মানবসমাজের প্রগতির সাধনায় এইটুকুই সব কথা নয়। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রবল 'নেশন'গুলি যে আত্মঘাতী প্রচেষ্টায় প্রাণমন সমর্পণ

করিয়াছে, এ পথেই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সকল মানুষকে অগ্রসর হইয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইত।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসের আর একটি দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে এই 'কাঁচা আমি'টিকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। মেগাস্থেনিসের বর্ণনার মধ্য দিয়া তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, অথবা কনফুসিয়াসের আমলে চীনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টি জীবনেও 'কাঁচা আমি'টিকে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে রাখা খুবই সম্ভব। কিন্তু এই সংযমের প্রেরণা শুধু সমাজের বাহ্যিক শৃঙ্খলা রাখার প্রয়োজনের দিক হইতে আসে নাই—ইহা আসিয়াছে আর একটি বিশেষ দিক হইতে—সেটি ধর্মের দিক।

যেমন একটি শুভলগ্নে আদিম মানুষের মনে সমাজ গঠন করার এক অদম্য ক্ষুধা জাগিয়াছিল, সেইরূপ আর একটি বিশেষ শুভলগ্নে মানুষ আবিষ্কার করিয়া বসিল তাহার অন্তরের মধ্যে 'কাঁচা আমি'র আড়ালে ইহাকে জয় করার উপযুক্ত এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং আশাপ্রদ প্রত্যক্ষ হইল এই যে যখন একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এই 'কাঁচা আমি'টি মরীচিকার মত শূন্যে মিলাইয়া যায়, তখনই মানুষের অন্তরে প্রকট হয় মানুষের যথার্থ স্বরূপ, যেখানে হিংসা নাই, লোভ নাই, ক্রোধ নাই—আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির এক মহান গাম্ভীর্য আর সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-কামনার এক অফুরন্ত প্রবাহ। তখন তাহার 'আমি'টি 'কাঁচা আমি'র মত একটা ক্ষুদ্র দেহ-মনের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকে না। তার 'আমি'র মধ্যে দেখিতে পায় সে বিশ্ব-সংসার। "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥" সকলের প্রতিই তার সমদৃষ্টি, সকলের কল্যাণের মধ্যে পায় সে অনাবিল আনন্দ। 'কাঁচা আমি'র ক্ষুদ্র স্বার্থপর সত্তার স্থান অধিকার করিয়া সেখানে বিদ্যমান এক ভূমা বিশ্ব-

কল্যাণমূর্তি। নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, সংশয় নাই, ভয় নাই, কোন কিছু পাইবার উদ্বেগ নাই, দুঃখও নাই। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" তাহার অনাবিল স্বার্থগন্ধশূন্য বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় নিরন্তর লোককল্যাণই হয় একমাত্র কাম্যবস্তু। "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ", বসন্তকালের মত সকলের কল্যাণ-কামনাই হয় তাহার স্বভাব। পরিস্ফুট দেবস্বভাবের প্রেরণায় অপরের কল্যাণের জন্য বিষপান করিতেও তাহার দ্বিধা নাই। ছাগশিশুর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবনকে অর্পণ করিতে অথবা মানব-কল্যাণের জন্য ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে সে সর্বদা প্রস্তুত। ইহাই 'কাঁচা আমি'-মুক্ত জীবের স্বরূপগত শিবের পরমকল্যাণময় মূর্তি।

জীবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল বহু সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক ভারতে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" প্রভৃতি উপনিষদ্-বাক্যের মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব প্রথম ঘোষিত হয়। সেই সুদূর অতীত হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত যুগে যুগে ভারতের তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি ও আচার্যগণ এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন এবং নানা ভাষায় নানা ছন্দে এই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিলেন, "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলিলেন, "জীব শিব"। জীবের ইন্দ্রিয়চালিত বহির্মুখী স্বার্থান্বেষী একটা বাহিরের মূর্তির অন্তরালে যে তার স্বরূপগত পরমকল্যাণময় শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ইহা নিছক কবির কল্পনা নয়, ঔপন্যাসিকের উচ্ছ্বাস নয়, যুক্তিসর্বস্ব দার্শনিকের অসার অনুমান নয়। ইহা শুদ্ধ ও একাগ্র মানববুদ্ধিমাত্রেরই গোচর প্রকৃতির একটি চিরন্তন মূল সত্য। ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন যুগে এই

সত্যের সন্ধান ও যথোপযুক্ত প্রচার হইয়াছে। যাশুর উক্তি "I and my Heavenly Father are one" এই সত্যেরই ঘোষণা।

যাহা হউক, জগতের তত্ত্বদ্রষ্টা আচার্যগণ যুগে যুগে এবং দেশে দেশে এই সত্য উপলব্ধি করাকেই মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। অন্তর্নিহিত শিবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যেই মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষ, ইহাতেই তাহার সকল অভাব-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি, ইহাতেই সকল দুঃখ, ভয় ও সংশয়ের চির অবসান। ইহাতেই হৃদয় পূর্ণ হয় ভূমার আনন্দে, নিঃস্বার্থ প্রেমে; জীবন মধুময় হয়, কৃতকৃত্য হয়। ইহাই ব্যক্তিগত মানব-জীবনের চরম পরিণতি। সুতরাং ইহাই মানবের জীবনব্যাপী সংগ্রামের চরম লক্ষ্য।

মানব-সমাজের পরম কল্যাণকামী আচার্যগণ এই আদর্শ নির্দেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই আদর্শলাভের উপায়ও তাঁহারা নির্দেশ করিলেন। কেমন করিয়া 'কাঁচা আমি'র আবরণটি মুক্ত করিয়া শিবত্বের ক্রমোবিকাশ ঘটাইতে হইবে তাহাও তাঁহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মানুষকে শিখাইলেন। এই আদর্শ-লাভের প্রচেষ্টাই মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনা। ইহারই নাম ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "Religion is the manifestation of the Divinity already in man." মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের (শিবত্বের) পূর্ণ অভিব্যক্তি যখন হয়, তখনই হয় তাহার যথার্থ ধর্মলাভ।

জগতের সকল ধর্মমতগুলির মূলেই আছে 'কাঁচা আমি' জয়ের ন্যূনাধিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ত্যাগ ও সেবা। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়া অপরের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার নাম সেবা। এই ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া যে 'কাঁচা আমি'র আবরণ ভেদ করিয়া মানুষ শিবত্বের ক্রমোবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে কোন অস্বাভাবিক যুক্তির আশ্রয় লইতে হয় না।

শাস্ত্র ও আচার্যবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্তর্নিহিত শিবত্বে আস্থাবান হইতে পারিলেই এই পথে অগ্রসর হইবার প্রবল প্রেরণা আসে। আদর্শলাভের মহান প্রেরণায় মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নীচ, স্বার্থপর, ভোগলুব্ধ 'কাঁচা আমি'র বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ত্যাগ ও সেবার পথে অগ্রসর হয়। নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নিজে বরণ করিয়া লয় বলিয়াই ত্যাগ ও সেবার আপাতবন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ক্রমে বাড়িয়াই চলে। এই জন্যই শুধু সমাজের বিধিনিষেধ এবং রাজার কঠোর শাসন যে 'কাঁচা আমি'কে ঈষৎমাত্র সংযত রাখিতেও অক্ষম, সেই 'কাঁচা আমি'কে নিজ অভীষ্টলাভের প্রেরণায় সম্পূর্ণ লয করাও অসম্ভব হয় না। ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মসংযম সমাজ ও রাজার শাসনজনিত সংযম অপেক্ষাও হয় অধিকতর কার্যকরী। তাই যখনই কোন সমাজের জীবনে ধর্মলাভের ব্যাপক জাগরণ লক্ষিত হয় তখনই সহজ ও দ্রুত পদক্ষেপে সেই সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। কনফুসিয়াসের আমলের চীনে এবং মেগাস্থেনিসের আমলের ভারতে ব্যাপক শান্তি ও শৃঙ্খলার মূলে ছিল এই স্বতঃপ্রবৃত্ত অধ্যাত্ম-সাধনার প্রভাব—ধর্মের প্রেরণা।

কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্মের দিক দিয়াও মানব-সমাজ 'কাঁচা আমি'কে ব্যাপকভাবে এবং স্থায়িভাবে জয় করিবার পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবন এবং কিছু-দিনের জন্য কোন কোন সমাজের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সত্য—কিন্তু সভ্যতাগর্বিত বর্তমান জগতের সমষ্টিগত জীবনও "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই আছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ইহার কারণ, ব্যক্তিগত 'কাঁচা আমি' বড়ই প্রবল, বড়ই কৌশলী, এবং সমষ্টিগত 'কাঁচা আমি' আরও প্রবল, আরও কৌশলী। আচার্যনির্দিষ্ট ধর্মমত গ্রহণ করিয়াও মানুষ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভুলিয়া যায় যে 'কাঁচা

আমি'কে জয় করাই ধর্মের মূল কথা। তখন ধর্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর সে সবটুকু রাখিয়া দেয় বটে—বরং উহার মাত্রা বোধ হয় দিন দিন বাড়াইয়াই চলে—কিন্তু অন্তর্নিহিত শিবের আবাহনের পরিবর্তে সে ছদ্মবেশী 'কাঁচা আমি'র নূতন রকমের পূজায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। ত্যাগ ও সেবার, প্রেম ও পবিত্রতার স্থান অধিকার করিয়া বসে অভিমান, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের প্রবল স্পৃহা। ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষ তখন অন্তরের পশুত্বকে বহাল রাখিতে ব্যস্ত হইয়া ওঠে। মূল কথা বিস্মৃত হইয়া এই পথেও সঙ্ঘবদ্ধ "কাঁচা আমি" ধর্মের পতাকা উড়াইয়া উৎকট হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের সমাজকে কতভাবেই বিপর্যস্ত করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাম্প্রদায়িক কোলাহল ও অশান্তির মূলেও এই সঙ্ঘবদ্ধ 'কাঁচা আমি'রই প্রতারণা। ধর্মেব পোষাক পরিয়া 'কাঁচা আমি' মানুষকে মিথ্যাচারী করিয়া তোলে, এবং সকল কল্যাণের মূল উৎস যে ধর্ম, তাহাকেই বীভৎস করিয়া বসে।

এইজন্য বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে ধর্মের নাম থাকিলেই ধর্ম হয় না। ধর্মেরও একটা স্বরূপ আছে এবং একটা বিকৃতি আছে। 'কাঁচা আমি'কে ক্রমশঃ লয় করিয়া শিবত্বের প্রকাশ করাই যথার্থ ধর্মের লক্ষ্য। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে 'কাঁচা আমি'র কোন প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব, যদি কোথাও কোন প্রকার আপোষ দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেখানে ধর্ম কক্ষ-চ্যুত হইয়াছে। মূল লক্ষ্য হারাইয়া উহা বিকৃত হইয়াছে এবং সমাজকে কল্যাণের নামে অকল্যাণের বিপরীত পথে লইয়া যাইতেছে। এইরূপ বিকৃত ধর্মই গীতার "ধর্মস্য গ্লানিঃ" (ধর্মের গ্লানি)।

বর্তমান জগতে আস্তিক সমাজগুলির প্রায় সর্বত্রই এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় সর্বত্রই বাহ্যিক আচার ও আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের অন্তরালে 'কাঁচা আমি'র অবাধ পূজার ব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়।

স্বার্থপর, দাম্ভিক, নৃশংস, ক্রূর, অত্যাচারী, ব্যভিচারী ধর্মযাজকের সংখ্যা সকল দেশেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মজগতে যাঁহারা নেতার পদ দখল করিয়া আছেন, তাঁহাদের অবস্থাই যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ধর্মগুরুর জীবনেই যদি প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি ও মাধুর্যের আদর্শ তাহারা দেখিতে না পায়, তবে সংযমের পথে আকৃষ্ট হইবে কোন্ প্রেরণায়? মানুষকে চিরকাল অজ্ঞ রাখিয়া, শুধু পরকালের ভয় দেখাইয়াই কল্যাণের পথে চালিত করা যায় না। অন্তঃসারশূন্য হইয়া ধর্মযাজকগণ জনসমাজে ধর্মের অস্তিত্ব বহাল রাখিবার জন্য যখন এই পথ অনুসরণ করেন, তখন বস্তুতঃই তাহারা ধর্মের সমাধি রচনা করেন।

বর্তমান যুগে গণশিক্ষা-বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রায় প্রত্যেক দেশেই ধর্মযাজকদের ভণ্ডামি ধরা পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ফলে কোথাও প্রতারক ধর্মযাজকদের অপরাধে আচার্য-প্রচারিত মূল ধর্মই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কোথাও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতা ও আভিজাত্যকে খর্ব করার আয়োজন চলিতেছে। এই গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের বিকট চিত্র দেখিয়া বহু মনীষী ধর্মকে মানব-সমাজের প্রগতির পথের বন্ধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই মনীষীদের দোষ দেওয়া যায় না। ধর্মের স্বরূপ ও বিকৃতির মধ্যে ভেদটা স্বর্গ ও নরকের ভেদের মতই একেবারে বিপরীত। বিকৃত ধর্মই যদি ধর্ম হয় তাহা হইলে ইহার চিরনির্বাসনই মানুষের কল্যাণের পথ, এ কথা নিঃসংশয়। আর এক কথা, ধর্মের স্বরূপগত যে একটি পরম কল্যাণময় রূপ আছে তাহার সন্ধান না পাওয়ার জন্য এই মনীষিবৃন্দকে দায়ী করা যায় না। কারণ চতুর্দিকে যখন ধর্ম গ্লানিগ্রস্ত, তখন কাহারও পক্ষে যথার্থ ধর্মের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। এইজন্যই গীতায় শ্রীভগবান

বলিয়াছেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন (ধর্মের নব জাগরণের জন্য) স্বয়ং আমি অবতীর্ণ হই।' "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" যাহা হউক, গ্লানিগ্রস্ত ধর্মও যেমন সমাজকে বিপরীত দিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, উহার প্রতিকারকল্পে মূল ধর্মের লোপ-সাধনের প্রচেষ্টাও ঐ পথে সমাজকে লইয়া যাইতে বাধ্য। কারণ উভয় পক্ষেই আছে সেই সকল অনর্থের মূল পশুভাবাপন্ন 'কাঁচা আমি'র ছলনাময় আত্মপ্রসারের প্রচেষ্টা। একপক্ষে 'কাঁচা আমি'র ছদ্মবেশী অভিযান, অপর পক্ষে উহারই উলঙ্গ আস্ফালন। ইহারই ফলে ইউরোপে আজ ব্যাপক অশান্তি এবং সমগ্র মানব-সমাজের আসন্ন বিপদ।

ভারতের ধর্মও গ্লানিগ্রস্ত এবং ইহার প্রতিকারের জন্য এখানেও মূল ধর্মকেই নির্বাসন দিবার চিন্তা অনেক মনীষীর মনই অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। জগতের সর্বত্রই বোধ হয় এইরূপ একটি বিপরীত গতি সুরু হইয়াছে।

তথাপি একটু নজর করিলেই দেখা যায় যে বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশের মনীষীদের মধ্যেও কেহ কেহ গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের বীভৎসতা দেখিয়াও মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হন নাই, বরং আশার বাণী শুনাইয়াছেন ও শুনাইতেছেন। তাঁহারা মূল ধর্মের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন নাই। বরং ধর্মের যুক্তি-বিরোধী আবর্জনা দূর করিয়া উহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা সেই বিষয়েই গবেষণা করিতেছেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু ইঁহাদের উপায়টি উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট কিনা তাহা প্রণিধানযোগ্য। ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মতত্ত্বের উপলব্ধির মধ্য দিয়াই সম্ভব, কল্পনা বা বিচারের সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু ইঁহারা শুধু বিচার অবলম্বন করিয়া ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে, এক একটি

কল্পনা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য উদ্দেশ্য মহান বলিয়া তাহাদের এই প্রচেষ্টা একেবারে উপেক্ষার বস্তু নয়।

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক ক্রমোবিবর্তনবাদকে যুক্তিদ্বারা অনুসরণ করিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে মানুষের মধ্যে একটি অতিমানবতার (superman) বীজ রহিয়াছে, এই বীজ হইতেই একদিন অতিমানবের সৃষ্টি হইবে এবং মানুষের সমাজ ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া অতিমানব-সমাজে পরিণত হইবে। এই মতের প্রবর্তকদের মধ্যে জার্মাণ দার্শনিক নীট্‌সে এবং বর্তমান ইংলণ্ডের ভাব-নায়ক বার্ণার্ড শ'র নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইঁহাদের কল্পিত অতিমানবের চিত্রটি বুদ্ধ বা যীশুর অনুরূপ হইবে, কিম্বা হিট্‌লার ও মুসোলিনীর অনুরূপ হইবে তাহা বলা যায় না। মানুষ তাহার গণ্ডীবদ্ধ শক্তির সীমা ছাড়াইয়া অসুরেও পরিণত হইতে পারে, দেবতাও হইতে পারে। 'কাঁচা আমি'টিকে যদি বাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সে হয় অসুর, আর উহাকে সম্পূর্ণ জয় যদি করিতে পারে, তাহা হইলে হয় দেবতা।

মানুষের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশার বাণী আর একদিক হইতেও উঠিয়াছে। উপনিষদের ঋষিদের মতই নিজের শুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে নূতন করিয়া 'জীব শিব' মন্ত্রের পুনরায় উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও সঙ্কল্প ও সাধনাবলে এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া জগতে ইহার বহুল প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিয়াছেন যে এই 'জীব শিব' মন্ত্রের সাধনের মধ্য দিয়াই মানব-সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, অন্যথা নয়। এইজন্যই ত্যাগ ও সেবার মহিমা প্রচার করিয়া তিনি জগতের নরনারীকে কল্যাণের পথে আহ্বান করিয়াছেন। 'কাঁচা আমি'কে জয় করিয়া অন্তর্নিহিত শিবকে প্রকট করাই ধর্ম এবং এই ধর্মই মানব-সমাজের

যাবতীয় কল্যাণের মূল উৎস, এই কথা প্রচার করিয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্ত জগৎবাসীকে যথার্থ প্রগতির পথের সন্ধান দিয়াছেন।

ইউরোপকে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে উহার সমগ্র বর্তমান সভ্যতার নীচেই আছে এক ভীষণ আগ্নেয়গিরি। যদি এখনও ঐ সভ্যতা আমূল শোধিত হইয়া অধ্যাত্মপথে চালিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সভ্যতার ধ্বংস হইতে আর বিলম্ব নাই। ভারতবাসীকেও দুইটি আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি সতর্ক করিয়াছেন। ভারতের একদিকে গ্লানিগ্রস্ত ধর্মের উৎকট ব্যভিচার, অপর দিকে যুক্তিবাদী নাস্তিকতার নির্লজ্জ পরানুকরণস্পৃহা। ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া, ঔপনিষদিক ধর্মের কল্যাণময় রূপটি প্রকট করিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তিনি ভারতবাসীর উপর। ভারতই জগতের আদি ধর্মগুরু। আজ নিয়তির চক্রে ভারত নিজে পথভ্রষ্ট হইলেও তাহার দায়িত্ব লোপ পায় নাই। তাই বুঝি এখানে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং 'জীব শিব' মন্ত্রের পুনঃপ্রচার।

'আমি'র সন্ধানে

[উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৫]

আলোর নীচেই অন্ধকার। যে বিষয়টির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঠিক সেইটিই থাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। এমন কি, সেইটিকে জানিবার ইচ্ছাও আমাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। দুনিয়ার খবর তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার আগ্রহ আমাদের দুর্নিবার, কিন্তু আমাদের নিজের সম্বন্ধে অনু-সন্ধিৎসা এক রকম নাই বলিলেই চলে।

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?—এই সব প্রশ্ন লইয়া যদি কেহ মাথা ঘামায় তবে সে নিশ্চয়ই পাগল অথবা দার্শনিক। সুস্থমস্তিষ্ক সাধারণ মানুষের যেন এসব প্রশ্ন মনেই আসে না। যদি বা আসে—ইহার সমাধানের জন্য যেন তাহার রুচিও নাই, অবকাশও নাই।

কিন্তু আর্য ঋষিগণ উপদেশ দিয়াছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ 'নিজেকে জান'। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আত্ম-জ্ঞান হইলেই মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে, তখনই মানুষ সকল সংশয়, সকল বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। ইহারই নাম মুক্তি; এবং এই মুক্তিলাভরূপ অপূর্ব ফলের জন্যই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। খুব সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিসও উপদেশ করিয়াছিলেন, 'Know thyself' (নিজেকে জান)।

যদিও আর্য ঋষিগণ খুব সহজ এবং স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে নিজেকে ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়, তথাপি এই

পথে চলার রুচি আমাদের একেবারেই নাই। এটি আমাদের মামুলি ধাত। এইজন্যই কঠ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

[স্রষ্টা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য বহির্জগতটাই আমাদের নজরে আসে, অন্তরাত্মা আসেন না। (অবশ্য) কোন কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব-লাভের ইচ্ছায় (বহির্মুখ) ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিরোধ করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দেখিয়াছেন (উপলব্ধি করিয়াছেন)।]

যাহা হউক, ঋষি-প্রদর্শিত মুক্তি-পথে চলার রুচি আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। কারণ অনাবিল, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—প্রগতির অপর কোন পথ নাই।

বেদান্ত-শাস্ত্র বলেন যে আমাদের গোড়ায়ই গলদ, তাই আমাদের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-জন্মান্তররূপ বন্ধন। নিজেকে একেবারে ভুল বুঝিয়া বসিয়া আছি। যেটা আমি নই সেটাকেই 'আমি' বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। ইহাই আমাদের অনাদি অবিদ্যা। এই অবিদ্যা দূর না হইলে মুক্তির আশামাত্রও নাই। যেটিকে 'আমি' বলিয়া মনে করিতেছি সেটা আমার আবরণ মাত্র, আমার স্বরূপ নয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এইগুলির সমষ্টিকে আমরা 'আমি' বলিয়া থাকি। কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্র বলেন যে ইহারা 'আমি'কে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—ইহারা 'আমি'র আবরণ বা উপাধি—'আমি' এইগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইগুলির পরিবর্তন আছে, ইহারা চিরস্থায়ী নয়, ইহারা জড়, এমন কি, ইহারা সত্য বস্তুই নহে—স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর মত ইহাদের সত্তা একেবারেই অলীক। অথচ এমনই অবিদ্যার কুহক যে ঐ বুদ্ধিই কর্তা ও ভোক্তা সাজিয়া 'দেহেন্দ্রিয়-মন'কে নানা কাজে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বপ্নের মধ্যেও মনে হয় আমরা কত কাজ করি, কত সুখ-দুঃখ ভোগ করি—

কিন্তু জাগিবার পর মনে হয় যে স্বপ্নের কর্তা ও ভোক্তা একটা অলীক ব্যাপার। ঠিক এই রকমই যখন মানুষের অতি-জাগরণ (তুরীয়) হয় তখন জাগ্রৎকালের কর্তা-ভোক্তাও শূন্যে বিলীন হইয়া যায়।

যাহা হউক মানুষের যাবতীয় কর্মও ভোগ হয় এই 'দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি'র মারফৎ। তার আমিটি কিন্তু এই কর্ম ও ভোগ হইতে একেবারে নির্লিপ্ত থাকে। শুধু তাই নয়—তার যথার্থ 'আমি' এই দেহের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। তার আমি ভূমা—বিশ্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এক শাশ্বত সত্তা। যিনি এই প্রপঞ্চের মূল, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁর মায়া-শক্তিতে ঘটিতেছে, সেই পরব্রহ্ম আর মানুষের যথার্থ 'আমি' একেবারেই অভিন্ন। মানুষের কাজ, কর্ম, চিন্তা, অনুভব প্রভৃতি 'দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি'র মারফৎ হয় বটে, কিন্তু তার 'আমি'-বোধটির মূল উৎস বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্তা। মানুষ নিজে অকর্তা, অভোক্তা। 'আমি' যাবতীয় কর্ম ও ভোগের একেবারে নির্বিকার সাক্ষিমাত্র। যদি আমার কোন কাজ থাকে তবে তাহা এই সাক্ষিত্ব; আর যা কিছু কাজ, যা কিছু ভোগ তাহা 'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 'দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি'-সঙ্ঘাতের।

শুদ্ধ ও একাগ্র মনে বিশ্লেষণ করিলে নিজের মধ্যে এই দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ভাগ কর্ম ও ভোগে ব্যাপৃত, অপরটি শুধু দ্রষ্টা হইয়া বসিয়া আছে। প্রথমটি দৃশ্যস্থানীয়, সুতরাং 'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপনিষদ্ এই দুইটি ভাগকে লক্ষ্য করিয়া রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

[ঠিক একই চেহারার দুইটি পাখী একই গাছের উপর বসিয়া আছে;

তাহাদের মধ্যে একটি নানাবিধ স্বাদযুক্ত ফল খাইতেছে—অপরটি কিছুই খায় না, শুধু বসিয়া দেখিতেছে।]

আমি অকর্তা, অভোক্তা, সাক্ষিচেতা। কর্ম-ব্যাপৃত, ভোগ-নিরত অংশটি 'আমি'র আবরণ বা খোলসমাত্র। উহার ভাল-মন্দ, ক্ষয়-বৃদ্ধি, এমন কি, লোপ হইলেও আমার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। আমি নিত্য, শাশ্বত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ঐ খোলসটারই হয়—আমার কখনও জন্ম-মৃত্যু হয় না—হইতে পারে না। এই জন্যই গীতায় আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

কিন্তু খোলসটিকে যতদিন 'আমি' বলিয়া ভ্রম করিব ততদিন সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি আমারই হইতেছে এইরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ মুক্ত। কিন্তু অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে খোলসটিকে 'আমি' মনে করিয়াই তার সংসারচক্রে আবর্তন।

পবিত্র ও একান্ত মনে বিচার ও ধ্যান করিয়া এই খোলসটিকে চিনিতে হইবে, ইহা যে অনাত্মা—'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বুঝিতে হইবে। তখনই আবরণ-মুক্ত 'আমি' নিজের স্বরূপের সন্ধান পাইবে।

বেদান্তশাস্ত্র এই খোলসটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই খোলস একটি নয়—পাঁচটি। ঠিক যেন পেঁয়াজের খোসার মত একটি খোলসের মধ্যে আর একটি। এক একটি করিয়া এই খোলসের পরিচয় করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ দুই একটি খোলসের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে।

খোলসের শাস্ত্রীয় নাম 'কোষ'। প্রথম খোলসটির নাম অন্নময় কোষ।

রক্তমাংসের এই স্থূল শরীরটিকেই অন্নময় কোষ বলা হইয়াছে। একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে এই শরীরের 'অন্নময়' নামটি সার্থক। আমরা যাহা খাই তাহাই অন্ন—ইহাই 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ। এই অন্ন হইতেই, অর্থাৎ আমাদের ভুক্তদ্রব্য হইতেই এই শরীরের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। আমাদের ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ পরিপাক-যন্ত্রের প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, রক্ত, স্নায়ু প্রভৃতি জৈব-পদার্থে পরিণত হয়। আমাদের উদর ও পাকস্থলী যেন একটি রসায়নাগার। সেখানে ভুক্ত-দ্রব্য পৌঁছিলেই উহার সারাংশ বাছিয়া লওয়া হয় এবং ঐ সারাংশের পরমাণুগুলি নূতন সমাবেশ গ্রহণ করিয়া অস্থি-মজ্জা প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। বস্তুতঃ মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক এইভাবেই আমাদের ভুক্ত-দ্রব্য বা অন্ন হইতেই এই শরীরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই ইহার অন্নময় কোষ নাম সার্থক।

ঠিক এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে আমাদের প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য পৃথিবীর মাটি, জল ও বায়ুর রূপান্তর। পৃথিবীর জলমাটিবায়ু হইতে আমাদের খাদ্যের উৎপত্তি এবং খাদ্য হইতে আমাদের স্থূল দেহের উৎপত্তি। এই শরীরের প্রত্যেকটি পরমাণু এইভাবে পৃথিবী হইতে আসিয়াছে এবং মৃত্যুর পর প্রত্যেকটি পরমাণু পৃথিবীতে মিশিয়া যাইবে।

দেখা গেল যে এই শরীরটি কতগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টি এবং পরমাণু-গুলি সবই পৃথিবীর সম্পত্তি। শরীরটি ক্ষণিকের জন্য ঠিক বুদ্‌বুদের মতই পৃথিবী হইতে উঠিয়া পৃথিবীতেই লয় হইয়া যায়। যে পরমাণুর সমষ্টি লইয়া পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে, উহাদেরই এক অংশ জীব ও উদ্ভিদের রূপ ধারণ করিয়াছে, অপর অংশ নির্জীবরূপেই আছে। পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, উপত্যকা, অধিত্যকা, খনি প্রভৃতি যেমন পৃথিবীর অঙ্গ, জীব ও উদ্ভিদের শরীরও ঠিক তাহাই। সজীব ও নির্জীব দুই শ্রেণীর স্থূল পদার্থই একই

উপাদানে গড়া—পৃথিবীর সত্তারই দুইভাবে বিকাশ। ভাঙ্গা-গড়া এবং নিয়ত পরিবর্তনের ধারা উভয় শ্রেণীতেই আছে।

একই উপাদানে গড়া জীবের শরীর ও নির্জীব পদার্থ, এই দুই জাতীয় পৃথিবীর অঙ্গের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহা শক্তির তারতম্যেই ঘটে। আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি জড় শক্তির প্রভাবে নির্জীব পদার্থের গতি, পরিণতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, আর জীব-শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, অনুরূপ সৃষ্টি, মৃত্যু প্রভৃতি নির্ভর করে প্রাণ-শক্তির উপর। এই প্রাণ-শক্তিই ভুক্ত-পদার্থকে দেহ-পদার্থে পরিণত করে এবং দেহ-যন্ত্রটিকে চালিত করে। ইহা আত্মার দ্বিতীয় আবরণ, ইহারই শাস্ত্রীয় নাম প্রাণময় কোষ। এই প্রাণ আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতির মতই জড় শক্তি ; শুধু জড় পরমাণুগুলির উপর ইহার প্রভাবের ধারাটা কিছু স্বতন্ত্র। যতক্ষণ এই প্রাণশক্তি শরীরের মধ্যে থাকে, ততক্ষণই শরীরের জড় উপাদানগুলির গতিভঙ্গি পৃথিবীর অপর নির্জীব পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। এই শক্তি অন্তর্হিত হইলেই আমাদের শরীর পৃথিবীর নির্জীব পদার্থের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়।

পৃথিবী হইতে কতগুলি পরমাণু লইয়া প্রাণ নামক শক্তি এই দেহটি রচনা করিয়াছে এবং ইহাকে সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ এই শরীরের উপাদানও যেমন জড়, ইহার চালক প্রাণশক্তিও তেমনই জড়। ইহার সঙ্গে চেতন 'আমি'র কি সম্পর্ক থাকিতে পারে ? প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের মধ্যে এই শরীরটি যেন একটি তরঙ্গ। আর আমি প্রকৃতিরও ঊর্ধ্বে থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতির দ্রষ্টা বা সাক্ষী হইয়া আছি। শরীরের যাবতীয় কর্মই প্রকৃতির অন্তর্গত ঘটনা, অজ্ঞান-বিমূঢ় হইয়াই শুধু উহার কর্তৃত্বের দাবি আমরা করি।—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

অথচ এই শরীর লইয়াই আমাদের বংশ, জাতি, নাম, রূপ, যৌবন, সামর্থ্য প্রভৃতি জনিত যা কিছু অভিমান। ইহাকে লইয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব। আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ, সংসারের যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাত এই শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানার ফলেই নিয়ত ঘটিতেছে। এমন কি, স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধিও এই শরীরে 'আমি'-জ্ঞান থাকার ফলেই হয়। বস্তুতঃ এই দেহগত ভ্রান্ত 'আমি'-বুদ্ধিই মুক্তিপথের প্রবল অন্তরায়। পৃথিবীর উপাদানে গড়া প্রাণ-চালিত এই শরীরটি চেতন 'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—এই বাস্তবতাটুকু একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মানুষ অনেক বন্ধনের পাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তির পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। এইজন্যই বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত অন্ততঃ অন্নময় ও প্রাণময় কোষের যথাযথ বিচার করিয়া নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা খাঁটি ধারণা করার প্রয়াস সকলের পক্ষেই বিশেষ শুভ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুশীলন বলিয়া মনে হয়।

আমি কে?

[আলোচনার সারাংশ—বিদ্যার্থী, পৌষ ১৩৪৬]

অন্নময় ও প্রাণময় কোষ, শরীর ও প্রাণশক্তি যেমন আমাদের 'আমি'-র স্থূল আবরণ, আমাদের সত্তার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নাই, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষ, মন ও বুদ্ধি-ও তেমনি 'আমি'-র সূক্ষ্ম আবরণ, তার সঙ্গেও আমাদের সত্তার সত্যিই কোন সম্পর্ক নাই।

এক এক জনের মনের এক এক রকমের চেহারা থাকে, এক এক রকমের স্বভাব থাকে, যা সহজে বদলানো যায় না, যা বদলানো এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। সাধারণের কথা ছেড়েই দাও; সমস্ত বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে নিয়ে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত হয়েছেন তাঁদের মনেরও এই স্বভাব বদলায় না। নদীর জল শুকিয়ে গেলেও তার খালটার চেহারা আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি থাকে, একটুও বদলায় না, বাহ্যিক চেহারা ঠিক আগের মতই থেকে যায়। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না; কারণ সে মনে আর বিষয়-বাসনা বা পরের অকল্যাণ-চিন্তা স্থান পায় না। তাছাড়া জ্ঞান হলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, যে মন চিন্তা করে, কথা বলে, সুখদুঃখ অনুভব করে, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই; তার স্বভাব, তার বাহ্যিক চেহারা যেমনই থাক না কেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

সত্যিসত্যিই 'আমি'র সঙ্গে মনবুদ্ধির কোনও সম্পর্ক নেই। গীতায় আছে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূত আর মন বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই

আটটা জিনিষের নাম প্রকৃতি। এদের নাম অপরা প্রকৃতি। এছাড়া আর একটা জিনিষকে গীতায় প্রকৃতি বলেছে। এই যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমরা ভাবি এরা চেতন; ভাবি মন নিজে চিন্তা করতে পারে, বুদ্ধি নিজে ভাবতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—ক্ষিতি, অপ, তেজের মতই জড়পদার্থ, তাদের চেতনা নাই। একটা গ্রামোফোনের যন্ত্র যেমন গান গাইতে পারে, হাসতে পারে, কিন্তু কখনও ভাবতে পারে না যে আমি গাইছি, আমি হাসছি, তেমনি আমি ভাবছি, আমি দেখছি, আমার সুখদুঃখ বোধ হচ্ছে, শুধু মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার বর্তমান থাকলে এরকম অনুভূতি হতে পারে না। মনবুদ্ধিরূপ যন্ত্রের ভিতর জীবাত্মার অবস্থানের জন্য এসব অনুভূতি ঘটে।

এই জীবাত্মা কি? প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার কোন অস্তিত্বই নেই। অজ্ঞানের প্রভাবে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের ওপর চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্যের আরোপ হয়। তার ফলে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের ভেতর 'আমি-'রূপ অস্তিত্ব-বোধ জাগে। তখন মনে হয়, আমি অমুক, আমার এই নাম, আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার সুখ হচ্ছে, ইত্যাদি। এই যে আরোপিত চৈতন্য, এরই নাম জীবাত্মা। গীতায় এর নাম দিয়েছে 'পরা প্রকৃতি'। একটা উদাহরণের ভেতর দিয়ে জিনিষটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ধর এক সরা জল রয়েছে, আর তার ভেতর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে সরার ভিতর যেন একটা সূর্য রয়েছে, আর সেখান থেকে আলো বেরুচ্ছে। কিন্তু সত্যিসত্যি ব্যাপারটা ঘটছে কী? জলের সরায় মোটেই আলো নেই, আলো বেরুচ্ছে একমাত্র সূর্য হতে; সরার জলের গুণে সেখান থেকে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে, এই মাত্র। অথচ পরিষ্কার মনে হচ্ছে যে সরার ভেতর একটা আলাদা সূর্য রয়েছে, আর সেখান থেকেই আলো বেরুচ্ছে। আত্মা হচ্ছেন এই সূর্য, দেহটা সরা। আর মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার তার ভেতরকার জল। 'আমি'-

অনুভূতি একমাত্র আত্মা ছাড়া আর কোন কিছু থেকেই উঠতে পারে না। দেহে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের ভেতর তার প্রতিবিম্ব পড়ায় মনে হচ্ছে তার ভেতর হতেই 'আমি'-বোধ উঠছে। আত্মার এই প্রতিবিম্বের নাম 'জীবাত্মা'। আমি, তুমি, রাম, শ্যাম এইরূপ এক একটা আলাদা আলাদা সত্তা, যার ভেতর থেকে আলাদা আলাদা 'আমি'-বোধ উঠছে। অজ্ঞান যখন চলে যায় তখন দেখা যায় যে, আমার 'আমি'-বোধও যেখান থেকে উঠছে, তোমার 'আমি'-বোধও সেখান থেকেই উঠছে। দুটো আলাদা আলাদা চেতনা নাই; একই চেতনা বিভিন্ন মনবুদ্ধিরূপ যন্ত্রের ভেতর বিভিন্ন 'আমি'-বোধের সৃষ্টি করছে। যেমন একই বিদ্যুৎপ্রবাহ যখন ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন আলো বেরোয়, যখন মেশিনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন গতির সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি। মানুষ যখন এইটা উপলব্ধি করে, তখন সে স্পষ্ট দেখে যে আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, আমি এসকলেরই পারে। এরা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তখন দেখে যে, চিন্তা করা, সুখদুঃখ অনুভব করা, ইত্যাদি যা কিছু কাজ চলছে, তার কিছুই আমি করি না, সে সব মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের এলাকার জিনিষ। প্রকৃতির যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ রয়েছে তাদের প্রভাবে মনবুদ্ধি প্রভৃতিতে প্রকৃতি দ্বারা সে সব কাজ আপনাআপনি ঘটে—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।' কিন্তু যতক্ষণ না এরকম উপলব্ধি হয়, যতক্ষণ আমি অমুক এরকম উপলব্ধি থাকে, ততক্ষণ জীব অজ্ঞানাবদ্ধ থাকে, 'অহঙ্কার-বিমূঢ়' থাকে, ততক্ষণ সে মনে করে আমিই বুঝি কাজ করছি—'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।'

এখন, যতক্ষণ সরার জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যে আমি-বোধ থাকে, ততক্ষণ সরার জল কাঁপলেই মনে হয় আমি কাঁপছি। কিন্তু সত্যিকারের সূর্যের, সত্যিকারের চেতনার সন্ধান পেলে দেখা যায় সরার জলের ধর্ম কাঁপা, তাই

সে কাঁপে, আমি কাঁপি না ; তার কম্পন আমাকে স্পর্শও করতে পারে না। কাজেই অজ্ঞান একবার দূর হয়ে গেলে সরার জল যেভাবেই কাঁপুক না কেন, মনের চেহারা যেমনই থাকুক না কেন, 'আমার' তাতে কিছু আসে যায় না, 'আমি' তার নাগালের ঢের দূরে থেকে যায়।

এই অজ্ঞান দূর করা যায় কেমন করে ? অজ্ঞান দূর করতে গেলে বারবার নিজের স্বরূপের কথা ভাবতে হয়। আমি দেহ নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি অহঙ্কার নই, এইভাবে ধ্যান করতে হয়। তবে এই অজ্ঞানের বাইরে যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।' কিন্তু যে মনেপ্রাণে ভগবানের শরণাপন্ন হয় তিনি তার অজ্ঞান দূর করে দেন।

ভাবা তো 'আমি'-র কাজ নয়, তবে আমি মন নই, বুদ্ধি নই একথা ভাববে কে ? মন দিয়েই এসব ভাবতে হয়। যে মনে আমি দেহ, আমি মন, আমি বুদ্ধি এসব চিন্তা ওঠে, সেই মন দিয়েই চিন্তা করতে হয়, আমি মনবুদ্ধির অতীত। এইরকম চিন্তা করতে করতে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মাবগাহী হয়, তখন সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার স্বরূপ ফুটে ওঠে। তখন বুদ্ধিও লোপ পায় এবং আত্মার সহিত 'আমি'-র একত্ব অনুভূত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ভগবান "অবাঙমনসোগোচরম্‌" হলেও শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর।

বহিঃপ্রকৃতি ও মন

[আলোচনার সারাংশ—বিদ্যার্থী, চৈত্র ১৩৪৬]

শীতের পর বসন্তের আগমনে মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তির অনুভূতি হয়। সাধারণ লোকের মনে এই সময় sex urge বেশী করে প্রকাশ পেতে চায়। সাহিত্যিক ও কবির দল বসন্তের বর্ণনার মধ্যে তাই সেই জিনিষটাই directly বা indirectly ফুটিয়ে তোলেন। তাই বলে যদি মনে করা যায় যে, বসন্তের প্রকৃতিই sex instinct জাগিয়ে দেবার জন্য দায়ী, তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, একথা খুবই সত্য। বহিঃপ্রকৃতি মনকে নিস্তেজ বা সতেজ করে তোলে। মন যখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তখন যে জিনিষটা ভাল লাগে, সেই দিকে তার চিন্তাধারা বেশী করে বইতে থাকে। সাধারণ লোকের মন sex plane-এ মশগুল রয়েছে, তাই বসন্তের আগমনে তাদের মনে ঐ ভাবই বেশী জেগে ওঠে। আবার যাদের মন অন্য plane-এ রয়েছে, ভগবানের চিন্তা, ধ্যান-ভজনে যাদের মন বেশী আনন্দ পায়, প্রকৃতির এই রকম অবস্থায় তাদের মনে ভগবদ্-চিন্তার উদ্দীপনা হয় খুব বেশী।

আমাদের যোগশাস্ত্রে মনের energy-র নাম দিয়েছে 'কুলকুণ্ডলিনী শক্তি', যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, মানুষের শরীরের ছয়টি বিভিন্ন জায়গায় ছয়টি পদ্ম আছে। সেই সব পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী অবস্থান করেন। সাধারণ লোকের ভিতর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিম্নাঙ্গে আবদ্ধ থাকেন—তাই তারা শিশ্নোদর-পরায়ণ হয়। তার চেয়ে মনের উঁচু অবস্থা হয় কুলকুণ্ডলিনী যখন হৃদয়ে ওঠেন, তখন স্থূল বিষয়-বস্তু ছেড়ে মন ভাবরাজ্যে বিচরণ করে, এই অবস্থায়

মন উঠলে, বাইরের প্রকৃতি যখন তার কুলকুণ্ডলিনী শক্তির অধিক বিকাশের সহায়ক হয়, তখন মন হু হু করে উপরের দিকে উঠতে থাকে। তার চেয়ে আরও আরও উঁচু অবস্থায় উঠে কুণ্ডলিনী শক্তি যখন একেবারে সহস্রারে ওঠেন, তখন ভাবরাজ্যও অন্তর্হিত হয়, মনও অন্তর্হিত হয়—পরমাত্মার সহিত একত্বানুভূতি হয়। মনের এই অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে, এই অবস্থার কাছাকাছি থাকলে বাইরের প্রকৃতির সামান্য সাহায্যেই মন একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যায়।

দার্শনিক Freud-এর চিন্তাধারা অনেকটা এই দিকেই এগিয়ে গেছে। তবে আমাদের যোগশাস্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী ও মানসিক অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে তাঁর মতবাদ নিম্নস্তরের এবং কতকাংশ ঠিক নয় বলে মনে হয়, তবে এই ধারাতেই যে তাঁর চিন্তা প্রবাহিত এবং কুলকুণ্ডলিনীর বর্ণনার সঙ্গে এর যে একটা যোগাযোগ আছে, সেটা পরিষ্কার দেখা যায়। Freud এর মতে যা কিছু কাজকর্ম, গতিবিধি, চিন্তা সকলেরই মূলে রয়েছে libido বা sex impulse. যে শক্তির দ্বারা মন চালিত হয়, sex impulse হচ্ছে সেই শক্তি। তবে তিনি একথাও বলেন যে, এই শক্তিকে মানুষ উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। যে সব মানুষ ইন্দ্রিয়-সংযম করে উচ্চভাব নিয়ে জীবন কাটায়, Freud-এর মতে তাদের মনের পরিচালক libido উচ্চতর প্রবৃত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

অধিকাংশ লোকের অনেক কাজকর্মের মূলে থাকে sex impulse. কাজেই Freud-এর মতবাদের এদিকটা সত্য। কিন্তু এই শক্তিকে মানুষ অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে, একথাটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। যে energy (কুলকুণ্ডলিনী) মনকে চালায় তার কখনও পরিবর্তন হয় না। তার বিভিন্ন পদ্মে অবস্থানের সময় মনে তদনুযায়ী চিন্তাধারা ওঠে। কুলকুণ্ডলিনী যখন নীচে থাকেন, মনও নীচে থাকে। আবার যখন উপরে

ওঠেন, তখন সেই মনই উচ্চচিন্তায় নিযুক্ত থাকে। পরিবর্তন যা কিছু হয় স্থানেরই, energy-র হয় না। Freud-এর সঙ্গে এখানে মেলে না। এখন কথা উঠতে পারে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে যোগশাস্ত্রে এই যে সব দ্বিদল, দ্বাদশ দল, শতদল, সহস্রদল পদ্মের কথা লিখিত আছে, এইগুলি সত্যিসত্যিই আছে কিনা?

আছে নিশ্চয়ই, তবে শরীর কেটে খুঁজলে সেগুলো যে পাওয়া যাবে তা নয়। দৃশ্যমান স্থূলজগতের মত একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে। এসব জিনিষগুলো সেই জগতের অন্তর্ভূত পদার্থ দিয়ে তৈরী। স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে, স্থূল মন দিয়ে সে জগতের কিছু দেখা যায় না। সাধন করতে করতে মন যখন উন্নত হয়, যখন সেই সূক্ষ্ম জগৎ দেখবার মত তার ক্ষমতা আসে, তখন এসবগুলো সে প্রত্যক্ষ করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যেই আছে, তিনি এইসব পদ্ম, কুণ্ডলিনীর গতি, ইত্যাদি দেখতে পেতেন, অনেক জায়গায় তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন—পদ্মগুলো প্রথমে কিরকম নীচের দিকে মুখ করে থাকে, আর দলগুলো সব বন্ধ থাকে। কুণ্ডলিনীশক্তি যখন উপরে ওঠেন, তখন তাদের দলগুলো খুলে যায়, তারা ঊর্ধ্বমুখ হয়, এবং ক্রমশঃ নানারূপ অলৌকিক দর্শনাদি হয়ে থাকে।

'যমেবৈষ বৃণুতে'

[আলোচনা—বিদ্যার্থী, আশ্বিন ১৩৩৪]

চণ্ডীতে একটি সুন্দর ভাব রয়েছে। কাল সেটির কথা ভাবছিলাম। আজ তাই বলব। চণ্ডীতে আছে, মা ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী প্রভৃতি রূপ ধরে শুম্ভের সঙ্গে লড়ছেন দেখে সে হেসে বল্লে, "এই তোমার একা যুদ্ধ করা! তুমি তো দেখছি অনেককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করছ।" মা তখন হেসে বল্লেন, "মূর্খ, এরা কি আমা থেকে আলাদা—এরা যে আমার ভিতর থেকেই বেরিয়েছে"—বলেই মা তাদের নিজ শরীরে লীন করে নিলেন। এখন ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী এদের যেমন আমরা মা বলেই মনে করে থাকি তেমনি ধারা যদি জগৎটাকে মার বিভূতি—মা হতে উদ্ভূত বলে ভাবতে পারি, জানতে পারি, তবেই তো সব গোল চুকে যায়। তিনি কি শুধু ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী প্রভৃতিকে সৃষ্টি করেছেন? এ সমস্ত জগৎকেই তিনি ভিতর থেকে বের করেছেন—আবার প্রলয়ের কালে নিজের ভিতর টেনে নিচ্ছেন। তবে ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণীকে যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা করি জগতের আর সকলকে সে ভাবে করি না কেন? সকলই তো মায়ের বিভূতি। এই বালিসটিও ত মা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরূপ ভাবাই হচ্ছে পরম সাধন। দিনরাত এইভাবে সবকিছুকে মায়ের বিকাশ বলে জানতে হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাব নিয়েই ত বেশ্যাকেও মা বলে দেখেছিলেন। বস্তুতঃ শুম্ভের মত চশমা চোখে আছে বলেই আমরা জগৎকে মা বলে ভাবতে পারি না। সে চশমা খুলে গেলেই দেখব মা-ই সব হয়েছেন। ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী মানে কিনা ইন্দ্রের শক্তি—ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার শক্তি—ব্রহ্মত্ব, রুদ্রের শক্তি—রুদ্রত্ব; মা যে শুধু

এই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, রুদ্রের রুদ্রত্বই নন ; তিনি বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব—সকলের সকলত্বরূপে বিরাজ করছেন।

গীতায়, বিশেষ করে বিভূতি-যোগে, এই ভাবটি রয়েছে। সকলকে ভগবানের বিভূতি বলে ভাবা কঠিন ; সেজন্য যা কিছু বিশেষ শক্তি আছে, সবই ভগবান তাঁর নিজের বলে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন বলে আলাদা একটি লোক রয়েছে, এ ভাবার চেয়ে তিনিই অর্জুনরূপে বিরাজ করছেন, এ ভাবা অনেক ভাল। যা কিছু বিশেষ শক্তি সবই ভগবানের বলে ভাবতে ভাবতে আমরা ক্রমে সবই তাঁর শক্তির বিকাশ বলে ভাবতে সক্ষম হব। ভগবান নিজের বিভূতির কথা গীতায় অনেক বলে শেষে বলেছেন, "আমার বিভূতির অন্ত নাই, যা কিছু 'ঊর্জিতম্'—বলযুক্ত—সবই আমি। অধিক কি বলব—আমার একাংশেই জগৎ রয়েছে—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'—ঋষিরা এই তত্ত্ব বহু প্রাচীনকালেই সাক্ষাৎকার করেছিলেন ; মুণ্ডকোপনিষদে আছে—অগ্নি হতে যেমন নানা স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, তেমনি ভগবান থেকে জগৎ বেরিয়েছে। অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ একই। আর কঠোপনিষদে রয়েছে—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

উপনিষদেরও আগে হিন্দুরা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

সেই সহস্রশির, সহস্রচক্ষু পুরুষ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন, আবার তার

বাইরেও রয়েছেন। এই স্থূল জগৎ তিনি বই আর কিছু নয়. আর এর পারে যে সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ রয়েছে, সেও তিনি। সমস্ত জগৎকে তাঁর বিকাশ বলে ভাবতে না পারলেও আমরা যদি বিশেষ বিশেষ বস্তুকে তাঁর বিকাশ বলে ভাবতে আরম্ভ করি, তাহলেও আমরা এগুতে পারবো। এই সব মহারাজদের (ঠাকুরের সন্তানদের) আমরা যদি ঠাকুরের বিভূতি বলে ভাবতে পারি—তিনিই তাঁর ভিতর থেকে এদের বের করে নানারূপে লীলা করছেন বলে ভাবতে পারি—তাতেও আমাদের অনেক সাধন হয়ে গেল। এভাবে যতই একত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই আনন্দ, কেবল আনন্দ। তাই উপনিষদে আছে—"যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।" (অর্থাৎ ভূমাতেই পূর্ণানন্দ।) এবং "যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।" (অর্থাৎ একত্বানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত আংশিক আনন্দ।)

এই জগৎ মহামায়ার বিভূতি—কি করে যে তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরাও দেখেছেন, ঋষিরাও অনুভব করেছেন, এই বাইরের স্থূল জগৎ আলোকের স্পন্দন বই আর কিছু নয়। ঈথর-এ নানা রকম স্পন্দন হচ্ছে আর আমরা তাকেই রূপ, রস, মানুষ, ঘোড়া, গরু বলে ভাবছি। এ কিরকম করে হয়? মন রয়েছে বলে এরূপ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। মনেতেই আকাশের কোনও স্পন্দন রূপ, কোনটি রস, আর কোনটি মানুষ বলে অনুভূত হচ্ছে। আর মনের পশ্চাতে বোধস্বরূপ চৈতন্য রয়েছেন বলে এসকলের জ্ঞান হচ্ছে। সেই মহাশক্তি এক রূপে জড় মন ও আকাশ হয়ে রয়েছেন, আর এক রূপে চেতন হয়েছেন; আর দুয়ের সংযোগে জগৎ বলে একটা পদার্থের ভান হচ্ছে। মনটা যেন একটা কালো পর্দা—তার মাঝখানে একটা গর্ত আছে। আকাশের স্পন্দনে সে গর্তের আকার কেবলি পরিবর্তিত হচ্ছে। সে কখন সুখের আকার ধরছে, কখন দুঃখের আকার ধরছে, কখন

হাতী, কখন বা মানুষ হচ্ছে। আর এ পর্দার পশ্চাতে রয়েছেন চৈতন্য; গর্তের ভিতর দিয়ে চৈতন্যের আলো বাইরে আসছে, আর আমাদের সুখ, দুঃখ, হাতী, মানুষ এই সবের অনুভূতি হচ্ছে। মায়ার দুটি শক্তি আছে, একটি আবরণ-শক্তি, অন্যটি বিক্ষেপ-শক্তি। একটি শক্তি পরদা, চৈতন্যকে সে ঢেকে রেখেছে, তাই অনন্ত চৈতন্যের অনুভূতি হচ্ছে না। আর যে শক্তিবলে গর্তটির আকার বদলাচ্ছে, তা হচ্ছে বিক্ষেপ-শক্তি, তাতেই চৈতন্যের রশ্মি পড়ে নানারূপ অনুভূতি জাগাচ্ছে। চেতনের স্বভাবই হচ্ছে যে সে নিজে রয়েছে বলে অনুভব করে। জড় কাকে বলি? যার 'আমি আছি' বলে বোধ নেই। আমরা কি ভাবতে পারি যে আমরা নেই? তা কখনও হয় না, কাজেই আমরা চেতন। কাউকে যখন ক্লোরোফরম করে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়, তখন তার রূপ-রসের অনুভূতি হয় না, কারণ তখন তার মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়; সুষুপ্তিও তাই। সেই মহাশক্তিই সব হয়েছেন। ভগবানকে আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ করছি। আমাদের যে স্ত্রী-পুরুষ বোধ হচ্ছে, মমত্ব-বোধ হচ্ছে, সুখের বোধ হচ্ছে—সেই বোধের শুধু বোধটুকুই তিনি—তিনি বোধস্বরূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আছে, নানারকম বাদ্যযন্ত্রে নানারূপ শব্দ হচ্ছে, সেখানে নানারূপত্ব বাদ দিয়ে কেবল শব্দ বলে যেমন একটি পৃথক বস্তু রয়েছে, তেমনি নানারকম বোধের নানারকমত্ব বাদ দিলে যে নির্বিশেষ বোধটুকু থাকে, তাই ভগবান।

প্রশ্ন: মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। মন স্থির করলে বিক্ষেপের বিনাশ হয়, আবরণ তখনও থাকে। তাহলে মন স্থির করে জ্ঞান-লাভ কিরূপে হয়?

উত্তর: মানুষ সাধন করে মুক্ত হয়, এরূপ ভাবা উচিত নয়। কি আবরণ, কি বিক্ষেপ—হাজার চেষ্টা করেও কিছুই সে দূর করতে পারে না

মহামায়ার কৃপা না হলে। গীতায়ও রয়েছে, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

তিনি কৃপা করে মুক্তি না দিলে জীবের কী সাধ্য যে সে মুক্ত হয়। জীব যে সাধনভজন করে, তার মানে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া—তাঁর কৃপাপ্রার্থী হওয়া। তিনি কৃপা করে তাকে পার করলে তবে সে পার হতে পারে; ভক্তিশাস্ত্রও তাই বলেন। বেদান্তেও তাই রয়েছে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—সেই আত্মা যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে পায়। সুতরাং আবরণ বা বিক্ষেপ কোনটাকেই আমি সাধন করে দূর করে ফেলবো, এ ভাবা জীবের উচিত নয়।

তাছাড়া মন স্থির করবার যে সকল পন্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, মানুষ তার অনুসরণ করে যখন মনের বিক্ষেপ দূর করে তখনই মহামায়া কৃপা করে তাঁর মায়ার আবরণ তুলে নেন, তবে তার জ্ঞান হয়, অন্য উপায় আর নাই। শঙ্কর অবশ্য বলেছেন, জীব নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ ভেবে ভেবেই তা হয়ে যায়। তাঁর সাধন-পদ্ধতিতে প্রার্থনাদির স্থান নাই। রামানুজ কিন্তু বলেছেন, সাধনভজন করে জীব মনের বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দূর করে, আবরণ দূর করবার জন্য যখন ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে থাকে, তখন সে আবরণ দূর করা তাঁরই হাত—কখন, কিভাবে দূর করবেন তা তিনিই জানেন। জীব সাধনভজন করে এই অবস্থা লাভ করতে পারে। কিন্তু এ সাধনভজনও তাঁর কৃপা-সাপেক্ষ। তবে এখানে জীবের পুরুষকারের একটু স্থান আছে। এ খুব আনন্দের অবস্থা। বেদান্তে একে আনন্দময় কোষ বলেছে এবং এ অবস্থায়ও সাধককে স্থির থাকতে বলেনি—বলেছে, এ আনন্দও জ্ঞানলাভের বিঘ্ন। সুষুপ্তিতে যদি জ্ঞান থাকে তবে যা হয়, এ অবস্থাও তাই। দেখা যায়, একবার সুষুপ্তি হলে লোক পুত্রশোক ভুলে যায়। আর তার সঙ্গে যদি consciousnessটি থাকতো, তবে কি যে হত সে কি আমরা কল্পনা

করতে পারি? এই অবস্থায় থেকে হরি মহারাজ বলতেন—আর কি করি, ঠাকুরের দুয়ারে কুত্তাকা মাফিক পড়ে আছি। তিনি কৃপা করলে সব হয়। এ হচ্ছে শরণাগতের অবস্থা। ভগবানকে ডাকব না অথচ অন্য সবকিছু করব, এ রকম শরণাগতি এ নয়; এ হচ্ছে পুরুষকার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকা।—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।"

সাধনের দ্বারাই এ অবস্থা লাভ হয়, তারপর সব তাঁর হাত। এই যে ভগবানের প্রসঙ্গাদি হচ্ছে, এও একরকম সাধন। দিনরাত্রি তাঁর কথা শোনা, এ সকল তত্ত্বের আলোচনা করা, এসব কর্তে কর্তে ক্রমে বিক্ষেপগুলো চলে যায়, মন শুদ্ধ হয়। স্বামিজী বলেছেন, "**Hear of it from day to day, think of it from month to month, meditate on it from year to year, nay from birth to birth.**"
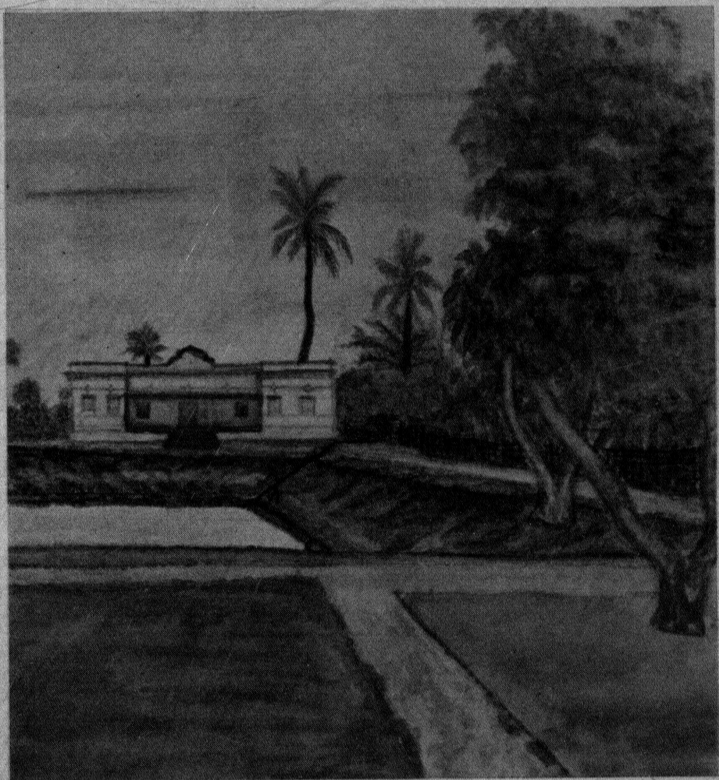
বিদ্যার্থী আশ্রম, গৌরীপুর
(শিবানন্দধাম)

স্বামী নির্বেদানন্দ কর্তৃক অঙ্কিত

রসস্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ

[রম্য রচনা—বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪]

স্বপ্নের বিষয়কে ভাষা দিয়ে রূপ দেওয়ার সামর্থ্য যার আছে সে কবি। আমি কবি নই, সুতরাং ঐ কাজটি আমার অধিকারের বাইরে। তবুও আমার অদ্ভুত স্বপ্নটার একটা যা-হোক রূপ দেওয়ার জন্য গোটা কতক আঁচড় কাটার প্রলোভন সামলাতে পারছি না। অধিক ভূমিকা অনাবশ্যক। সুধী ও রসিক পাঠক যদি এ অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে কিছু রস পান—এই ভেবেই নেহাৎ আটপৌরে ছাঁদে দাগ কাটতে সুরু করলুম।

কয়েকদিন ধরে রিপণ কলেজের প্রতিভাশালী প্রফেসর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস. মহাশয়ের 'Romance and Reality in Keats' শীর্ষক গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ পড়ছিলাম। বইখানা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল! দেখি মনটা বিষাদে ভরে উঠেছে। প্রতিভাবান কীট্‌স্ বেচারীর অতৃপ্ত বাসনার এবং কঠোর নিয়তির কাছে শান্ত আত্মনিবেদনের ইতিহাসটা একটা উৎকট পীড়ার মত বুকটা যেন দখল করে বসেছে। মগজটাও ঐ ইংরাজ কবির বিয়োগান্ত, করুণ জীবননাটকের চিন্তায় গুলিয়ে উঠেছে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের এই অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত আলোড়ন নিয়ে বেশী সময় কাটাতে হয়নি তাই রক্ষা! "নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা" মহামায়াই এযাত্রা এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ করলেন। কখন চোখ দুটি বুজে এলো এবং বাইরের সংজ্ঞা সরে পড়ল তা ঠিক জানি-না।

হঠাৎ দেখি একটা অনির্দেশ্য শঙ্কা ও ব্যথা নিয়ে এক বিপুল জনতা শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছে। ইহার মধ্যে আমিও একপাশে বসে আছি। সকলের মধ্যেই একটা মৌন গাম্ভীর্য। উৎকণ্ঠায় সেখানকার বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে ছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উৎকট পীড়ার সমবেদনায় উপস্থিত এই জনমণ্ডলীর অন্তর সুবিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়ের মুখ থেকে একটা আশ্বাসের বাণী শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছিল। রোগশয্যার পাশে দাঁড়াবার ব্যাকুল আগ্রহটা খুব জোর করেই চেপে ছিলাম, কারণ চিকিৎসকদের সুব্যবস্থায় রোগীর গৃহে প্রবেশ করার পথ ছিল রুদ্ধ। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলাম না। জনতার মধ্যে বসে থাকার ধৈর্য অল্পক্ষণেই হারালাম। কবিবরকে একটিবার মাত্র দর্শন করার তুর্নিবার আগ্রহ আমাকে যেন যন্ত্রের মত চালিত করে তাঁর কক্ষের অতি নিকটেই নিয়ে এল। সেখানে আর কেউ নাই। স্থানটি অতি নিরালা। সহসা দেখি কবিবরের গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত এক ইংরাজ যুবক আমার সামনে উপস্থিত। চেহারাটি কৃশ, ললাট প্রশস্ত এবং চক্ষু তুটি অতীব উজ্জ্বল। মূর্তি প্রশান্ত। মনে হল যেন একটি অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত কোন গ্রীক স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। লোকটি বিজাতীয় তো বটেই, বিজগতীয় বলেও মনে হল। একটু শিউরে উঠলাম। মানুষ ত? মূর্তি একটু হেসে কথা কইল। কথার স্বর ও ভঙ্গিতে আমার পূর্বের সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠল। তথাপি অন্তরের কৌতূহল ভয়ের পথ রোধ করে দাঁড়াল। মূর্তির কথায় সহজভাবে কান দিলাম। মূর্তি যেন আমার মনের ভাব বুঝেই বলল, "ভয় নেই, বিস্ময়েরও কিছু নেই। হ্যামলেটের মুখ দিয়ে কবিসম্রাট সেক্সপীয়র যে বাণী বলিয়েছিলেন তা মনে নেই?—'There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.' (হোরেসিও, স্বর্গ-মর্ত্যে এমন অনেক চিজ আছে যার কথা

তোমার দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।) তবে আর ঘাবড়াচ্ছ কেন? যা বলি তাই কর। আমার পাশে এসে আমার ডান হাতখানি স্পর্শ করে চোখ বুজে একটু দাঁড়াও।" মনে মনে তথাস্তু বলে এবং সংস্কারগত রামনাম স্মরণ করে মূর্তির আদেশ পালন করলাম।

মুহূর্ত পরে মূর্তির আদেশে চোখ খুলে দেখি দেশ ও কালের এক বিপর্যয় ঘটে গেছে। এ কোথায় এলাম? এখানকার সবই কেমন এক অজানা সৌন্দর্য দিয়ে গড়া। আকাশ-বাতাস, মাটি-জল, গাছপালা সবার মধ্যেই যেন মধুচ্ছন্দ প্রবাহিত। একটা অপার্থিব জ্যোতিতে স্থানটা পরিপূর্ণ। ইংরাজ যুবক অধরে এক চাপা হাসি নিয়ে আমার কাছে অতি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মনটা আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরে গেছে। অবাক হয়ে সঙ্গীটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আবার একটু হেসে আমার কাঁধের উপর তাঁর ডানহাতখানি অতি সন্তর্পণে স্থাপন করে পূর্বের মত অমৃতস্রাবী ভাষায় বলতে লাগলেন:

"ছ্যাখো, তোমাকে একটি গূঢ় কথা বলবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি। ভয় পেয়োনা। স্থানটার একটু পরিচয় দিই। এটি কবির জগৎ[১]। পৃথিবীর কবিরা দেহত্যাগ করে এখানেই আসেন, তাঁদের স্বপ্নটা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্য। অবশ্য এখানে তাঁরা চিরকাল থাকেন না। একটা অনির্দিষ্ট নিয়তির প্রভাবে কিছুকাল এখানে থাকার পর তাঁদের গিয়ে আবার মানুষের ঘরে জন্মাতে হয়—পূর্ব-জন্মের সূত্র ধরে রচনার জাল নূতন করে বোনার জন্য। যাই হোক, আমি আজ যে গূঢ় কথা বলার জন্য তোমাকে এখানে এনেছি সেটা এবার শোন। কথাটা শুনলে হয়তো চকিত সজারুর গায়ের কাঁটার মত ('like the quills upon the fretful porcupine') তোমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠবে। তবে এ কাহিনী শুনে তোমার পুলক

১ cf. Ode on the Poets—Keats.

হতে পারে, কিন্তু ভয় পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। রক্ত জমাট বাঁধবে না। এর মধ্যে নরহত্যা বা ব্যভিচারের কোন সম্পর্ক নাই। তুমি স্থির এবং শান্ত হয়ে শোন। কথাগুলি বলে ফেলতে পারলে যেন আমার মনটা হালকা হয়ে যায়, তাই বলবার জন্য আমার এত গরজ।

"আমি নেহাৎ অপরিচিত নই। আমার নাম শুনলেই তুমি আমাকে চিনতে পারবে। আমার নাম জন্ কীট্‌স্। ১৮২১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী আমার মৃত্যু হয় ইতালীতে, রোম নগরে। জন্ম হয়েছিল ইংলণ্ডে ১৭৯৫ সালের ২৯শে অক্টোবর। ছাব্বিশ বছর পেরুতে না পেরুতেই যক্ষ্মারোগে দেহরক্ষা করি। সারা জীবনটা কেমন করে কাটিয়েছি তা তোমার অজানা নেই। তবুও আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট করার জন্য ঐ বিষয়ে গোটা কতক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ·

"যৌবনে যশের আকাঙ্ক্ষায় কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হই। অবশ্য কাব্যরসটা জন্ম থেকেই রক্তের সঙ্গে যেন মিশে ছিল। তখনকার দিনের যশস্বী কবিদের (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ্ প্রভৃতি) সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হওয়ার সুযোগ আমার কবিত্বের নেশাটাকে বিলক্ষণ বাড়িয়ে তুলেছিল। শিল্পী ও সাহিত্যিক হেডন্ (Haydon) আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে যে আমি নেহাৎ কেউকেটা নই, আমার ভেতর একটা জিনিয়াস্ (genius) আছে। উদ্যম আরও বেড়ে গেল। যৌবনের কল্পনায় কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভের রঙীন স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। মনে মনে সাক্‌রেদীও করলাম অনেকের। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, এমন কি, হেডন্ এবং লি হাণ্টও বাদ পড়েননি। অবশ্য ক্রমে এঁদের প্রভাব কাটিয়ে সহজেই নিজের পথে এগিয়ে পড়লুম। কিন্তু কবুল করতে বাধা নেই যে সেক্সপীয়র মগজের এককোণে রীতিমত জেঁকে বসেছিলেন অনেকদিন। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল, জীবনের শেষ দিকটায় মিল্‌টনের প্রভাবও বিলক্ষণ অনুভব করেছি।

"যাই হোক, কবিতার রঙীন স্বপ্নের নেশা, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সুগভীর অন্ধবিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠালাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরটাকে রীতিমত উদ্বেল করে রেখেছিল বিশ বছর অতিক্রম করার পর থেকে বহুদিন। জগতের নিষ্ঠুর বাস্তবতা আমাকে আঘাত দিয়েছে যথেষ্ট। হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও কাব্যশক্তির মরীচিকা শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে সংসারের জ্বালাময় মরুভূমির উত্তপ্ত বালিশয্যায় কে যেন জোর করে আমাকে কখনো কখনো চেপে ধরেছে। অভাব, অনটন, সমালোচকের নিষ্ঠুর আঘাত, সহোদরের দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা, সবই যেন ষড়যন্ত্র করে আমার অন্তরের রসটুকুকে নিঃশেষে লোপ করে দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য আমি অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে 'কাব্যামৃত রসাস্বাদ' করে বাস্তবতাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতে মনে কোন স্থায়ী শান্তি পাইনি। বাস্তবতার সঙ্গে আমার কবি-কল্পনার বিরোধটা এতই প্রবল ও উৎকট হয়ে উঠেছিল যে এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না করতে পেরে জীবনটা একেবারে ভিত্তিহীন ও অর্থহীন একটা দুর্বোধ্য জটিল হেঁয়ালির মত দিনরাত আমাকে পীড়ন করছিল। একবার মনে হল আমার প্রতিষ্ঠাকামী, কবিতাপ্রিয় 'অহং'টাকে একেবারে লোপ করে দিই। তোমার বোধ হয় মনে আছে, আমি বেইলীকে (Bailey) লিখেছিলাম, 'Yet I am old enough or magnanimous enough to annihilate self.' (তবুও, যে-বয়স আমার হয়েছে, অথবা যতটা উদার আমি হতে পেরেছি তাই আমার 'অহং'টাকে নাশ করার পক্ষে যথেষ্ট।) জগৎটা যেমন আছে ঠিক তেমন করেই তাকে দেখতে চেয়েছিলাম—আমার ব্যক্তিগত কল্পনার রং তার উপর ফলাবার ইচ্ছাটা বড়ই অর্থহীন হয়েছিল। তাই আমার কবি-'অহং'টাকে একেবারে নির্মূল করব ভেবেছিলাম।[২]

২ "Whenever his self assumes prominence with its illusions, Keats

"আমি বড় ভাবপ্রবণ ছিলাম। অপরের বেদনা কি জানি কেমন করে আমার হৃদয়টা দখল করে বসত। নিজের কথা ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আমি যেন সমবেদনায় অপরের মধ্যে আমার সত্তাটা হারিয়ে ফেলতাম। জগৎটাকে একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মত পীড়াদায়ক মনে হত। তাই কখন কখন মনে হত আমার কবিতা লেখার পালাটা যৌবনে শেষ করে পরিণত বয়সে জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করব।[৩]

"কঠোর বাস্তবতার হাত থেকে আত্মরক্ষার এক কৌশল কেমন করে একদিন আবিষ্কার করে ফেললাম। মনে হল সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি দ্বন্দ্বের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকতে পারলে সংসারের সকল অবস্থাকেই শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারব। এবং এই গ্রহণ করাটাই মনে হয়েছিল জীবনের চরম উৎকর্ষ-লাভ।[৪] মনে হয়েছিল, বিপদে ধৈর্য ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তিটা যাচাই করে নিতে পারে। তাই বেইলীকে (Bailey) একবার লিখেছিলাম, 'The first that strikes me on hearing a misfortune having befallen another is this—Well, it cannot be helped ; he will have the pleasure of trying the resources of his spirit.' (কেউ কোন দুর্দৈবের খপ্পরে পড়েছে শুনলে পয়লাই মনে হয়—তাইত, এ মুস্কিলের আসান ত কিছু দেখছি না ; যাই

lays the frosty finger of realistic judgement on it. The 'self' must be 'annihilated'. It was emerging from bondage and influence and tutelage, it was assuming an independent identity. Quite true. But it must not impose itself on the scheme of things. It must be 'annihilated' so that the great objective may find full recognition."—'Romance and Reality in Keats' by N. N. Chatterjee.

৩ "I am ambitious of doing the world some good: if I should be spared, that may be the work of maturer years—in the interval I will assay to reach as high a summit in poetry as the nerve bestowed on me will suffer."—'Romance and Reality in Keats' by N. N. Chatterjee.

৪ "O folly! for to bear all naked truths. And to envisage circumstance, all calm, that is the top of sovereignty."—Keats' Hyperion.

হোক, এর ভিতর দিয়ে বেচারী তার অন্তরাত্মার শক্তি যাচাই করার আনন্দটা পাবে।) ভাল কথা, তুমি তো গীতা পড়েছ; তুমি আমার এ ভাবটি গীতার কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সহজেই ধারণা করতে পারবে।

"এই ভাবটা ক্রমে আমাকে আর এক ঘাট এগিয়ে নিয়ে গেল। আমার মনে হল সংসারের আঘাত নীরবে বীরের মত সহ্য করার মধ্য দিয়ে তৈয়ারী হয় মানুষের অন্তরাত্মা।—হেসে। না। তুমি হয়তো মনে করছ অন্তরাত্মা তৈয়ারী হয় না, প্রকাশ হয়। সেকথা এখন আমিও জানি এবং সত্য বলেই মানি। তবে, তখন আমি গীতা উপনিষদ পড়িনি; আমার সহজ বুদ্ধিতে কাব্য ও বাস্তবতার সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে যে জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলাম তারই কথা বলছি। পূর্বে শেলীরই (Shelley) মত আমারও মনে হত বটে যে জগৎটা একটা অশ্রুর উপত্যকা—('Vale of tears')। কিন্তু আমার এই নূতন জ্ঞানের আলোকে পূর্বের ধারণাটা নেহাৎ একটা কুসংস্কার বলে মনে হল। জগৎটার রূপ যেন পালটে গিয়ে আমার কাছে অন্তরাত্মা-নির্মাণের উপত্যকা ('Vale of soul-making') সেজে বসল।[৫]

"আমার মনে হয়েছিল সংসারের ঝড়ঝাপটা মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি করে এবং এই সংঘর্ষ থেকেই গড়ে ওঠে তার অন্তরাত্মা। এইটেই হচ্ছে নিষ্ঠুর বাস্তবতার চরম সার্থকতা। হিন্দু-সংস্কার নিয়ে তুমি সহজেই বুঝতে পারবে যে আমি অতি সহজভাবেই এবং নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই কর্মযোগের পথে এগিয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু একথাও বলা দরকার যে আমার বুদ্ধিতে যে-জ্ঞানটা সহজেই উপস্থিত হয়েছিল সেটা কিন্তু

৫ কীট্‌স্ এক সময় লিখেছিলেন, "The common cognomen of this world among the misguided and superstitious is 'a vale of tears' from which we are to be redeemed by a certain arbitrary interposition of God and taken to Heaven. What a little circumscribed straitened notion: call the world if you please 'the vale of soul-making'. Then you will find out the use of the world."

কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় গুলিয়ে যেত। কাব্য ও বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য করে মনটা 'নিবাত-নিষ্কম্প' ক্বচিৎ থাকত। ভালবেসে ফেললাম ফ্যানি ব্রন (Fanny Brawne) নামে এক অনূঢ়া কন্যাকে। কিন্তু এতেও উপস্থিত হল সেই দ্বন্দ্ব। ভালবাসার রঙীন নেশা মনটাকে স্ফূর্তিতে ভরপুর করে অনেক সময় রাখত বটে, কিন্তু মেয়েটিকে ভালবেসে পাছে আমার কাব্য-জগতের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খানিকটা জখম হয় এই দুশ্চিন্তাও আমার মনটাকে পীড়ন করত যথেষ্ট। ফ্যানি ব্রনের (Fanny Brawne) কাছে যে পত্রগুলি লিখেছি তা পড়লেই দেখতে পাবে যে তার কাছে আমার সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত মনের অবস্থাটা নির্মমভাবেই সাফ কবুল করেছি।

"এক সময় সংসারের জ্বালাময় বাস্তবতা মনটাকে এত বিষিয়ে তুলেছিল যে আমার 'Ode to Indolence' কবিতাতে স্পষ্ট করেই প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কবিত্ব-শক্তিকে লক্ষ্য করে তাদের সকলেরই বিসর্জনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম—

'Vanish, ye phantoms ! from my idle spright,
Into the clouds, and never more return.'

[ছায়ামূর্তিত্রয়! আমার অলস অন্তর থেকে একদম সরে পড়ে মেঘের ভিতরে গা ঢাকা দাও, আর কখনও এমুখো হয়ো না।]

"যাদের বিসর্জনের মন্ত্র পড়লাম তারাই কিন্তু সৃষ্টি করেছিল যাকে আমি বলতাম আমার জীবনের 'high romance' (সেরা-রস)। হাজার চেষ্টা করেও এই রোমান্সটিকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে আমার অন্তরটা যেন একটা ঘূর্ণিপাক হয়ে উঠেছিল। বিসর্জনের মন্ত্র পড়েও কাব্য, যশ ও প্রেমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। এ তরফটা কিছুতেই আমাকে পীড়নের হাত থেকে রেহাই দিলে না। হঠাৎ বাস্তবের সঙ্গে রফা করার একটা নূতন মতলব এল। মনে হল কবির সৌন্দর্য-উপলব্ধিও একটা

বাস্তবিক ব্যাপার, এবং নিরপেক্ষ হয়ে দেখতে পারলে, সংসারের ভয়ঙ্কর মূর্তির মধ্যেও ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য। সিদ্ধান্ত হল যে এইভাবে বাস্তবতার সঙ্গে কবি-কল্পনার রফা করাই হচ্ছে মানব-জীবনের চূড়ান্ত জ্ঞান। তাই তোমার বোধ হয় মনে আছে আমার 'Ode on a Grecian. Urn' কবিতায় আমি লিখেছিলাম—

'Beauty is truth, truth beauty, that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.'

[(কবির) সৌন্দর্য বাস্তব ব্যাপার, (জগতের) বাস্তবতা সৌন্দর্যমণ্ডিত ; দুনিয়ায় তোমরা এর বেশী কিছু জান না, এবং জানার প্রয়োজনও নেই।]

"যাক, এসব কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। ১৮২০ সালে হঠাৎ একদিন দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ পরকালের পরোয়ানা নিয়ে এসে হাজির হল। কোন বাসনাই তখনও নিবৃত্ত হয় নাই। বাগ্‌দত্তা ফ্যানি ব্রনের (Fanny Brawne) পাণিগ্রহণ করার সাধটুকু বাধ্য হয়েই মন থেকে পুঁছে ফেলতে হল। কবিতা লেখার সখটাও ভাল করে মেটাতে পারার সুযোগ পেলাম না। জগতের সেবায় জীবনের শেষভাগটা উৎসর্গ করার সাময়িক স্বপ্নও শূন্যে মিলিয়ে গেল। কবিতা লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আকাঙ্ক্ষাটাও এক-রকম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। বাসনাগুলি বোধ হয় সূক্ষ্ম সংস্কারের রূপ নিয়ে অন্তরের অবচেতনার অন্দর-মহলে গিয়ে ঠাঁই নিলে। মনের উপরের কোঠাটা কিন্তু বাসনামুক্ত একটা নিশ্চিন্ত সহজ ভাবেই প্রায় পূর্ণ ছিল। শুধু সেখানে ব্যর্থতার একটি করুণ রাগিণী অতি মৃদুভাবে গুঞ্জন করছিল। প্রিয় সেভার্ণের (Severn) কাছে আমার কবরের উপর কি লেখা হবে মৃত্যুর অল্প পূর্বেই তা বলেছিলাম, 'Here lies one whose name was writ on water……' (এখানে এমন একটি লোক আছে যার নামটি লেখা হয়েছিল জলের উপর।)

এই কথা কয়টির মধ্যেই ঐ করুণ রাগিণীর আভাস তোমরা আজও পেতে পার।

"যাই হোক, অতৃপ্ত বাসনার বোঝা ঘাড়ে করে ১৮২১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দুনিয়া থেকে বিদায় নিলাম। তারপরই দেখি—কি জানি কেমন করে, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, এই অপূর্ব, মনোরম, কবিজনপ্রিয় স্থানটায় এসে হাজির। এখানে এসে কী আনন্দই পেয়েছি তা তোমাকে আর কি বলব—দেখতেই পাচ্ছ তোমার চারদিকে কবিদের কষ্টকল্পনাও এখানে বাস্তব হয়ে আছে। এখানে বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সকে খাপ খাওয়াবার জন্য একদম কোন বেগই পেতে হয় না—শুধু অনাবিল আনন্দের নিরন্তর উপভোগ। এইভাবে এখানে পৃথিবীর মাপের ঝাড়া চল্লিশ বছর কেটে গেল। তারপর?

"তারপর যে কি হল সেইটেই আমার গুহ্য কথা, যা বলার জন্য তোমাকে এখানে আজ নিয়ে এসেছি। কথাটা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। তোমার মনে সহজে বিশ্বাস আনতে পারব আশা করেই তোমাকে আমার এই গুহ্যবাণীর বাহক করব ভেবেছি। তাছাড়া আমার গভীর দুঃখের সমবেদনায় অধীর তোমার মন আমার এই গূঢ় সংবাদটি শুনে শান্ত হবে, একথাটাও ভেবেছি তোমাকে নির্বাচন করার পূর্বে। এখন যা বলি খুব মন দিয়ে শোন এবং বিশ্বাস কর—আমি যা বলছি সব সত্যি। কি জানি কেমন করে, ১৮৬১ সালের মে মাসে একদিন কে আমাকে আবার পৃথিবীর বুকে টেনে নিয়ে এল। পূর্বজন্মের অতৃপ্ত বাসনাগুলি পূরণ করার জন্যই যে এই জন্ম হল তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে যে আমার মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে ১৮১৯ সালের মে মাসে মিস্ জেফ্রির (Miss Jeffrey) কাছে এক পত্রে জানিয়েছিলাম যে আমার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করার জন্য খুব সাধ হয়েছিল। তাই বুঝি এব্যার জন্ম হল

ভারতবর্ষে।[৬] তাছাড়া পূর্বজন্মে কর্মযোগের মারফত আত্মসংস্থ হবার যে আভাসটুকু পেয়েছিলাম সেটিও বোধ হয় এই বেদান্তের দেশে আমাকে নিয়ে আসার অপর একটি গূঢ় কারণ।

"ভারতবর্ষের এককোণে বাংলাদেশে হল আমার জন্ম। পূর্বজন্মের সহজ অধ্যাত্ম-সাধনা বিফল হলনা। এবার যথাশাস্ত্রই "জ্ঞানিনাং শ্রীমতাং গেহে" এসে হাজির হলাম। পিতা রীতিমত ধনী, অভিজাত, বিদ্বান ও ধর্মনিষ্ঠ। বৃহৎ পরিবার—আত্মীয়স্বজন সকলেই শ্রী ও ঋদ্ধিসম্পন্ন, সকলেরই প্রতিষ্ঠার আসনটি সাধারণের চাইতে অনেক উঁচুতে। নিকট-আত্মীয়ের প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সাফল্যের মধ্যে নিরাবিল আনন্দ উপভোগ করার দাবী নিয়েই যেন এবার জন্মগ্রহণ করেছি। গতবারে অদৃষ্টে ছিল স্বজনের দুঃখ ও বিরহের ব্যথাটা নীরবে সহ্য করা; এবার কিন্তু সে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বুঝেছি সত্যিই সুখ-দুঃখ চাকার মতই ঘুরে যায়। (চক্রবৎ পরিবর্তন্তে······ইত্যাদি)

"গতবারে পনর বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে হয়েছিল; এবারও একপ্রকার শৈশবেই ও পালাটার উদ্‌যাপন করে নিশ্চিন্ত হলাম। পূর্বজন্মে কিন্তু জগতের স্বরূপটাকে সকল দিক দিয়ে জানা ও বোঝার জন্য নিভৃতে অধ্যয়ন করার বাসনাটা ভাল করে মেটাতে পারিনি, এবারে সে আপসোসও মিটিয়ে নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না মাড়ালেও এবারে নিরালা ঘরে বসে ইচ্ছামত আপন মনে অধ্যয়ন করেছি প্রচুর। বহু এবং বিচিত্র রত্নসম্ভার আহরণ করে আমার জ্ঞানভাণ্ডার একেবারে পূর্ণ না করে থাকলেও বহুল পরিমাণে যে সমৃদ্ধ করেছি, একথা অসঙ্কোচেই বলতে পারি।

"কবিতার কথা বলার পূর্বে আর দু-একটি খুচরো খবর না দিয়ে পারছি

৬ "I have the choice as it were of two Poisons: (yet I ought not to call this a Poison) the one of voyaging to and from India a few years; the other is leading a feverous life alone with poetry. This latter will suit me best; for I cannot resolve to give up my studies."

না। প্রথমটি দৈন্য, দ্বিতীয়টি বিবাহ। দৈন্য সেবারে আমাকে কত কষ্টই না দিয়েছে! কতবার মনে হয়েছে কবিতা লিখে অন্ন-সংস্থান করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার বোধ হয় মনে আছে ফ্যানি ব্রনের (Fanny Brawne) প্রেমে পড়ার পর থেকে ঘরকন্না পাতবার উপযুক্ত অর্থ-সংগ্রহের দুশ্চিন্তা কিভাবে আমার মগজটাকে দখল করে বসেছিল; কতবার ভেবেছি এডিনবরা গিয়ে ডাক্তারীটা শিখে নেব জীবিকার জন্য। বিবাহ তো ফেঁসেই গেল। কোথা থেকে উৎকট ব্যাধি এসে প্রণয়িনীর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এবার কিন্তু এ-দুটো আপসোসই মিটেছে। জন্ম থেকেই ঐশ্বর্যের কোলে মানুষ হয়েছি। ছিয়াত্তর বছর বয়স হল, সংসার-খরচ চালাবার ভাবনা একদিনের তরেও করতে হয়নি। কবিতা লিখে, চিকিৎসা ব্যবসায় বা অপর কোন পেশা অবলম্বন করে জীবিকা-সংগ্রহের কথা ভাববার প্রয়োজনও কোন দিন বোধ করিনি। ফ্যানি ব্রনকেই (Fanny Brawne) এবার পেয়েছিলাম কিনা ঠিক জানি না, তবে বিবাহ এবার করেছিলাম। তোমাদের কেদার বন্দ্যোর বুলির ভঙ্গিতে বলতে গেলে—প্রণয়টা এবার পরিণয়ের পাকা পত্তনের উপর প্রসার লাভ করেছিল; পুত্রের পরিণত পৌরুষও এবার দেখতে পেয়েছি। স্ত্রী অবশ্য বহুদিন পূর্বেই আমাকে ছেড়ে গেছেন। কিন্তু এরও একটা গূঢ় কারণ আছে বলে সংশয় হয়। পূর্বজন্মে একটা আতঙ্ক ছিল যে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে আমার ভাবরাজ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই বোধ হয় এবার বিবাহের অতৃপ্ত বাসনাটি মিটিয়ে নেবার সুযোগও যেমন পেয়েছি, আবার বন্ধন-মুক্ত হয়ে আমার ভাবরাজ্যের আদর্শের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করার অবসরও তেমন পেয়েছি। কি জানি? এসব কথা একেবারে হলফ করে বলতে পারা যায় না। কোন্ সূক্ষ্ম কারণের সূত্র ধরে স্থূল ফলগুলি আমাদের কাছে হাজির হয় তা একেবারেই দুর্বোধ্য।

"এবার কবিতার কথা বলি। কবিত্বের শক্তিটা এবারেও আমার মজ্জাগত। সাক্‌রেদীর অধ্যায়টা পূর্বজন্মে কতকটা ঘটা করেই শেষ করেছি। তাই এবারে গোড়া থেকেই ওর প্রতি বিশেষ কোন ঝোঁক ছিল না। প্রবীণ কবিদের দোষগুণগুলি একরকম কৈশোরেই আমার মনের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত এবং ঐ বয়সের রস-বিচারে তা নির্ভয়ে এবং অসঙ্কোচে প্রকাশ করতাম।

"তারপর একদিন যৌবনের একরকম প্রারম্ভেই দেখি যে বিস্মৃতির পাথরের চাপটা অসহ্য বোধ হয়ে উঠল। তখন বয়স আমার বাইশ বছর। পূর্ব-জন্মের কবিতার রুদ্ধ প্রস্রবণটি—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মত ঐ 'পাষাণ-কারা' ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্য কি ভীষণ প্রচেষ্টা সুরু করল! বাইরের সৌন্দর্যটা মোহন-মূর্তি নিয়ে কোন্ ছিদ্রপথে সেদিন আমার হৃদয়ের 'গুহার আঁধারে' প্রবেশ করে প্রসুপ্তা প্লাবনময়ী কবিত্ব-শক্তিকে জাগিয়ে দিলে—

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান,
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ॥
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

"অন্তরের দেবী জাগ্রতা হয়ে বলে উঠলেন—

'আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি'
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥'

"সুখ, সাধ, গান, কথা, প্রাণ!—সবই ত পূর্বজন্মে মজুত ছিল। পাইনি শুধু প্রকাশ করার অবসর। যাই হোক, দেবীর আকস্মিক জাগরণে মুগ্ধ বিস্ময়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। বাইরে 'মহাসাগরের গান' শুনতে পেয়ে, 'পাষাণ-কারা'-রুদ্ধা আমার অন্তরের কাব্য সুরধুনী মহাসাগর-সঙ্গমের উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠল। সে কী বেগ! বিস্মৃতির পাথরের উপর সে কী প্রচণ্ড 'আঘাতের পরে আঘাত!'

"সে আঘাতের প্রভাবে 'পাষাণ-কারা'কেও পথ ছেড়ে দিতে হল। তার পর থেকে কবিতার যে প্রবাহ ছুটল তার বিরামও নাই, বৈচিত্র্যেরও অভাব নাই। সত্যই দেবী বর্ণে বর্ণে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন! তাঁর গানে জগৎ প্লাবিত হল। আনন্দময়ী সত্যই 'রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া' 'রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া' দিলেন। কত ছন্দ, কত সুরের কলতান তুলে আমার প্লাবনময়ী কবিতা 'শিখর হইতে শিখরে', 'ভূধর হইতে ভূধরে' ছুটে চলল। সত্যই আমার কথা, গান, সুখ, সাধ, প্রাণের উচ্ছ্বাসে কাব্যজগতে বিচিত্র রসের মহাপ্লাবন উপস্থিত হলো।

"যাক, তোমার হয়ত বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, এ জন্মে আমিই রবীন্দ্রনাথ।"

চিত্রার্পিতের মত বসে আছি, উত্তরে শুধু বললাম, "না"। মনে মনে

ভাবলাম, "দেবতার কথা বিশ্বাস করতে হয়,—অন্ততঃ শাস্ত্রের নজিরে। অপদেবতাও ত ঐ পর্যায়েরই জীব ; অবিশ্বাস করি কি করে।"

ইংরাজ কবি সোৎসাহে বললেন, "আমি পূর্বেই বুঝেছিলাম যে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবে। এখন শোন, পূর্বজন্মের কবিতার সূত্রটি ধরেই এবারে কেমন করে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। তুমি বেশ জান, পূর্বজন্মের কবিতার সঙ্গে বাস্তবের একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করাই ছিল আমার জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা। যে-সব উপায়ে মাঝে মাঝে একটা সামঞ্জস্য খাড়া করার চেষ্টা করেছি তা তোমাকে ইতিপূর্বেই বলেছি। নিস্পৃহ সাক্ষীর মত অবস্থান করে জগতের বিপরীত অবস্থার মধ্যেও সৌন্দর্যের সন্ধান মাঝে মাঝে পেয়েছি সত্য। ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহায়ে আত্মার উৎকর্ষ লাভ করার সুযোগ উপস্থিত করার মধ্যেই সংসারের দুঃখের সার্থকতা—একথাও মাঝে মাঝে মাথায় এসেছে সত্য। কিন্তু জগতের সঙ্গে আমার অন্তরের কবিত্বের স্থায়ী মিলনের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। আমার শেষ জীবনের ওড্‌গুলি (ode) পড়লেই বুঝতে পারবে কি বেদনা নিয়ে সেগুলি রচা হয়েছিল। বাস্তব ও কবিতার গরমিলটাই ছিল ঐ বেদনার সর্বপ্রধান কারণ। ওখানেই দেখতে পাবে যে, কবিত্বশক্তিটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা অনেক সময়ই অনুভবের বাইরে গিয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছে যে ঐ শক্তিটি আমার ঘাড়ের উপর ভূতের মত চেপে বসে আছে। তাই আমার 'Ode to Indolence'-এ ঐ শক্তিকে 'demon Poesy' ব'লে অভিভাষণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করিনি। আর এমনটা মনে না করলে কি ঐ কবিতাতে ঐ শক্তিরই বিসর্জন-মন্ত্র উচ্চারণ করি ? যাই হোক, মৃত্যুর পর কিন্তু এই যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ সে জগৎটায় চল্লিশ বছর বাস করার ফলেই কবিত্বশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তাই এজন্মে ঐ শক্তিকে ভূত বলে ভ্রম কোন দিনই হয়নি ; তাকে দেবী বলেই

গোড়া থেকে বরণ করে নিয়েছি। কিন্তু তাও প্রাচীন গ্রীক কবিদের মত নয়। সম্পর্কটা শুধু একতরফা শ্রদ্ধার নয়; শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেমও নিবিড়ভাবে মিশে আছে। এবারে তাকে আমার চিরসহচরী সখীরূপেই পেয়েছি।

"তুমি যে শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি পড়ছিলে, উপসংহারে লেখক যা লিখেছেন তা খুবই সত্য। আমার পূর্বজন্মে কবিত্ব-শক্তিটা বাস্তবের সঙ্গে যতই পরিচয় হচ্ছিল ততই যেন কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছিল; তবুও লোপ পায়নি। বাস্তব ও কবিত্বের সঙ্ঘর্ষটা কোন তরফেরই উচ্ছেদসাধনের জন্য উপস্থিত হয়নি। সঙ্ঘর্ষটা উপস্থিত হয়েছিল আমাকে এগিয়ে দেবার জন্যই। নৃপেনবাবু ঠিকই বলেছেন, আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে ঐ ঘাটটা পেরিয়ে কবিতার উচ্চভূমিতে হাজির হতে পারতাম। বাস্তবের সেবায়ই কবিতার নিয়োগও করতে পারতাম এবং জগতের সকল অবস্থাতেই শান্ত ও নিস্পৃহ হয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতাম।[৭]

"ঐজন্য আর ক্ষোভ নেই। মর্তলোকে যে কাজটা অসম্পূর্ণ রেখে এসেছিলাম তা সহজেই সম্পূর্ণ হল মৃত্যুর পর কবিদের এই উর্ধ্বলোকে এসে। একরকম বিনা আয়াসেই প্রমোশনটা পেয়ে গেলাম। তাই এজন্মে কবিতার সঙ্গে বাস্তবতার বিরোধ আদৌ বোধ করতে হল না। হৃদয়ের 'গুহার আঁধারে' 'পাষাণ-কারা'-রুদ্ধা কবিতাদেবীর কানে প্রবেশ করল বাইরের 'মহাসাগরের গান'। সঙ্গীতমুখর হয়ে বিশ্ব মহামিলনের জন্য আমার কবিতাদেবীকে আহ্বান করল। যে সঙ্গীত পূর্বজন্মে শুধু আমার অন্তরের নিভৃত প্রদেশেই গুঞ্জন করত এবং বাস্তবের নিষ্ঠুর স্পর্শে মাঝে মাঝে বেসুরো ও নীরস হয়ে

৭ "For him it was a general transition, not a complete and actual rejection of the one in favour of the other. But Keats would certainly have passed this transitional stage, had he lived that concentrated life of his for some time more. He would have succeeded in enlisting poetry in the service of reality, and in seeing life steadily in a calm, disinterested state of mind."—'Romance and Reality in Keats' by N. N. Chatterjee.

উঠত অথবা কখনো শূন্যে বিলীনও হয়ে যেত, এবার দেখি, সেই সঙ্গীত শুধু আমার অন্তরকেই পূর্ণ করে নাই, বিশ্বের আকাশ-বাতাসের অনন্ত আসরটাকেও বিরাট স্পন্দনে তরঙ্গায়িত করে রেখেছে। স্পষ্টই শুনতে পেলাম, 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।' দেখলাম, বাইরের সঙ্গে অন্তরের কোন ভেদ নেই, বৈষম্য নেই, বিরোধ নেই। অনুভব করলাম দুয়ের মধ্যে এক প্রবল আকর্ষণ। বিশ্বটাকে আঁকড়ে বুকের উপর চেপে ধরার জন্য প্রাণ উতলা হয়ে উঠল। এই প্রবল আকর্ষণের প্রভাবে পাষাণের কারা ভেঙ্গে আমার অন্তরের কবিতাদেবী তাঁর প্লাবনময়ী সত্তা নিয়ে বিপুল-বেগে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম অন্তর ও বাহিরের কবিত্ব ও বাস্তবের এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর মহামিলন। সে আমার 'প্রভাত উৎসব'! সে উৎসবের আনন্দে ভরপুর হয়ে শুধু বললাম—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

... ...

তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।
আকাশ, 'এসো এসো' ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।'

"সারা বিশ্ব জুড়ে এক অপূর্ব উৎসবের বেশ অন্তরটাকে আনন্দে পূর্ণ করে দিল। পূর্বজন্মে বিশ্বের যে প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখে মাঝে মাঝে শিউরে উঠতাম সেটি যেন যবনিকার অন্তরালে অনন্তকালের জন্যই গা ঢাকা দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে অন্তরের মিলনের প্রথম পর্বটা সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই ঘটেছে বটে, কিন্তু মিলনটি পাকা হল তখন, যখন আর একটু এগিয়ে মিলনের মূল উৎসটির সন্ধান পেলাম উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', 'রসো বৈ সঃ', 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥' স্পষ্টই অনুভব করলাম, সর্বসাধারণের গোচর বস্তুতান্ত্রিক সৌন্দর্য এবং কবিকল্পনার গোচর অসাধারণ সর্বব্যাপী সৌন্দর্য—উভয়েরই মূল উৎস বিশ্বের জাগ্রত দেবতা চিরসুন্দর স্বয়ং। মনের আনন্দে গাইলাম—

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর—
পুণ্য হোলো অঙ্গ মম, ধন্য হোলো অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।'

"এই নূতন জ্ঞানের 'আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি'। নূতন রসের সন্ধান পেয়ে 'হৃদ্ গগনে পবন হোলো সৌরভেতে মন্থর'। বিশ্বের চিরসুন্দর দেবতাকে বিহ্বল হয়ে জানালাম—

'এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হোলো রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।'

"দেখলাম এই জাগ্রত বিশ্বদেবতাই আমার অন্তর ও বাহিরের মধ্যে চির-মিলন-সূত্রটি গেঁথে রেখেছেন। তাই এবার বিষাদের বেহাগ বর্জন করে আনন্দে বিভোর হয়ে গাইলাম—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ দেখে বিহ্বল হয়ে বললাম—

'সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর ॥

এ শুধু বাস্তবতার সঙ্গে কবির অন্তরের মিলন নয়, বাস্তবতা ও অন্তরের পশ্চাতে যে সত্তা আনন্দঘন হয়ে, রসঘন হয়ে, চৈতন্যঘন হয়ে বিরাজ করছেন, যাঁর আভাস 'আকাশ, জল, বাতাস, আলো'র মধ্যে এবং আমার অন্তরের ভাবলোকের মধ্যেও দেখেছি সেই জাগ্রত দেবতার সঙ্গেই আমার ভাব-রাজ্যের পুণ্য-মিলনের কথাই বলছি। সেই মিলনই 'আমার হৃদয়পুরে' নব জাগরণ এনে দিয়েছে। বিশ্বের সঙ্গীত ও সৌন্দর্য এই পুণ্য-মিলনের প্রভাবেই নূতন ও অপরিসীম মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আবেগভরে তাই গাইলাম—

'তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।'

"একথা আর থাক। যতটা বলেছি তাতেই বেশ বুঝতে পারবে বাস্তব ও কবিত্বের মধ্যে মিলন-স্থাপনের যে অসম্পূর্ণতা গত জীবনে রেখে এসেছি তারই একটা অংশ এবারে কিভাবে পূরণ করে নিয়েছি। সকল দিক দিয়ে এবং সকল অবস্থার মধ্যে বাস্তবতার অন্তর্নিহিত আনন্দরসটুকু এবার এক-রকম নিরন্তর উপভোগ করে পূর্বজন্মের অসম্পূর্ণতার দ্বিতীয় অংশটির কথা এইবার বলি। শুধু সৌন্দর্য-উপভোগের মধ্য দিয়েই বাস্তব ও কবিত্বের মিলন এবার ঘটাইনি, বাস্তবের সেবায় কবিত্বশক্তির নিয়োগও এবার যথাসম্ভব করেছি। এই শেষ অংশের কথাটাই এখন বলব।

"তখন আমার বয়স মাত্র চব্বিশ। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু তখনও সুন্দরের সন্ধান পাইনি। সৌন্দর্যের উপলব্ধিটা তখন কবিতার স্বপ্নরাজ্যেরই বিষয়, বিশ্ব-সৌন্দর্যের অন্তঃসলিলার খোঁজ তখনও পাইনি। সেই সময়েই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যস্বপ্নে বিভোর আমার কবিতাসখীকে সুখ-দুঃখ, আলো-ছায়া-ঘেরা বাস্তবতার বাহিরের অঙ্গনে আহ্বান করে বললাম—

'এসো, ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।

... ...

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখে দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি' ধরি' হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।'

দশ বছর পরে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম শুধু সৌন্দর্য-উপভোগই কবির কাজ নয়। বিশ্ব-সৌন্দর্যের অমৃতময়ী অন্তঃসলিলাতে অবগাহন করে নিশ্চিন্ত থাকলেই চলবে না। সেই অমৃতরসধারা সিঞ্চন করে তাপদগ্ধ বিশ্বমানবের হৃদয় শীতল করে দিতে হবে। পীড়িত ও আর্তদের সেবার মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হবে কবির ভাবরাজ্যের চরম সার্থকতা। ঠিক মনে হল—

'মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।'

আর্ত জগতের করুণ ক্রন্দনে আবেগভরে বলে উঠলাম—

'কবি, তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।

... ...

এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

করুণায় অন্তরটা মথিত হয়ে বলে উঠল—

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

তারপর থেকে বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে আহত বিশ্ব-মানবের আর্ত ও বিমূঢ় প্রাণে সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ দেবার জন্য সমবেদনার ও অনুপ্রেরণার কত বিচিত্র সুরই তুলেছি তা আর কি বলব! রাজনৈতিক আন্দোলনে সোজাসুজি সংশ্লিষ্ট না হয়েও স্বদেশের জাতীয়তার নব জাগরণে উদ্বোধন-সঙ্গীতও গেয়েছি অনেক। এসব আর বিস্তার করে নাই বা বললাম। অবশ্য তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এসব অভিমানের কথা নয়, গত জীবনের অসম্পূর্ণতাটা-সব দিক দিয়ে মিটিয়ে যে আনন্দ উপভোগ করেছি এসব কথা তারই সহজ ও সরল অভিব্যক্তিমাত্র।

"আর একটা কথা বলে আমার এই অদ্ভুত কাহিনীর উপসংহার করব। জগতের সেবা এবার শুধু কবিতা লিখেই করিনি। কাজের মধ্য দিয়ে জগতের সেবা করার ইচ্ছাটা পূর্বজন্ম থেকে বহন করে এনেছিলাম। এবারে সে ইচ্ছাটাও পূরণ করার অবসর পেয়েছি যথেষ্ট। রাজনীতির ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ না করেও জগতের আর্ত ও নিপীড়িতদের দুঃখে কাতর হয়ে অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে কখনও ত্রুটি করিনি। সামাজিক অত্যাচারের জগদ্দল পাথরটাকে নিজ সমাজের বুকের উপর থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যও চেষ্টা করেছি অনেক। প্রবন্ধ, উপন্যাস, অভিভাষণ, পত্র প্রভৃতির মারফত বিশ্ব-কল্যাণের জন্য কত কথাই না বলেছি। তা ছাড়া পদ্যই বল আর গদ্যই বল, শুধু কথা শুনিয়েই এবার আমি নিশ্চিন্ত নেই। স্বদেশের নব জাগরণে উপযুক্ত মানুষ গড়বার জন্য, পল্লী-গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করার পথের সন্ধান দেবার জন্য এবং সংস্কৃতির আসরে

ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের মিলন ঘটাবার জন্য শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছি। করবার অবশ্য এখনও যথেষ্ট আছে। আমার মনের ভাবগুলিকে এখনও পুরোপুরি রূপ দিতে পারিনি বটে, কিন্তু এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করবার সৌভাগ্য যে আমার হয়েছে, তাই দেখেই আমি ধন্য হয়েছি। যে বিশ্বদেবতা আমাকে যন্ত্র করে এবারে মহা-মানবের সেবায় চালিত করেছেন, তাঁরই মঙ্গলহস্তে প্রতিষ্ঠানগুলির ভাবী কল্যাণ সংরক্ষিত আছে জেনে আমি নিশ্চিন্ত।

"যাই হোক, কবিতার দিক দিয়েই বল আর সেবার দিক দিয়েই বল, আমার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির, কোন অভাব-অসমাপ্তির জন্য এবারে আর তিলমাত্রও আপসোস নেই—

'জীবনে যত পূজা হোলো না সারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
... ...
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা॥'

বিরহের ব্যথাও মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিনা (সাধ্বী পত্নীর জন্যও না)—

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা॥'

আমার প্রিয়তম বিশ্বদেবতার চরণে যেন দেখতে পাচ্ছি অতীত, বর্তমান ও অনাগতের ত্রিবেণী-সঙ্গম ! কিছুই হারায়নি, কিছুই লোপ পায়নি, কিছুই বৃথা

হয়নি। তাঁর নিত্য-সত্তার মধ্যে সবই যেন লীলার ক্ষণিক তরঙ্গ! তাঁর মধ্যেই সব-কিছুরই সত্তা শাশ্বত হয়ে আছে। যে বিশ্বদেবতা আমাকে এবার জীবিতকালেই জগতের বরেণ্য-সভায় উচ্চ আসনে বসিয়ে, জয়মাল্যে ভূষিত করে আমার গত-জন্মের প্রতিষ্ঠা-লাভের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করেছেন, তাঁর কাছে শুধু কাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছি—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।'

"আর কিছু বলবার নেই তোমাকে। জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পাওয়া আমার প্রগতির আনন্দটা প্রকাশ করতে পেয়ে আজ যেন মনটা বড়ই হাল্কা বোধ হচ্ছে। গতজন্মের কবরের উপর পুষ্পবর্ষণ দেখে যে আনন্দটুকু পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছি অনুভূতি-রাজ্যে আমার অগ্রগতি দেখে।"

মুহূর্তপরেই দেখি শান্তিনিকেতনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যার পাশে আমি বসে আছি, এবং পূর্বদৃষ্ট জন্ কীট্সের শুভ্র শান্ত মূর্তিটি অধরের সেই চাপা হাসি নিয়ে পলকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শয্যাগত, সংজ্ঞাহীন শরীরে মিলিয়ে গেল। বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে শুনি কবিবর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গুন্ গুন্ করে গাইছেন—'জীবনে যতো পূজা হলো না সারা...।'

চমকে উঠলাম। নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি বিষাদের কালো ছায়াটি মন থেকে একেবারেই সরে গেছে। পুলকে ও বিস্ময়ে স্বপ্নটা স্মরণ করে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। জাগ্রত মনেও সংশয় হল। কবি কীট্সের কবুলতিটা নিছক স্বপ্ন, না কোন গূঢ় বাস্তবেরই আভাস? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পূর্বস্মৃতিটিই কি হঠাৎ রূপ নিয়ে আমার সঙ্গে স্বপ্নে আলাপ করে গেল? নাঃ, মাথাটা বিগড়ে গেল বুঝি! উঠে পড়লাম।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

[আলোচনার সারাংশ—বিদ্যার্থী, ১৩৪৭]

পশু থেকে মানবের উৎপত্তি। ইহাই ক্রমবিকাশের নিয়ম। আদি মানবের এমন একটা স্তর ছিল, যা পশু হতে মোটেই ভিন্ন নয়। এই সাধারণ নীচ অবস্থা থেকে উচ্চ অবস্থায় নিজেকে উন্নীত করবার জন্য—সংস্কৃত হবার জন্য—মানুষ যা করেছিল, সংস্কৃতি বলতে সাধারণতঃ তাই বোঝায়। এই সংস্কৃত অবস্থারই নাম সভ্যতা।

মানব-সৃষ্টির প্রায় সুরু থেকেই, এই বিশ্বের অতি প্রাচীন অবস্থায়ই, সৃষ্টিরহস্য মানবের মনে অদ্ভুত জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিল। এর সমাধান বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে করলেও, তার ভেতর সাধারণ দুটি ভাগ দেখতে পাওয়া যায়; একটি বহির্মুখী সমাধান, আর একটি অন্তর্মুখী সমাধান। ভারত এই সব মৌলিক প্রশ্নের অন্তর্মুখী সমাধানের ইঙ্গিতই দিয়েছে।

মানুষ ও পশুর মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে—"আহারনিদ্রাভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্"। কিন্তু এ ছাড়া মানুষের আবার আছে অনন্তশক্তিসম্পন্ন মন ও বিবেকবুদ্ধি। এই বিবেকবুদ্ধি-সহায়ে মানুষ দেবত্বের সন্ধান পেতে পারে—অমৃতের অধিকারী হয়। ভারত প্রত্যক্ষ আত্মতত্ত্বের দ্বারা এই কথাই জানিয়ে দিয়েছে যে মানব অসভ্য আদিম অবস্থা থেকে দেবত্ব পর্যন্ত যেতে পারে। মানুষের অন্তরে ভগবান রয়েছেন। "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" তাঁকে লাভ করলে মানুষ অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়—তার সমস্ত অভাব-অভিযোগ, সমস্ত দুঃখ-দ্বন্দ্বের হয় চিরসমাপ্তি, অন্য আর কিছু চাইবার থাকে না—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥"

এই প্রত্যক্ষ আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত সমাজ-গঠন করেছে। সেই সর্বব্যাপী সনাতন আত্মা সর্বভূতে চির বিরাজমান। তাই সমস্ত জগৎই ভারতের কাছে আপনার, তাঁর লীলার ক্ষেত্র। জীবনের প্রতি কার্যে, প্রতি ক্ষেত্রে ত্যাগ অবলম্বন করে এগিয়ে গেলে মানব অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত আনন্দের অধিকারী হবে। এই তত্ত্বই ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি।

কিন্তু এ আত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ মোটেই সহজসাধ্য নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, জন্মের পর জন্ম একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানব এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তাই এক জীবনে এর সন্ধান না পেলে হতাশ হবার কারণ নেই। জন্মান্তরবাদ দ্বারা ভারত হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেছে। ইহাই ভারতের আর একটি বিশিষ্ট দান। জন্মের পর জন্ম মানবকে এগিয়ে যেতে হবে, সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনন্ত আত্মার দিকে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অবতারবাদ ভারতের আর একটি বিশিষ্ট দান। এই বিশ্বপ্রকৃতি তাঁরই রূপ—তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তাই মানবকে ঈশ্বর-লাভ করতে হলে এই জীবসেবা—জীবপূজা দ্বারা অগ্রসর হতে হয়। অতি স্বাভাবিক এই তত্ত্ব, এবং অতি স্বাভাবিক বলেই এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ মানবের চিরন্তন। এই চিরন্তন সন্দেহ দূর করবার জন্যই শ্রীভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন মানবের অন্তরে পূর্ণ দেবত্বের, পূর্ণ আত্মতত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হলে কেমন রূপ হয় তা দেখাবার জন্য। ঈশ্বরাবতারগণের যুগে যুগে এই আবির্ভাবে মানব যুগোপযোগী নূতন আদর্শের সন্ধান পায়—তার যাত্রা-পথে নূতন উদ্যম, নব উৎসাহ লাভ করে।

এই অপূর্ব অসাধারণ তত্ত্বগুলির ভিত্তিতেই ভারত সমাজ-গঠন করেছে। এই সমাজ-ব্যবস্থাও মানবসভ্যতায় ভারতের একটি বিশিষ্ট দান। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারত যে-সামাজিক স্তরের সৃষ্টি করেছে, আজও তা পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয় নাই। ভারতীয় সমাজে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ আছে তার মূলে আছে অগ্রগতির সাধনা। মানবের শূদ্র অবস্থা থেকে ব্রাহ্মণত্বে যেতে হবে—ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূল কথা এই। বর্তমান জগতেও এই ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজেও আজ arms (ক্ষত্রিয়), capital (বৈশ্য), labour (শূদ্র), এই তিনটি ভাগ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বিভাগ জগতে পাওয়া যাচ্ছে না—তাই আজ এই ভেদ-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ। ভারতীয় সমাজের অনুরূপ ব্রাহ্মণের আদর্শ-স্থাপনের সবিশেষ প্রয়োজন ছিল—তাই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে শ্রীভগবান পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছেন তা দেখাবার জন্য। সমাজগত চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ ছাড়াও ভারতে ব্যক্তিগত বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তন হয়েছে—মানুষকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই সব আশ্রমের ভেতর দিয়ে সাধনার পথে এগুতে হবে।

এইগুলি মানবসভ্যতায় ভারতের দান। কিন্তু এই আদর্শের সন্ধান দিয়েই ভারত ক্ষান্ত থাকে নাই। সেই আদর্শে পৌছানর জন্য লোকের রুচি অনুযায়ী বহুবিধ উপায়েরও সন্ধান সে দিয়েছে। জগতের অন্যান্য ধর্মে তার কিছু না কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তবে ইহা ছাড়াও ভারত এক অদ্বিতীয় অভিনব পন্থার সন্ধান দিয়েছে—গীতাকার তারই উল্লেখ করেছেন কর্মযোগে। ঈশ্বর-লাভ করতে হলে সংসার ত্যাগ করবার কোন প্রয়োজন নাই—অনাসক্ত হয়ে, অতন্দ্রিতভাবে কর্তব্য পালন করে গেলেই অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়। এই কর্মযোগ অবলম্বনে সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য প্রভৃতি যে-কোন আশ্রমের ভেতরে থেকে তাঁর কাছে পৌছান যায়।

'পশুত্ব থেকে মানবত্ব-লাভ একটি বিরাট স্তর—from the physical to the intellectual man. তেমনি আর একটি বিরাটতর স্তর আছে, from the intellectual to the spiritual man—to divine birth ! এই দেবত্বে আরোহণ করতে হলে আমাদের চাই সাধনা।

ভারত মানবসমাজে এই আদর্শ স্থাপন করেছে। আদিযুগের পশু-মানবকে ক্রমে ক্রমে দেব-মানবে পরিণত হতে হবে। মানবসভ্যতা বলতে যদি এই ক্রমোন্নতিই বোঝায়, তবে একমাত্র ভারতই ঠিক ঠিক সেই ক্রমোন্নতির পন্থা ও গন্তব্যস্থান আবিষ্কার করেছে। তার অবতারতত্ত্ব, তার আত্মতত্ত্ব, তার জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি সবই একভাবে ইহাই প্রতিপন্ন করে যে পার্থিব জীবনে আধ্যাত্মিকতার সংযোগই মানবজীবনের কাম্য। বস্তুতঃ অধ্যাত্মবাদই ভারতীয় সংস্কৃতির সহজ ও সাধারণ অভিব্যক্তি। এই অধ্যাত্মজীবন-লাভের জন্য ভারত যেমন ব্যক্তিগত পন্থার নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি সমাজগত বা জাতিগত উপায়ও উদ্ভাবন করেছে।

এই অগ্রগতির বাণী—ভারতীয় চিন্তাধারা—যুগে যুগে ভারত থেকে বহির্জগতে গিয়েছে। প্রতীচ্যের জনৈক মনীষীর উক্তির মূলে ভারতীয় ঋষিগণেরই কণ্ঠের আভাস পাওয়া যায়—A Sanskrit Renaissance is coming. বর্তমান যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল তথ্যগুলি যতই জগতে প্রচারিত হবে, ততই মঙ্গল। সারা জগৎ তা গ্রহণ করলে, ব্যক্তিগত বা সমাজগত প্রতি কার্য আধ্যাত্মিকতার কষ্টিপাথরে পরখ করে নিলে, ভোগ-লোলুপ, ইহকালসর্বস্ব, স্বার্থপরায়ণ, অনাধ্যাত্মিক জড়বাদের কবলিত মানবসভ্যতার পশ্চাদপসরণ থেমে গিয়ে তার অগ্রগতি আবার সুরু হবে, স্বর্গরাজ্য আমাদের হাতের কাছে এগিয়ে আসবে।

জগতের ভাবী সভ্যতা

আলোচনার সারাংশ—বিদ্যার্থী, ২য় মুদ্রিত সংখ্যা ১৩৬৪]

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে ভারতের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন এবং যখন পৃথিবীর অন্য কোন দেশ সভ্যতার আলোক একেবারেই পায়নি, তখনও এই ভারতবর্ষ একটা বিরাট ও সুমহান সভ্যতার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বর্তমান কালে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় সংস্কৃতি যে পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোন সংস্কৃতিকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে, তা অনস্বীকার্য।

এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় সভ্যতার এই প্রাচীনত্বকে মোটেই স্বীকৃতি দেননি, কিন্তু বর্তমানে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সভাতার প্রাচীনত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে যে পৌরাণিক তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে তা প্রমাণ করে, মহাভারতের যুদ্ধ (কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ) আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৪০০ বা ২৪০০ (দুটি বিভিন্ন মত) সালে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অত বছর আগেও ভারতবর্ষে একটি বিরাট সভ্যতার উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল।

একথা অত্যন্ত সত্য যে ভারতবর্ষ কখনও পাশ্চাত্য দেশগুলির মত কোন ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনায় দক্ষতা দেখাতে পারেনি ; তবু মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের ফলে তথায় যে সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া

গেছে—ভারতবর্ষ যে প্রায় আজ হতে ছয় হাজার বছর আগেও সংস্কৃতির একটা সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল, তা সেই সত্যেরই 'পাথুরে প্রমাণ' নিয়ে হাজির। এর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কিছুই বলবার নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে স্বামিজীর এই মূল্যবান উক্তি দিন দিন অধিকতর অর্থময় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পণ্ডিতদের গবেষণার বস্তুরূপে দেখা দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য-সভ্যতার যে ধারা ভারতবর্ষে এসে পৌছায়, তারই আর একটা শাখা ইরাণ (পারস্য) প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদী ধর্ম এবং তা থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম এই শাখারই অবদান। এদিকে ভারতবর্ষে তখন বৈদিক ধর্ম তার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর বাণী নিয়ে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে এর তফাৎটা মূলতঃ এইখানে যে ভারতবর্ষ যেখানে একটি মাত্র 'সনাতন সত্য'কে স্বীকার করেছে, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম সেখানে দুইটি চরম সত্যে (God and Devil) বিশ্বাসী।

খ্রীষ্টান ধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আজ আর কারুর সন্দেহের অবকাশ নাই। খ্রীষ্টান ধর্মের মৌলিক messageগুলি, অর্থাৎ প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা, শান্তি, সাম্য প্রভৃতি বাণীগুলির উপর বৌদ্ধ ধর্মের জলন্ত ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাইতো স্বামিজী এক জায়গায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমি এমন একটি ধর্ম সম্পর্কে বলবো "of which Buddhism is a rebel child, and Christianity a distant echo !"

আজ পশ্চিমের দেশগুলিতে আমরা যে সভ্যতার ব্যাপক প্রসার দেখছি, তার উদ্ভব গ্রীক সভ্যতা থেকে। প্রাচীন গ্রীসে যে সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল তাই বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলভিত্তি রচনা করেছে। আর এদিকে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের সভ্যতার পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষেরই প্রাচীন

সংস্কৃতি। অতএব আমরা যদি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন সুষ্ঠু তুলনামূলক আলোচনা করতে চাই, তাহলে মূলতঃ ভারতীয় সভ্যতা এবং গ্রীক সভ্যতাকেই আমাদের আলোচনার গণ্ডীর ভেতর আনতে হবে।

ভারতের সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাকে যে প্রভাবিত করেছে এবং গ্রীক সভ্যতাও যে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা অত্যন্ত সত্য কথা—কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের এটিও মনে রাখতে হবে যে কোনটিই অন্যটির অনুকরণমাত্র নয়। এই সত্যকে ভুলে গিয়েই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতদিন ভারতীয় সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকতার ঠিক মর্যাদা রাখতে পারেননি।

প্রাচ্য সংস্কৃতি মূলতঃ অন্তর্মুখী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানতঃ বহির্মুখী। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি গ্রীক সংস্কৃতিতে এই বহির্মুখিনতার ছাপ নজরে পড়ে। বহিঃপ্রকৃতিকে জানবার চেষ্টাতেই এই সংস্কৃতি নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছে। কোন অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধানে এ সভ্যতা নিজেকে ব্যাপৃত করেনি, পাশ্চাত্য সভ্যতার শিল্পে সাহিত্যে বা স্থাপত্যে বহির্মুখী ভাবই উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামিজী এ সভ্যতা সম্বন্ধে বলেছেন, **"It is intensely human, intensely natural and intensely artistic."** গ্রীক সংস্কৃতিতে যে সমস্ত দেবদেবীর কল্পনা করা হয়েছে তাঁদের উপরও সাধারণ মানবীয় গুণাবলীর আরোপ দেখা যায়।

বাইরের জগতের অত্যন্ত খুঁটিনাটি তথ্যগুলি সম্পর্কেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের জ্ঞান অসাধারণ। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অন্তর্জগতের কোন খবরই তাঁরা রাখতে চাননি। এঁদের অনুসন্ধান শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে নিয়েই। অবশ্য পাইথাগোরাস প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিতের জীবনে এই অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি একটা আগ্রহ লক্ষিত হয়; কিন্তু এ শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, যা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতারই একটা নবতর সংস্করণ, শুধু বাইরের পরিদৃশ্যমান জগৎকে জেনে তাকে মানুষের শক্তি-বৃদ্ধির কাজে লাগানোকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে।

শক্তি-সাধনার অগ্রগতি সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ। কোনও সভ্যতা কোন্ স্তরে রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে দেয় এই অগ্রগতিই। পাশ্চাত্য সভ্যতার বেলা এই শক্তি-সাধনার ক্ষেত্র বহির্জগৎ। বহিঃপ্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগানোই এই সাধনার মূলমন্ত্র। অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তাই সব সময় বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ স্বার্থ প্রয়োজন হয়েছে organization-এর অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থার খাতিরে। একক মানুষের শক্তি ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ—তাই সংহতির সহায়তায় এই শক্তিকে বাড়ানোর প্রচেষ্টা হয়েছে সব সভ্যতার ভেতরেই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এ বিষয়ে অনেক বেশী দূর এগিয়ে গেছে, এবং tribal যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হতে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের United States of America অথবা Union of Soviet Socialist Republics-এর মত বিশাল organization-গঠনে তার এই শক্তি-সাধনাকে সফলতর করে তুলেছে।

অতএব আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে organization-এ—যার লক্ষ্যই হচ্ছে extension of mental surface—পাশ্চাত্য সভ্যতা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার।

শক্তি-সাধনার এ একটা দিক। এর আর একটা দিক হচ্ছে (যার কথা আগেই বলা হয়েছে) বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে জেনে তাকে মানুষের স্বার্থে লাগানো। এদিক দিয়ে পশ্চিম যে কতখানি এগিয়ে গেছে তা আর সবিশদ বলার প্রয়োজন নাই। শক্তি-সাধনার এই বিশেষ রূপটির ভালমন্দ দুই দিকই রয়েছে—একদিকে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি যেমন মানব-মঙ্গলের সমুজ্জ্বল দীপটিকে জ্বালিয়ে রেখেছে সভ্য জগতের চতুর্দিকে,

আর একদিকে হাইড্রোজেন বোমা তেমনি ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলার বীভৎস রূপটিকে এঁকে দিয়েছে মানব-জাতির সামগ্রিক মানসপটে।

পাশ্চাত্য জগতের এই শক্তি-সাধনার মূলে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা। শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকেই পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞানলাভের উপায় বলে মেনে নিয়েছে এবং এর বিকাশের ফলে space, time এবং causation সম্পর্কে তার ধারণা বা জ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ সাধারণভাবে একথা বলতে কোন বাধা নেই যে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে space, time এবং causation-এর জ্ঞানকে ভিত্তি করেই। এ সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে তাই Geography, History and Science.

এই Science বা কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানই রয়েছে আধুনিক সভ্যতার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মূলে। এই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি (scientific outlook) বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই না করে এ সভ্যতা কোন সত্যকেই স্বীকার করতে চায় না। কোন ধর্মগ্রন্থের উক্তি বা কোন mystic-এর অনুভূতি বলেই কোন কিছুকে অবিসংবাদিত সত্যরূপে মেনে নেওয়া এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিরোধী।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি গ্রীক সভ্যতা থেকেই। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল্ প্রভৃতির চিন্তাধারায় এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। সেই সুপ্রাচীন গ্রীক আমল হতে আজ পর্যন্ত শুধু এই বুদ্ধিবৃত্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্বল করে পথ চলতে চলতে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে তার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি চরম সত্যরূপ অগাধ জলধির কোন কূল-কিনারাই পাচ্ছেনা।

একটি উদাহরণ নিলেই ব্যাপারটি সম্যক বোধগম্য হবে। আধুনিক Physics-এর যে সমস্যা, তার সমাধান শুধু বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই পাওয়া সম্ভবপর নয়। পদার্থের অবিভাজ্য চরম উপাদান অর্থাৎ অ্যাটম-এর ভেতর

যে রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে—বিজ্ঞানকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য জগৎকে আজ তা বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। একটা nucleus-এর চারিদিকে প্রবল বেগে ঘূর্ণায়মান কতকগুলি ইলেকট্রণের মধ্য থেকে কোন কোনটি কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এই যে ছড়িয়ে পড়া এর কোন নিয়ম-কানুন নাই। বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে এই disintegration spontaneous ; কখন ঠিক কোন্ অণুটির অংশবিশেষ ছড়িয়ে পড়বে তা আগে থেকে বলে দেওয়া যায় না ; সুতরাং mechanical determination এখানে একেবারেই অচল। স্যর জেমস্ জীন্‌স্ তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এসবের পেছনে কোন gigantic will-force কাজ করছে।

লর্ড কেল্‌ভিন বলেছিলেন এই পৃথিবীটা কিছুই না—শুধু কিছুটা material force এবং খানিকটা matter-এর খেলামাত্র। এই উক্তির সঙ্গে জীন্‌স্-এর উক্তির আকাশপাতাল তফাৎ লক্ষণীয়। আইনস্টীন এসে ব্যাপারটাকে আরও গুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর Theory of Relativity যে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটি এই যে পৃথিবীর প্রতি অণুপরমাণু সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে যে কোনো দুটি মুহূর্তে এ পৃথিবীর কোন কিছুই একই position-এ নাই। আইনস্টীন-উদঘাটিত এই তত্ত্ব যে সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করছে তা শুধু বুদ্ধির সাহায্যে কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারবে না। বহির্মুখী পাশ্চাত্য সভ্যতায় আজ তাই একটা ওলটপালট এসে উপস্থিত। Intellect-এর সমস্ত বড়াই আজ ব্যর্থ হতে চলেছে।

শুধু যে প্রকৃতিকে study করার ক্ষেত্রেই এই সমস্যা তাই নয়, organization অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের সন্ধান পশ্চিমের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারবে বলে মনে হয় না। সমাজকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর খাড়া করতে গিয়ে Western World

democracy-র উপর খুব জোর দিয়েছে সত্য, কিন্তু এই democracy পাশ্চাত্যের বহির্মুখী জীবন-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের আন্তর জগৎকে জেনে তার মধ্যে কোন স্থায়ী পরিবর্তন আনতে না পারলে এ সমস্যার সমাধান কি সম্ভব?

তাই তো গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে political liberty এবং equality জোর গলায় প্রচারসত্ত্বেও তথায় স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে সেখানকার সব মানুষই সমান সত্য, কিন্তু আর্থিক বৈষম্য সেখানে অনেক মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে রেখেছে। তাছাড়া আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু colonialism-এর জন্মই হচ্ছে এই বহির্মুখী জীবন-দর্শনের মধ্যে। পাশ্চাত্যের প্রতিটি জাতি যে superiority-complex-বিষে জর্জরিত তা-ই তাদের ঘৃণ্য colonialism-এর মূলে রয়েছে। একটা অন্তর্মুখী জীবন-দর্শন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নাই।

অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া আর্থিক বৈষম্যরূপ সমস্যার সমাধানে অনেক দূরই এগিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু এর জন্য যে পদ্ধতিকে তারা অবলম্বন করেছে তাই আজ সেখানে জন্ম দিয়েছে totalitarianism-এর। এই যান্ত্রিক totalitarianism-এর দুর্বহ চাপে সেখানকার মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ বিনষ্টপ্রায়। মানবসভ্যতাকে এই totalitarianism আজ কত দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? সুতরাং সমাধানের পূর্ণাঙ্গ ইঙ্গিত বহির্মুখী ও যান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে দিতে সমর্থ নয় তা আজ প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের কাছেই সুপ্রকট।

মানুষ বাইরের জ্ঞান লাভ করে সাধারণতঃ পাঁচটা দরজার সাহায্যে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে এই বিভিন্ন gate of knowledge-এর দৃশ্যমান রূপ। কিন্তু এ ছাড়া মানুষ আরও একটা দরজা দিয়ে জ্ঞান আহরণ

করতে সমর্থ হয় এবং এই শেষের দরজা হচ্ছে আসল—কেননা এরই সাহায্যে মানুষ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে চরম জ্ঞান পেতে পারে। পরাজ্ঞান-লাভের জন্য এই দরজা—ইংরেজীতে একে বলা হয় intuition এবং আমরা এর বাংলা নাম দিতে পারি 'স্বজ্ঞা'। পঞ্চেন্দ্রিয়-প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত জ্ঞানকে সংহত করে যে বৃত্তি তা হচ্ছে intellect এবং শুধু এই intellect-কে সম্বল করেই পশ্চিমের মানুষ জ্ঞানের অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি intellect যে সত্যের সন্ধান দেয় তা হচ্ছে apparent truth, চরম সত্যের সন্ধান দেওয়া intellect-এর সাধ্যাতীত, কারণ চরম সত্য intellect-এর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই বুঝি পাশ্চাত্য জগৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও absolute truth-এর ধারেকাছে এসে পৌঁছুতে পারেনি; তবে সে দেশে যাঁরা পেরেছেন তাঁরা কেউই বুদ্ধিকে একমাত্র জানবার উপায় বলে মনে করেননি—অতীন্দ্রিয় সত্তাকে তাঁরা জেনেছেন intuition-এর মাধ্যমে। শুধু যে ধর্মগুরুদের জীবনেই এই intuition-এর অস্তিত্ব দেখা যায় তাই নয়—সেখানকার কয়েকজন বড় বড় বৈজ্ঞানিকের আবিষ্ক্রিয়ার মূলে রয়েছে এই intuition—যদিও অপরিণত অবস্থায়। নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন। যে সত্যের স্বরূপ তাঁদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়েছে, গোড়ায় সেই সত্যকেই তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের স্বজ্ঞায়। সকল বড় আবিষ্কারের মূলেই অল্পবিস্তর এইরূপ intuition-এর প্রভাব বিদ্যমান।

এই যে স্বজ্ঞা, জ্ঞানলাভের আসল পথ, প্রাচী এরই সাহায্যে যুগ যুগ ধরে চরম সত্যে পৌঁছবার প্রয়াস পেয়েছে—তাই যুগে যুগে দেখি ভারতের বুকে অগণিত অবতারপুরুষের আবির্ভাব, যাঁদের পরিণত ও বিকশিত স্বজ্ঞার সামনে প্রতিভাত হয়েছে চরম সত্যের পরম স্বরূপ। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামিজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদেরা, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী প্রভৃতি মহামানবেরা

ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক উত্তরাধিকারী। 'এই intuition-এর দ্বারাই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আমাদের দেশের মহাপুরুষদের জীবনে ঘটেছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু পথ-নির্দেশই দিতে পারে কিন্তু সেই পথে চলবার শক্তি আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির অর্থাৎ যুক্তিতর্কের কাছ হতে পাই না। বিচার-বিবেচনার সহায়তায় মানুষ কোন্ পথে চলা উচিত তা ঠিক করতে সক্ষম সত্য, কিন্তু সেটা ঠিক করা সত্বেও সাধারণ মানুষ যে পথে চলা উচিত সে পথে চলতে পারে না। কেননা impulse-ridden হয়ে সে সাধারণতঃ বিপথগামীই হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনে impulse-এর শক্তি অতি প্রবল এবং বুদ্ধির উপযুক্ত বিকাশ হওয়া সত্বেও সে জীবন-পথে চালিত হয় impulse-এর দ্বারাই। কিন্তু সব সময় impulse মানুষকে ভাল পথে নিয়ে যায় না। সুতরাং প্রকৃত পথে চলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন impulse-এর সংযম ও দমন। অতএব শুধু ভালমন্দ বিচার-জ্ঞান অর্থাৎ এক কথায় intellect-এর বিকাশ হলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভ হয না, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হলে will-power জাগাতে হবে এবং এরই জন্য প্রয়োজন impulse-কে সংযত করে বুদ্ধিকে এর কবল থেকে মুক্ত (সংস্কারমুক্ত) করা। জগতে যাঁরা অতিমানব বলে পরিচিত হতে পেরেছেন—তাঁদের জীবনে এই ইচ্ছাশক্তির জাগরণই হচ্ছে বড় কথা। সিজার, হিটলার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি অতিমানবেরা এই will-power-এর বিকাশ-সাধন করতে পেরেছিলেন বলেই বিশ্ব-নেতৃত্বের বিরাট অধিকার তাঁদের করায়ত্ত হয়েছিল !

অবশ্য এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে বলতে বাধ্য হবো যে হিটলার প্রমুখ অতিমানবদের শক্তি জগতের স্থায়ী কোন কল্যাণেই আসে-নি। এর কারণ এঁরা spiritualization of will-power 'করতে সক্ষম

হয়নি। যতক্ষণ ইচ্ছাশক্তি spiritualized না হয়, ততক্ষণ তার দ্বারা পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না। অতএব শুধু impulse-কে দমন করে ইচ্ছাশক্তিকে develop করলেই কাজ শেষ হবে না—সেই ইচ্ছা-শক্তিকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করা হচ্ছে মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে আর একটা মস্ত ধাপ। স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী প্রভৃতি মহামানবদের জীবনে আমরা এইটাই দেখতে পাই; আর এই ক্ষেত্রেই হচ্ছে ভারতের বিশিষ্ট অবদান। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন বলেই গান্ধীজীর বিশ্ব-কল্যাণ-মন্ত্র এত প্রাণবন্ত। গান্ধীজীর মধ্যে বিপুল ইচ্ছাশক্তির আধ্যাত্মিক প্রকাশ সারা জগৎকে এক নূতন আলোক দেখিয়েছে।

সুতরাং আমাদের impulsive nature-কে সংহত করে, এর হাত হতে আমাদের ভালমন্দ বিচার-জ্ঞানকে মুক্ত করার মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তির জাগরণ এবং সেই জাগ্রত ইচ্ছাশক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব এবং পরিণামে দেবত্ব-লাভের একমাত্র উপায়। সম্প্রতি পাশ্চাত্যের মনঃ-সমীক্ষণ-বিদ্যা এর জন্য যে পথনির্দেশ দিয়েছে, তাকে এক কথায় প্রকাশ করা যায় এমনিভাবে—repeated exercise of a particular faculty; অবশ্য এই exercise হবে voluntary. কারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে না করলে এই পথে সত্বর সুফল লাভ করা যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোনও কবিতা মুখস্থ করতে হলে শুধু মনোযোগ দিলেই হয় না, সে মনোযোগটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া দরকার। আমাদের প্রাচ্যেও এর উপায় সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এর জন্য বড় বড় শাস্ত্রও রচিত হয়েছে। পাতঞ্জল-যোগদর্শন এই ক্ষেত্রে এক monumental work. আমাদের মূল-কথাটাই হচ্ছে—how to spiritualize our consciousness. Impulse-এর দমন, ইচ্ছাশক্তির আধ্যাত্মিক জাগরণ প্রভৃতি কিরূপে সাধিত হতে পারে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন প্রাচ্যের শাস্ত্রকাররা। একাগ্রতা,

সংযম, ও ব্রহ্মচর্যের পথে কি করে এগিয়ে যাওয়া যায় তার ভূরি ভূরি উপায় বাতলে গিয়েছেন তাঁরা। সংযম ও একাগ্রতার মাধ্যমে কিরূপে intuition-এর দরজা খুলে যায় সে আলোচনার ভারত আর কিছু বাকী রাখেনি—আর এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বাতন্ত্র্য।

ভারতীয় সাধনার এ হচ্ছে একটা দিক। আর এক দিক হচ্ছে, স্বজ্ঞার জাগরণের ভেতর দিয়ে পরাজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার পরম প্রাপ্তি। এদিক দিয়েও ভারতবর্ষ এগিয়ে গেছে অনেক দূর। সেই বেদ-উপনিষদের যুগ হতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ জন্মদান করেছে অগণিত মহাপুরুষের যাঁরা স্বজ্ঞার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ধন্য হয়েছেন। সেই অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে উচ্চারিত হয়েছিল—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

আর আজও ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে ডেকে বলছে, "ভগবানকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথাও বলা যায়; আমি দেখেছি—তোমাকেও দেখাতে পারি।"

ভারতবর্ষ অনেকদিন আগে জেনেছিল চরম সত্যের সন্ধান বাইরে পাওয়া যায় না, ভেতরেই সেই সচ্চিদানন্দের অবস্থিতি। ভারতের অন্তরাত্মার মর্মবাণীটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। ভারতের মানুষ স্বজ্ঞাসহায়ে সেই পরম মানুষকে জানতে পেরেছে বলেই তো বলতে দ্বিধা বোধ করেনি—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি'। যুগে যুগে ভারত এই মন্ত্রেরই সাধনা করে এসেছে, আর তার এই সাধনাই তাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। পাশ্চাত্যের বহির্মুখী বুদ্ধিপ্রধান চিন্তাধারা হতে ভারতের অনুভূতি তাই বিভিন্ন।

স্বামিজীর মতে, এই দুই সাধনার সমন্বয়েই ভবিষ্যৎ জগতে হবে আগামী সভ্যতার বিপুল সম্ভাবনাময় সৃষ্টি।

মিলনোৎসব-ভাষণ

[দ্বিতীয় মিলনোৎসবের (১৯৩৮) সমাবর্তন-সভায় বক্তৃতার সারাংশ]

বিদ্যার্থী আশ্রমের আদর্শ ও আদর্শবাদ সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের সকলের এক নয়। এ সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার হলে কাজে লাগবে। এই জন্য এখানকার আদর্শ ও আদর্শবাদ সম্বন্ধে দুচারটি কথা বললে মন্দ হয় না।

পূজ্যপাদ হরি মহারাজ একটা কথা বলতেন: "হাওয়া আমাদের কতই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যেহেতু হাওয়া পেতে আমাদের কষ্ট করতে হয় না, সেই জন্য আমরা হাওয়ার কোনই দাম দিই না। কিন্তু যদি একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে অনেককে রাখা যায় তাহলে তারা বুঝতে পারে হাওয়ার কি দাম।"

ঠিক এই রকমই মহাপুরুষদের কাছে একটা অমূল্য আধ্যাত্মিক আবহাওয়া পাওয়া যায়। এই আবহাওয়ায় যারা আসে তারা অল্প আয়াসেই উন্নতির পথে চলতে পারে। কিন্তু এইটি এত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ঘটে যে অনেকেই এই সহজলভ্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের মর্যাদা দিতে পারে না। কিন্তু মহাপুরুষদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলে অভাবের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে তাঁদের সঙ্গের মূল্য কি।

এই আশ্রমের সহজলভ্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ সম্বন্ধেও কথাটা এইরূপই বলা চলে। প্রায়ই দেখা যায়, এখানে যারা রয়েছে তাদের চাইতে এখানকার সুযোগ-সুবিধার মূল্য তারাই বেশী দেয় যারা বেরিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। এও দেখা যায় যে যত দিন যায়, যতই বাইরের জগতের সম্পর্কে এসে

তাদের ভূয়োদর্শন বাড়ে, ততই যেন প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা এখানকার কর্মধারাকে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ বলে মনে করে।

স্বামিজী যে কর্মধারা, যে আদর্শের ইঙ্গিত করে গেছেন তারই অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করা হয় এখানে। স্বামিজীকে অনুসরণ করতে গিয়ে একথা আজ সকলের কাছেই ভালভাবে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কুইনাইন যেমন ম্যালেরিয়ার সার্থক প্রতিষেধক তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বর্তমান জগতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে যা কিছু অশুভ তার শ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রতি-ষেধক। আমাদের আশ্রমের আরম্ভ এই ভাব নিয়েই।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে…পরা চৈবাপরা চ।' মানুষ হতে হলে এ দুটি বিদ্যারই সাধনা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু অপরা বিদ্যা-দানের ব্যবস্থাই রয়েছে। তাই এখানে পরা বিদ্যা-দানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে যাতে অন্তর ও বাহির শুদ্ধ হয়ে মানুষ 'মানুষ' হতে পারে।

শিক্ষায় পরা বিদ্যার প্রয়োজন এই যুগের কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষীও অনুভব করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুই একজনের কথা বললেই হবে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী এইচ্. জি. ওয়েলস্ বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাসমরের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, গত পঁচাত্তর বৎসর যাবৎ শিক্ষা থেকে ধর্মের নির্বাসনই হচ্ছে এই যুদ্ধের একটি মুখ্য কারণ। এমন কি, জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলার সাম্যবাদীদের এক জায়গায় বলেছেন—'ধর্মকে তোমরা যদি সমাজ থেকে তাড়াতে চাও তবে তোমাদিগকে ধর্মেরই মত সমাজের এমন একটি অবলম্বন আবিষ্কার করতে হবে, ধর্মেরই মত সমাজ-জীবনের সকল অশুভকে নষ্ট করবার শক্তি যার থাকবে।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে এদেরও মতের বিরোধ নেই। যাঁরা বলেন, ধর্মশিক্ষা মানুষকে বর্তমান যুগের অনুপযোগী করে তোলে তাঁদের এই সব মনীষীদের কথা একবার ভেবে দেখতে বলি।

ঐখানে পরা ও অপরা বিদ্যার সম্মিলনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাতে মানুষ হতে পারা যায় তার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। স্বামিজী বলে গেছেন—মানুষ হতে গেলে চাই muscles of iron, nerves of steel আর hearts of adamant. এর সঙ্গে আধুনিকতার কোন বিরোধ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। চাই muscles of iron, nerves of steel—কর্মক্ষমতায় আর সহ্যগুণে নিজেকে অতুলনীয় করে তুলতে হবে। কুঁড়েমি ছাড়তে হবে। এখানেও তাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে বলা হয়, ভোরে ঘুম থেকে উঠবে, নিয়মমত নিজের কাজ কর্ম করবে। আর এই সব নিয়ম যাতে প্রতিপালন করতে পারা যায় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমাদের দেশের ত এই অবস্থা। এখন চাই নিরলস, অক্লান্ত কর্মী। এ সময় যারা কুঁড়েমি করে, ঘুমিয়ে সময় কাটায় তারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে—এ ছাড়া আর কি বলব! হৃদয়ের প্রসার চাই। চুরি, জুয়াচুরি, মিথ্যা-ব্যবহারাদি ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে সেবার প্রবৃত্তি।

মানুষের শিক্ষার সার্থকতা তখনই হয় যখন সে নিজের শিক্ষা-দীক্ষা দেশের ও দশের সেবায় লাগাতে সমর্থ হয়। আচার্য শ্রীশঙ্কর মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁরা 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ'। স্বামিজী প্রমুখ মহাপুরুষেরা দেশের ও দশের অনন্ত মঙ্গলসাধন করে গেছেন। এঁদের ভিতর দিয়ে শ্রীশঙ্করের বাণীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। স্বামিজী অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেশের সমস্যাগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। তিনি বলে গেছেন, এ দেশের কল্যাণ তার আধ্যাত্মিক জাগরণে। আধ্যাত্মিকতা ভারতের প্রাণ। ভারতকে জাগাতে হলে জাগাতে হবে এই প্রাণকে। তাই এখানে চেষ্টা করা হয় যাতে বিদ্যার্থীরা এই পথে, এই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যেতে পারে। What is an individual but a moving ego, encaged in flesh and

bones? (ব্যক্তিটা হাড়মাংসের খাঁচায় আবদ্ধ একটি চলন্ত আমিত্ব-বোধ ছাড়া আর কি ?) এই 'আমি'-বোধ স্বতন্ত্র হয়ে চললেই জাগে অমঙ্গল। এই 'কাঁচা আমি'র বদলে জাগাতে হবে এই বোধ যে তাঁর সঙ্গে আমার যোগ আছে, আমি তাঁর অংশ। তবেই আসবে কল্যাণ।

জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলার বলেছেন, 'মানুষ হতে গেলে প্রত্যেক জার্মানের চাই দৃঢ় শরীর, আত্মবিশ্বাস বা মনের জোর, আর চরিত্র।' প্রত্যেক জার্মানকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সাধারণ লেখাপড়ার পর দুবছর থাকতে হয় সামরিক শিক্ষাধীনে। সামরিক শিক্ষা শেষ হলে ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই সে জার্মান নাগরিক হবার যোগ্যতা অর্জন করে, বিয়ে করতে পারে। শুধু জার্মান নয়, প্রত্যেক জাতিকেই উঠতে গেলে এই সব শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। যে কোন কাজ, সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সুসম্পন্ন করতে গেলে এই সব বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরই যদি তোমার সুস্থ না থাকে, তবে তুমি কী করতে পার ? আত্মবিশ্বাস যার নেই, তার দ্বারা কী কাজ হতে পারে ? চরিত্রের জোর না থাকলে কোন মহৎ কাজই করা সম্ভবপর হয় না। ভারতীয় শিক্ষায় তাই এই সব শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ করে রয়েছে। স্বামিজীও এই শিক্ষা-ব্যবস্থাই মানবের কল্যাণের জন্য নির্দেশ করে গেছেন। মানব-কল্যাণে ভারতীয় সংস্কৃতি আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনধারায় জেগে উঠছে। ভারতের তথা ভারতেতর দেশের মুক্তি আসবে এই পথেই—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনধারার অমৃত-সিঞ্চনে।

ধর্মের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা যায়। অনেক সময় এও বলা হয় যে, ধর্ম কালের উপযোগী নয়। ধর্ম সঙ্কীর্ণ কখনও নয়। স্বামিজী ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন—'Religion is the manifestation of the divinity already in man'—মানুষের অন্তরে যে দেবভাব রয়েছে তাঁরই প্রকাশের

নাম ধর্ম। অন্তরের এই দেবভাব বাইরে যখন প্রকাশ পায়, তখন মানুষ সঙ্কীর্ণ থাকতে পারে কি? সাম্প্রদায়িক কলহ—ধর্মকে সঙ্কীর্ণ বলতে গিয়ে যাকে প্রধান নজীররূপে ধরা হয়—হয়ত ধর্মের নামে চলে, কিন্তু ধর্মের অনুশাসনে নয়। ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের কোন স্থান নেই যাঁরা বলেন, তাঁদের মহাত্মা গান্ধীর দিকে একবার চেয়ে দেখতে বলি। নিজে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মহাত্মাজী আধ্যাত্মিকতাকে সকলের চেয়ে কঠিন ব্যবহারশাস্ত্র রাজনীতিতে কিরূপ কৃতকার্যতার সহিত লাগিয়ে এসেছেন! রাজনীতির কুটিল পথে মহাত্মাজীর সত্যাশ্রয়ী সরল গতি এক অভূতপূর্ব জিনিষ।

প্রশ্ন হতে পারে, আমরা আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়ে কি পেতে পারি? পেতে পারি এমন বস্তু, যা পেলে দুনিয়ায় অপ্রাপ্ত আর কিছু থাকে না। এ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট গল্প মনে পড়ে গেল। মহাবীর সেকেন্দর তখন গ্রীসের রাজা। দার্শনিক মহামতি ডায়োজিনিস-এর নাম শুনে তাঁকে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন নির্বিকারচিত্ত ঋষি একটি টবের ভিতর বসে আছেন। সম্রাট তাঁকে বললেন, "ডায়োজিনিস, আমি পৃথিবী-বিজয়ী সেকেন্দর। তোমার নাম শুনে এসেছি। তোমার কি বাসনা বল। আমি এখনই পূরণ করছি।" বার কয়েক জিজ্ঞেস করার পর ডায়োজিনিস উত্তর দিলেন, "আমি চাই তুমি একটু সরে দাঁড়াও। রোদটা আমার গায়ে লাগুক।" ভিতরের আনন্দের স্বাদ যে একবার পেয়েছে তার কাছে বাইরের সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়; তার কাছে পৃথিবীর ধন-রত্ন, সুখ-সৌভাগ্য নগণ্য। অন্তরে যার আনন্দের ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছে, তাকে বাইরের কোন্ সম্পদ আকর্ষণ করতে পারে?

যথার্থ আত্ম-প্রত্যয় মানুষের তখনই আসে, যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে, অসীমের সাথে নিজের একত্ব অনুভব করতে পারে। তখনই সত্যিকারের বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারা যায়—

'কূর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্, রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥'

তখনই রাম-নামে মহাবীরের পক্ষে সাগর-লঙ্ঘন সম্ভবপর হয়। স্বামিজী লণ্ডনে বসে সেখানকার বড় বড় পণ্ডিতদের বলেছিলেন—তোমরা ভিতরের জিনিষ, আসল জিনিষ, পাও নি।

আর দুএকটি কথা বলে আমি শেষ করব। আমাদের জীবনের পথে চলতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির। তমকে তাড়াতে হবে। অশুদ্ধি যা আছে দূর করতে হবে। কুঁড়েমি ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া কখনই চলতে পারে না। এখানেও সেই কথাই বলা হয়। এই শিক্ষাই এখানে দেবার চেষ্টা করা হয়। রজগুণ আনে কর্মশক্তি; বিক্ষেপও আনে। সুপরিচালিত না হলে রজগুণ আসুরিক ভাব এনে থাকে। নিজের ভোগ-সুখের জন্য অনেক সময় মানুষ অপরের উপর অত্যাচারও করে থাকে। সেখানে সংযমের বাঁধ দিয়ে ফেরাতে হবে তাকে সুপথে। এজন্য প্রয়োজন সদ্‌বৃত্তির অভ্যাস। এই প্রতিষ্ঠানে সাধ্যানুসারে এই সব চেষ্টাই করা হয়।

এই সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল বিদ্যার্থীকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিয়ে এবার আমি বিদায় নিচ্ছি।

রজতজয়ন্তী-উৎসব-ভাষণ

[সভাপতির অভিভাষণের (১৩৪৮) সারাংশ]

আজকাল পাশ্চাত্য জগতের মনীষী-মহলে একটা নূতন ভাব দেখা যায়, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকটায় ছিল না। তখন বৈজ্ঞানিকরা জড় অণু-পরমাণু ও কতগুলি জড়শক্তি দিয়েই জগতের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতেন। ক্রমবিকাশের পিছনে কোন অদৃশ্য ঐশী শক্তির সন্ধান তাঁরা পান নাই। তাই ঐযুগের দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ জড়বাদ প্রচার করতেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক radio-activity প্রভৃতি কতগুলি ঘটনায় নিয়ামক কারণ খুঁজে না পেয়ে এক বিরাট ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। স্যর জেমস্ জীন্‌স্ ও স্যর আর্থার এডিংটনের লেখার মধ্যে এই ধরণের উক্তি অনেক আছে। এদিকে এই শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গ্‌সঁ creative evolution নামে তাঁর নূতন মতবাদের ভিতর দিয়ে সেই অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিত করেছেন। ইংলণ্ডের নবযুগ-প্রবর্তক সাহিত্যিক-চূড়ামণি বার্ণার্ড্ শ-ও তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এই মত প্রচার করেছেন। এঁরা বলেন যে শুধু জড়প্রকৃতির প্রভাবেই ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয় নাই। এর পিছনে প্রাণ-শক্তি (elan vital) নামে এক শক্তি রয়েছে। এই শক্তির দ্বারা চালিত হয়েই জীব ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যায়। এই জীবনীশক্তি, যাকে বার্ণার্ড্ শ বলেছেন life-force, জড়বস্তুর মত অন্ধ নয়, এবং এর কাজও শৃঙ্খলাবিহীন নয়। বিরাট ইচ্ছা দ্বারা (creative will) নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই প্রাণ-শক্তি জগৎকে ক্রমবিকাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্য দেশের নজীর আগে দেওয়া হল, তার কারণ আমাদের এখন

পাশ্চাত্য শিক্ষায় এতটা আস্থা যে ঐ দেশেব পণ্ডিতদের দোহাই না দিলে কিছুই আমাদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। অথচ যে তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহল এই যুগে আভাস ও ইঙ্গিতমাত্র দিতে স্বরু করেছেন, সেই তত্ত্ব আমাদের দেশে ঋষিরা কয়েক হাজার বছর পূর্বে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে প্রচার করে গেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঘটে। এই চরম সত্য তত্ত্বদর্শী হিন্দু ঋষিরা মানব-সভ্যতার আদিযুগেই আবিষ্কার করে গেছেন।

বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ঋষিদের মত ঐশী ইচ্ছা উপলব্ধি করেই ঘোষণা করেছিলেন, "The fiat has gone forth, India must rise"—ঈশ্বরের আদেশ এসেছে, ভারত জাগবেই। তিনি বহুবার বলেছেন—ভারতের নবযৌবন হবে। এগুলি কল্পনার কথা নয়, উপলব্ধি করা সত্য। যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে, সেইদিন থেকেই নবযুগ স্বুরু হয়েছে, যদিও আমরা এখন তার গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারছি না। কিন্তু স্বামিজী বুঝেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সব জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে যে যুগ স্বুরু হয়েছে, জগতে আধ্যাত্মিক জাগরণ নিয়ে আসাই হবে তার বিশেষ কাজ।

জগতের সর্বত্র পাশ্চাত্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা বড় জোর বিচারবাদের (intellectualism) উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটি বেশী দিনের জন্য নয়। স্বামিজী বলেছেন—এইভাবে চললে পাশ্চাত্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা যেন এক ভীষণ আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদি তারা আধ্যাত্মিকতার বনেদের উপর তাদের সভ্যতাকে খাড়া করতে না পারে, তাহলে তাদের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বে। চোখের সামনে ঋষিবাক্য ফলতে দেখছি। যাই হোক, স্বামিজীর এই সতর্কবাণী ব্যর্থ হবে না।

আধ্যাত্মিকতাকে বরণ করে নিয়ে পাশ্চাত্য জগৎ আসন্ন বিপদ থেকে অবশ্যই মুক্ত হবে। সারা জগতে ধর্মের মহাজাগরণ আসবে।

এই মহাজাগরণের কাজে ভারতকে বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে হবে। ভারত নিজে জেগে অপরকে জাগাবে। এখানকার প্রাচীন মূল্যবান ভাব ও আদর্শ শুধু কথার ভিতর দিয়ে নয়, জীবনের ভিতর দিয়ে জগতে ছড়াবে। স্বামিজী বলে গেছেন যে এই বিশেষ কাজটির জন্যই ভারত তার প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে এখনও বেঁচে আছে। মানব-সমাজে আধ্যাত্মিকতা পুনরুদ্দীপিত করে গোটা জগৎকে যথার্থ প্রগতির পথে, শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে নিয়ে যাওয়াই হবে ভারতের বিশেষ সাধনা। স্বামিজী এসব কথা ভাবুকতার বশে বলেননি. ঐশী ইচ্ছা উপলব্ধি করেই বলেছেন।

জগৎকে শ্রেয়ের পথে চালিত করার জন্য পরমকল্যাণময় ঈশ্বরের শুভেচ্ছা অনুসারে কাজ সুরু হয়ে গেছে। বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতকে জাগিয়ে তোলার কাজ চলেছে। এই বিদ্যার্থী আশ্রম এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। কাজেই, শুধু ভারতকে নয়, সারা জগৎকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে এই প্রতিষ্ঠানের একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামিজী অনেক মূল্যবান ভাব দিয়েছেন। সে ভাব নিয়ে, শুধু এখানে নয়, নানা জায়গায় বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন—ব্যক্তিগত, জাতিগত, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল রকম শিক্ষা আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলে তবে তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা চলে। শিক্ষা সম্বন্ধে সব দিক ভালভাবে যাচাই করে এবং বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করে তিনি একথা বলেছেন। জড়জগৎ ও সূক্ষ্মজগৎ দুইই তাঁর কাছে সুপরিচিত ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করতেন যে সকলের ভিতরেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মা রয়েছেন। উহাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তবে অজ্ঞানের আবরণে এটি ঢাকা। এই অজ্ঞানের আবরণটি ক্রমশঃ দূর

করে আমাদের ভিতরের পূর্ণতা ব্যক্ত করাই শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য। স্বামিজীর কথায়, "Education is the manifestation of the perfection already in man."

ক্ষুদ্র কীট থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধ পর্যন্ত সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্ম রয়েছেন। ভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটাদিতে আবরণ বেশী, উচ্চতর স্তরে ক্রমেই আবরণ পাতলা হয়ে আসে। বস্তুতঃ এই আবরণ থেকে মুক্তিলাভ করার এক বিপুল চেষ্টাই জীবকে ক্ষুদ্রতম কীটের অবস্থা থেকে বুদ্ধত্বলাভ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবের এই মুক্তি-অভিযানই হচ্ছে তার ক্রম-বিকাশের আসল তাৎপর্য। পশু-জগতের শেষ ধাপ পর্যন্ত জীব তার মুক্তির চেষ্টা সম্বন্ধে সচেতন নয়। আত্মরক্ষার জন্য সহজাত প্রবৃত্তিবশে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্রমেই সে শক্তি সঞ্চয় করে। এইভাবে আত্ম-সম্প্রসারণ করে পশু-জগতের শেষ ধাপটি পর্যন্ত জীব এগিয়ে যায়।

তারপর বিচার করবার এক অভিনব শক্তি নিয়ে সে মানুষের ধাপে ওঠে। এই বিচার-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করার উপায়ও মানুষ আবিষ্কার করেছে। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি হচ্ছে সেই উপায়। কিন্তু তবুও মানুষ পশুর মতই সহজাত প্রবৃত্তির (instinctive urge) অধীন। তার ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি আছে সত্য, তবুও সে এত অসহায় যে সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বিচার-বিরুদ্ধ পথেও জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারে—নিয়ে যায়ও। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবৃত্তিকে জয় করে বিচার-সম্মত পথে চলবার শক্তি তার না আসে, ততক্ষণ তার আচরণ পশুরই মত প্রবৃত্তি-চালিত। বিচার-শক্তি তীক্ষ্ণ করে দুনিয়ার সব খবর জেনেও কাজ করার সময় মানুষ যদি প্রবৃত্তির বশে চলে তাহলে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলা চলে না। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের শুধু নানা বিষয়ের খবর দেয়, বাহ্য প্রকৃতিকে বশে আনার উপায় শিখিয়ে দেয়, কিন্তু প্রবৃত্তি জয় করার মত শক্তি-অর্জনের কোন উপায়

শেখায় না। ফলে এইভাবে শিক্ষিত অনেক পণ্ডিতের অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায় তা শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি সোজা কথায় বর্ণনা করেছেন—

"পণ্ডিতেরা চিল-শকুনির মত খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে।"—অর্থাৎ বিচারের দিক দিয়ে এই সব পণ্ডিত পশু-জগৎ ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠেছে বটে, কিন্তু আচরণে কতক বিষয়ে তারা পশুর মতই রয়ে গেছে।

বিচার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে—তবে শিক্ষার সমাপ্তি। প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করে বিচার-শক্তির হাতে লাগাম দিতে পারাই হচ্ছে খাঁটি মানুষের কাজ। এইরূপ পারলেই পশু-জগৎকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা হয়। সুতরাং এইটিই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার প্রবৃত্তি-জয়ের ক্ষমতার অনুপাতে। মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য আনতে পারলে মানুষ জাতি হিসাবে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

কিন্তু প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার ক্ষমতা বিচার-শক্তির নাই। বিচার-শক্তি আলোর মত শুধু পথ দেখিয়ে দিতে পারে। চলার জন্য কোন্ পথ ভাল, কোন্‌টা মন্দ এইটুকুমাত্র জানিয়ে দিয়েই তার কাজ শেষ হয়। প্রবৃত্তি কিন্তু তার ইচ্ছামত পথে আমাদের টেনে নিয়ে যাবার শক্তি রাখে। বিচার-শক্তি যে পথকে অকল্যাণকর বলে জানিয়ে দেয়, অনেক সময় প্রবৃত্তি অসহায় মানুষকে সেই পথেই চলতে বাধ্য করে।

যাই হোক, বিচার ও প্রবৃত্তির মধ্যে নিয়ত সঙ্ঘর্ষের ফলে আমাদের ইচ্ছা-শক্তি (will) গজিয়ে ওঠে ও ক্রমে পুষ্ট হয়। ইচ্ছাশক্তি পুষ্ট হলেই প্রবৃত্তিকে দমন করে বিচার-সঙ্গত পথে আমরা চলতে পারি। তখনই আমরা বিচারকে আমাদের গতিবিধির কর্ণধার করতে সমর্থ হই, এবং তখনই আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্বেই বলেছি, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি শুধু আমাদের বিচারশক্তিকে তীক্ষ্ণ করেই ক্ষান্ত হয়। ঐসঙ্গে

আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা না হলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। শিক্ষিত হয়েও পশুর সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হয়েই থাকব।

ব্রহ্মচর্য, উপবাস, মৌনব্রত, অন্যান্য কঠোরতা প্রভৃতি সংযম ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াবার এক একটি উপায়। আর একটি বিশেষ উপায় হচ্ছে চিত্তের একাগ্রতা। এগুলিকে তপস্যা বলে।

তবে ইচ্ছাশক্তিকে শুধু বাড়িয়ে দিলেই শিক্ষার কাজ শেষ হবে না। ইচ্ছাশক্তি যাতে জগতের কল্যাণের পথে আমাদের নিয়ে যায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, তার কাজ করার ক্ষমতাও প্রবল হয়। তার বিচার-বুদ্ধি শুভ হলে যেমন সে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেবতার মত জগতের বহু কল্যাণ সাধন করতে পারে, তেমনি বিচার-বুদ্ধি অশুভ হলে তার অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দানবের মত জগতের অশেষ অকল্যাণও ঘটাতে পারে। এইজন্য মানুষের বুদ্ধি যাতে শুভ হয়, মানুষ দেবতার মত উদার ও প্রেমিক হয়, তার ব্যবস্থাও শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকেই যাতে উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুরাগ আসে, স্বার্থপরতা কমে যায়, বহু লোকের কল্যাণের জন্য মানুষ নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হতে পারে, তার জন্য যথাযোগ্য প্রেরণা শিক্ষার ভিতর দিয়ে আসা দরকার। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস বাড়লে এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সংযম অভ্যাস করলে মন এভাবে শুদ্ধ, পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদের প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে ইচ্ছাশক্তিটি পুষ্ট ও শোধিত করার এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। বিচার-শক্তিকে তীক্ষ্ণ করার ব্যবস্থা তো ছিলই। তাই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হত তাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বলা যেতে পারে। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে কিন্তু চরিত্র-গঠনের উপযোগী আসল শিক্ষার ব্যবস্থাই নাই।

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির এই বিরাট অভাবটি পূরণ করতে হবে—নইলে মানবজাতির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হবে না। তাই স্বামিজী পুরাকালের সেই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শে বর্তমান যুগের প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলতে বলেছেন। স্বামিজীর সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টায় এই বিদ্যার্থী আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব হয়েছে। একটু নজর করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এখানকার ঠাকুরঘর, ভজন, আলোচনা, কাজকর্ম প্রভৃতি সব কিছুরই আয়োজন বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অভাবটুকু পূরণ করার জন্য।

এই অভাব শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই নয়, সারা জগতের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে। সারা জগতে যদি শিক্ষা-পদ্ধতির এই অভাবটুকু পূরণ করা না হয়, তাহলে সত্যসত্যই মানব-সভ্যতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। জগতের সর্বত্রই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শ ছড়াতে হবে। সব দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গেই একে জুড়ে দিতে হবে। তবেই জগতের কল্যাণ। বর্তমান জগতের মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ এটি বেশ বুঝতে পেরেছেন মনে হয়।

আমার বিশ্বাস, যারা এই আশ্রমের আদর্শে জীবন-গঠন করেছে ও করছে, তাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠছে; আর যারা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে, তাদের চেষ্টাও ক্রমে সার্থকতা লাভ করছে। শ্রীভগবানের ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

[২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) বেলুড় মঠে প্রদত্ত বক্তৃতা]

বেলুড় মঠে আজ এত লোক কেন? প্রশ্নটি অতি সরল হলেও খুবই ভাববার বিষয়। কাজ-কর্মের বাধাবিঘ্ন ঠেলে, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করে হাজার হাজার নরনারী কী পাবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন? টাকা-কড়ি, মান-যশ প্রভৃতি বিষয়-জগতের যা কিছু আকর্ষণের বস্তু আছে তার কোনটিই আজ আমাদের অভীষ্ট নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এই বিরাট উৎসব। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি-তর্পণে আমাদের হৃদয় এতটা আকৃষ্ট হল কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ ত ধনী ছিলেন না, চতুষ্পাঠীর বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলেন না, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক অথবা আমরা যাকে কবি বলি বা যাকে দার্শনিক বলি তাও ছিলেন না; এমন কি, রাষ্ট্রনায়ক, স্বদেশসেবক অথবা দিগ্বিজয়ী বীরও ছিলেন না। এই সব ব্যক্তিদের স্মৃতি-তর্পণে আমাদের প্রেরণা আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই শ্রেণীভুক্ত নন, তখন তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য আমাদের হৃদয় এত উদ্বেল কেন—এ কথাটি নিশ্চয়ই আমাদের বিশেষ করে ভাবা দরকার।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের কোনও এক গোপন কক্ষ আজ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। এই গোপন কক্ষটির সন্ধান আজ আমাদের করে নিতে হবে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে তন্ত্রীটি শ্রীরামকৃষ্ণের যাদু-স্পর্শে বেজে উঠেছে, সেই তন্ত্রীটিকে বিশেষ করে আজ চিনে নিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও

উপদেশ এই জাতির যে মর্মস্থলে এক নবীন জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করেছে সেই মর্মস্থলের সন্ধান আজ আমাদের করে নিতে হবে—তবেই আজকের উৎসবে যোগ দেওয়া সার্থক। আত্মবিস্মৃত হয়ে, চোখ বুঁজে, বিনা বিচারে যে-কোন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে আমাদের চলবে না—এই জাতিকে নিজের অন্তরের স্বরূপটি জেনে নিতে হবে অতি সুস্পষ্টভাবে। কারণ এই জাতির নিজের সম্বন্ধে হুঁস যখন জেগে উঠবে তখনই এর চলার পথ হবে সুগম, অগ্রগতির বেগ হবে দুর্নিবার।

আমরা ভারতবাসী। জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ আছে, আমাদের স্বভাবেরও একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে। এই সংস্কৃতি ও স্বভাব দুদিনে গড়ে ওঠেনি—দুপাঁচ শত বছরেও না। ভারতীয় আর্যজাতির জীবন হাজার হাজার বছর ধরে বিশেষ একটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এ ধারাটি সুরু হয়েছে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে—সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে। সেই যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ স্থির হয়ে গেছে। এবং সেই আদর্শের ছাপ হিন্দু-জাতির অন্তরে এমন পাকাভাবে অঙ্কিত হয়েছে যে আজও তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তাই যখনই কাহারও জীবনে সনাতন ভারতের সেই মহান আদর্শ ফুটে ওঠে, তখনই সেই ব্যক্তির উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এই জাতি ছুটে যায়। আজও ঠিক তাই ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যে আর্যভারতের চিরমহিমময় আদর্শটি অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে এবং এই জন্যই তাঁর স্মৃতি-তর্পণে আর্যভারতের প্রাণ এমন নিবিড়ভাবে সাড়া দিয়েছে।

আর্য ভারতের এ আদর্শটি কী? বহু সহস্র বৎসর পূর্বে কোনও এক পরম শুভলগ্নে বৈদিক ঋষি আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥"

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

(বিশ্ববাসী অমৃতের সন্তানগণ! তোমরা সবাই শোন: অজ্ঞান-অন্ধকারের আড়ালে যে জ্যোতির্ময় মহান পুরুষ আছেন—যাঁকে জানলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে—সেই পুরুষকে আমি জেনেছি। তাঁকে জানা ছাড়া কল্যাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই।)

পরম সত্যের সন্ধান পেয়ে সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষি কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিশ্ববাসীকে কল্যাণের পথে আহ্বান করলেন। সেই সুদূর অতীতেই আর্য ভারতের চরম আদর্শ স্থির হল—ঈশ্বরলাভ। তারপর থেকে এই আদর্শ-লাভ করার জন্য কত চেষ্টাই না হয়েছে! কত ভিন্ন ভিন্ন পথই না আবিষ্কার হয়েছে! কত সিদ্ধ মহাপুরুষ ঐ আদর্শলাভ করে নিজ নিজ সাধনপদ্ধতির সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। ঈশ্বরলাভরূপ এই চরম লক্ষ্যের দিকেই নজর রেখে সনাতন ভারতের ঋষিরা এখানকার সমাজ-রচনা করলেন। ঈশ্বরলাভের দিকে এগিয়ে যাবার নামই আধ্যাত্মিকতা; এবং এই আধ্যাত্মিকতাকেই করা হল ব্যষ্টি-জীবনের চরম সার্থকতার মাপ-কাঠি। প্রত্যেক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবন যাতে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে—এই দিকে লক্ষ্য রেখেই হিন্দুসমাজের গোড়াপত্তন হল। বিষয়-জগতের সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য, সকল প্রভাব অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতাকে অনেক উঁচু আসন দেওয়া হল। ঋষি-প্রবর্তিত হিন্দুসমাজের সেই কাঠামটি আজ পর্যন্ত অটুটই আছে—এখনও আর্যভারতের জীবনের ভারকেন্দ্র সেই আধ্যাত্মিকতা।

অবশ্য হাজার হাজার বছরের মধ্য দিয়ে আমাদের হিন্দুজাতি ঐ মহান

আদর্শের দিকে একটানা গতিতে এগিয়ে আসে নাই। তবে একথাও ঠিক—ভারতের অধ্যাত্মস্রোত একদিনের জন্যও একেবারে লোপ পায় নাই। বিষয়-জগতের স্বাভাবিক আকর্ষণে—কখনও কখনও বা বিদেশীয় বিরোধী ভাবের সঙ্ঘর্ষে—মাঝে মাঝে এই স্রোতে ভাঁটা এসেছে সত্য, কিন্তু ঐ ভাঁটা বেশীদিন স্থায়ী হবার পূর্বেই আবার বান ডেকে জোয়ার এসেছে। ভরা গাঙের উচ্ছ্বসিত প্লাবনে আবার দেশ ভেসে গেছে। এমনি করে যুগে যুগে আর্যভারতের আধ্যাত্মিক জীবনধারাকে নূতন নূতন প্লাবন এনে বাঁচিয়ে গেছেন যাঁরা, তাঁদের আমরা এখনও অবতার বলে পূজা করি। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীনানক, শ্রীচৈতন্য এইভাবেই আমাদের জাতীয় আদর্শকে রক্ষা করে গেছেন। যখনই ঋষিপ্রদর্শিত অমৃতত্ত্ব-লাভের পথটি সন্দেহ-সংশয়ের কুজ্ঝটিকাতে ঢাকা পড়ে যাবার মত হয়েছে তখনই এঁদের কারও জীবনের মধ্য দিয়ে আদর্শটি মূর্তিমান হয়ে উঠেছে এবং তার প্রভায় সকল সন্দেহ, সকল অবিশ্বাস দূর হয়ে কল্যাণের পথ আবার আলোকিত হয়েছে। বস্তুতঃ এইভাবেই শ্রীভগবান স্বয়ং আর্যভারতের এই মহান আদর্শকে রক্ষা করে আসছেন। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলে গেছেন যে যখনই ধর্ম গ্লানিগ্রস্ত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই শ্রীভগবান স্বয়ং মানুষের রূপ ধরে অবতীর্ণ হন—ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, ধার্মিককে ত্রাণ করার জন্য।

বর্তমান যুগেও হিন্দুসমাজ পথভ্রান্ত হতে বসেছিল। বিদেশীয় ইহকালসর্বস্ব এক চটকদার সভ্যতার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে বহুকাল-সঞ্চিত আর্যভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শটি আমরা ছাড়তে বসেছিলাম। কিন্তু বিধাতার তা ইচ্ছা নয়। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আর্যভারত এত ঝড়-ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে, শ্রীভগবানের কৃপায়, যে আদর্শকে বুকে করে রেখেছে, তা কি এত সহজে ত্যাগ করা যায়? তাই বুঝি আমাদের ঘনীভূত সন্দেহ

ও অবিশ্বাস দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্য দিয়ে সনাতন ভারতের আদর্শটি এমন পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম প্রভৃতির এমন অপূর্ব সমাবেশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও দেখা যায় না। ভগবদ্ভাবের কী পূর্ণ অভিব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে! বর্তমান যুগের অবিশ্বাস যেমনি গভীর ও ব্যাপক, তেমনি অতল-স্পর্শী ও বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আধ্যাত্মিক প্রভাব। দেখতে দেখতে তাঁর ভাব সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে—তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে বিদেশের কত নরনারী কল্যাণের পথ দেখতে পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ধর্মজীবনের সমুদয় সুর-সপ্তকই তাঁর স্পর্শে বেজে উঠেছে। তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে পূর্ব-পূর্ব অবতারদের জীবন ও বাণী নূতন করে প্রকাশিত হয়েছে। কী সরল, কী মর্মস্পর্শী, অথচ কী যুক্তিসহ তাঁর বাণী। 'ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁকে ছোঁয়া যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়।' স্বামী বিবেকানন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দেখেছি। এই তোকে যেমন দেখছি—এর চাইতেও স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখি। আর তুই যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি।" কখনও বলতেন, "দিনের বেলা তারা দেখতে পাই না বলে কি বলতে হবে যে আকাশে তারা নেই?—তেমনি, সহজ দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায় না বলেই কি বলতে হবে যে ঈশ্বর নেই? তাঁকে দেখতে হলে চাই ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা হলে তাঁকে নিশ্চয় দেখতে পাবে। লোকে স্ত্রীপুত্রের জন্য, টাকাকড়ির জন্য এক ঘটি কাঁদে—ঈশ্বর-লাভের জন্য কজনের প্রাণ কাঁদে বল?" বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে লক্ষ্য করেই যেন তিনি বলতেন—"বাজে তর্ক করে কি হবে? বিশ্বাস না হয়, পরখ করে দেখ।" তিনি তন্ত্র মতে, বৈষ্ণব মতে, বেদান্ত মতে, এমন কি, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টান মতে সাধন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাই সকল রকমের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করার অমোঘ মন্ত্র তাঁর এক-একটি বাণী। 'ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও

বটে। ভক্তের কাছে ভক্তির হিমে জমাট বেঁধে যেন তিনি সাকার হন— আবার জ্ঞান-সূর্যের তাপে গলে জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার।' 'তিনি যে কী তা কেউ বলতে পারে না। ঈশ্বরের কেউ ইতি করতে পারে না। তাঁর রূপও অনন্ত, ভাবও অনন্ত। যিনি যে ভাবে ও যে রূপে তাঁকে আন্তরিক দেখতে চান, সেই রূপেই তিনি দেখা দেন।' 'তিনি কিন্তু এক, যদিও লোকে তাঁকে নানা নামে ডাকে। এই যেমন একই জলকে কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার, আবার কেউ বলে একোয়া। ঠিক তেমনি, একই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম, হরি, কালী, দুর্গা, শিব, রাম, আল্লা, গড্ প্রভৃতি নানা নামে নানা লোক ডাকে।' ধর্মজগতে এইটিই খাঁটি আর্যভারতের নিজস্ববাণী। এখানকার বৈদিক ঋষিই উচ্চারণ করেছিলেন এমনিই এক সার্বজনীন মন্ত্র, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, তাঁকে বিপ্রগণ বহুরূপে বর্ণনা করেন। এই উদার বাণী আবার শোনা যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—শোনা যায় শিব-মহিম্ন-স্তোত্রে। নিজের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যাচাই করে সেই বাণীই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের নরনারীকে শুনিয়েছেন। এবার আসর শুধু ভারতের মধ্যেই নয়—এবার সারা দুনিয়া জুড়ে আর্যভারতের অধ্যাত্মবাণী প্রচারিত হচ্ছে ও হবে।

আর এক কথা। এমনই উদার ও সার্বজনীন ভিত্তির উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন গড়া যে তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে গৃহস্থও যেমন নিজের কল্যাণের পথ স্পষ্ট দেখতে পায়—সন্ন্যাসীও ঠিক তেমনিই তার নিজের পথটি দেখতে পায়। নানা ভাবের এ কী অপূর্ব সমাবেশ! ঠিক এমনটি জগৎ আর কখনও দেখেছে কি?

অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবানের এ কী অপূর্ব লীলা! শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সত্যই আজ আর্যভারতীয় সংস্কৃতির মরা গাঙ্গে বান ডেকে জোয়ার এসেছে। শুধু জোয়ার নয়—এ একেবারে দিগন্ত-বিস্তারী মহাপ্লাবন! এ মহাপ্লাবনে

জগতের সকল দেশে অধ্যাত্মমূলক ভারতীয় সংস্কৃতি এক নব জাগরণ এনে দেবে। তাই আমাদের প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিতর্পণে আজ এমন নিবিড়ভাবে সাড়া দিয়েছে। অন্ধতা, মূঢ়তা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ দূর করে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগের পরমকল্যাণময় পথে আমাদের চালিত করার জন্যই আজ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর জীবনের আলোকে অধ্যাত্মজগতের প্রত্যেকটি পথই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকটি ধর্মমতেরই যেন নূতন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আজ এই উৎসবের শুভ মুহূর্তে এস হিন্দু, এস শিখ, এস ব্রাহ্ম, এস বৌদ্ধ, এস ইহুদী, এস খ্রীষ্টান, এস মুসলমান—এস, সকলে আজ এই অপূর্ব ঐশী আলোকের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির হিংস্র অন্ধকার দূর করে নিজ নিজ ধর্মপথে বিশ্বাসী হয়ে কল্যাণের দিকে—অমৃতত্বের দিকে এগিয়ে যাই আসুন, সবাই যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করি, "হে ভগবান! আমাদের অন্তরের কালিমা মুছে দিয়ে তুমি প্রকাশিত হও; জীব-জগৎ-চরাচরের মধ্যে তোমাকে দেখতে পেয়ে যেন আমাদের জীবন মধুময় হয়ে ওঠে।"

নমামি ত্বাং তারিণি

(গান)

[মালকোষ—একতালা]

নমামি ত্বাং তারিণি !
নমামি ত্বাং তারিণি !
ত্বং হি ব্রহ্মাণী ত্বং হি রুদ্রাণী
মাহেশ্বরী নারায়ণী
বারাহী নারসিংহী
অপরাজিতা কৌমারী—
অষ্টশক্তিরূপিণী ত্বং,
নমামি ত্বাং তারিণি !

করেতে শোভিছে বরাভয় আর
শাণিত কৃপাণ নরশবশির,
কণ্ঠে দুলিছে মুণ্ডালী।
কটিতে শোভিছে বিকট কাঞ্চী
নরশবকরনিকরে,
গগন চুম্বিছে উজল কিরীট
চরণে বাজিছে কিঙ্কিণী।
নমামি ত্বাং তারিণি !

বিকট শ্মশান করেছ আলয়,
আসন করেছ ঈশান-হৃদয়,
এলায়ে দিয়েছ চিকুরজাল।
লোলরসনা বিকটদশনা
শোণিত মেখেছ অঙ্গে,
ভীষণ আহবে ভীম হুঙ্কারে
সেজেছ দানব-দলনী।
নমামি ত্বাং তারিণি !

পলকে সৃজিছ বিশ্ব-চরাচর,
পুলকে পালিছ ত্রিদশ-পুর,
নিমেষে সাধিছ প্রলয়।
আদ্যাশক্তি সনাতনী
ত্বং হি পরমা প্রকৃতি,
লীলাময়ী অব্যাকৃতা
চিৎশক্তি-স্বরূপিণী।
নমামি ত্বাং তারিণি !

তুমি ভূমি ব্যোম তুমিই সলিল,
তুমিই অনিল তুমি বৈশ্বানর,
তুমিই মনোবুদ্ধি।

অহঙ্কার তোমার বিকার,
চিদানন্দরূপিণী।
তোমা ছাড়া আর কিছু নাহি সার,
বিপুল বিশ্বব্যাপিনী।
নমামি ত্বাং তারিণি! *

* ১৯১৯ সালে শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন গানটি রচিত হয়।

কয়েকখানি পত্র

[১]

[সঙ্ঘের জনৈক ব্রতীকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম
স্যর রমেশ মিত্র রোড, দমদম
২-৩-১৯৪১

স্নেহাস্পদেষু,

সাধু-জীবনের ভিত তৈরী হয় শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা। এটা ফাঁকা কথা নয়। কথাটির তাৎপর্য বেশ ভাল করে বুঝে নিয়ে এটিকে যে যতটা কাজে ফলাতে পারবে তার ততটা পাকা ভিতের উপর সাধু-জীবনের প্রতিষ্ঠা হবে।

কথাটির তাৎপর্য—আমার সব ভার তিনি নিয়েছেন। আমি তাঁরই ষোল আনা, এবং তিনিও আমার—আর কেউ নয়। তাঁকে অপরের ভিতর দেখলে বা জানলেই শুধু অপরকে আমার প্রিয় বলা চলতে পারবে। এরূপ বিশ্বাস করে নিলেও কতকটা চলতে পারে। তিনি আমার কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করছেন, যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই ব্যবস্থায়, আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য। প্রথমেই একথা বুঝতে পারি বা না পারি, এই কথায় বিশ্বাসী হয়ে তাঁর যাবতীয় ব্যবস্থা সানন্দে, সাগ্রহে এবং সশ্রদ্ধভাবে মাথা পেতে নিতে হবে। অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, নানাপ্রকার বাসনা ইত্যাদি আমাদের বুদ্ধি মলিন করে রাখে, এবং এই মলিন বুদ্ধি দিয়েই আমরা আমাদের জীবনের ঘটনার দাম যাচাই করি। তাতে অনেক ভুলপ্রমাদ

হওয়া স্বাভাবিক। মন আমাদের প্রিয় ও অপ্রিয়ের তাড়নায় অস্থির। শ্রেয়-কামী হতে হলে প্রিয় ও অপ্রিয়ের উপরে উঠতে হয়। তিনি আমার রুচি বা ফরমাস মত ব্যবস্থা করলে আমি খুঁসী হব, আর বিপরীত করলেই মন ভারী করে বসে থাকব—এটা স্থূলবুদ্ধি, বহির্মুখ সংসারাসক্ত লোকের মনের লক্ষণ। শ্রেয়কামী ব্যক্তির পক্ষে এটা সর্বথা পরিত্যাজ্য। প্রিয় অপ্রিয় যে ব্যবস্থাই হোক, সবই তাঁর ব্যবস্থা বিশ্বাস করে হাসিমুখে, প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে হবে, তাঁর ব্যবস্থার অপ্রিয়গুলি রীতিমত সহ্য করতে হবে। এই সহ্য করাকে লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "শ, ষ, স—কিনা সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।" এই সহ্য করাকে শাস্ত্রে বলে তিতিক্ষা। এই তিতিক্ষা যে সাধতে পারে, অমৃতত্ব লাভ তারই সহজ হয়। "যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥" তিতিক্ষা কাকে বলে জান? শ্রীশঙ্কর বলেছেন, "সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকং চিন্তাবিলাপরহিতম্"—বিলাপটি পর্যন্ত থাকবার যো নাই।

সুতরাং যেদিন তুমি সাধু হবার জন্য প্রথম পা বাড়িয়েছ, সেদিন থেকে যা কিছু ঘটে আসছে তা সবই তাঁর ব্যবস্থা, তোমার শ্রেয়লাভের জন্য—এই কথা বিশ্বাস করে মনকে যত নিশ্চিন্ত ও বিলাপশূন্য করতে পারবে ততই তোমার সাধু-জীবনের ভিত পাকা হবে জানবে।

যে ঘরে আছ, যেভাবে আছ, যে আবেষ্টনীর মধ্যে আছ, এ সবই তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন না হলে কল্যাণময়ের ব্যবস্থায় ঠিক এমনটি কখনও হত না। সুতরাং ওরই মধ্যে তাঁর দিকে মনটা সর্বদা ফিরিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

সাধুর অভিমান সম্বন্ধেও বেশ হুঁসিয়ার থাকা দরকার। "আমি সাধু, আমার দ্বারা এমন নোংরা কাজ কখনও করা সম্ভব নয়"—এরূপ অভিমানে

কোন দোষ নাই। নিজের দুর্বলতা জয় করার জন্য "আমি সাধু" এরকম একটা হুঁস (অভিমান-জাতীয়) জাগিয়ে রাখা ভালই; কিন্তু যে সাধু নয় সে আমার চাইতে হীন শ্রেণীর একটা জীব—এরূপ উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা ঘটাতে পারে এমন অভিমান সাধু-জীবনের একটা প্রকাণ্ড বাধা বলেই জানবে। বহুরূপে তিনিই সম্মুখে—এই কথা বারবার স্মরণ করে সমদৃষ্টি হবার চেষ্টা করা সাধুব পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

"একেবারে গুরু সেজে যা ইচ্ছা করে" বেড়ালে নিজেই মাবা যাবে। এখন সাধক সেজে তাঁব চিন্তায় ডুবে যাও এবং নিষ্কাম ও নিরহঙ্কার হয়ে তাঁর কাজ করে ধন্য হও। এইটাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত জানবে। ছেলে পড়ান কাজটি এদিক থেকে বড়ই কঠিন। প্রতি পদে আচার্যত্বের অভিমান বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাঁর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করবে যাতে প্রতিষ্ঠার কামনা থেকে মন মুক্ত হতে পারে। তুমি মাত্র সেবক, কোনপ্রকার প্রতি-দানের অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হযে যদি সেবা করে যেতে পার তবেই অধ্যাত্মপথে এগিযে যেতে পারবে। স্বামিজীব এই কথাটি সর্বদা মনে রাখার চেষ্টা করবে—"His work does not depend on the likes of you and me. He can raise His workers out of the dust by hundreds and thousands. It is only a glory and a privilege to be allowed to work under Him." যাই কিছু কর না কেন, সাধুই হও বা সিদ্ধই হও, নিজেকে একটা কেষ্টবিষ্টু কখনও মনে করো না।

আন্তরিক স্নেহ জানবে। ইতি

তোমাদেব

নির্বেদানন্দ

[২]

[সঙ্ঘের জনৈক ব্রতীকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম
স্যর রমেশ মিত্র রোড, দমদম
২২-৪-১৯৪১

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্রখানি কাল পেয়েছি। উতলা হয়ো না। কষে মন বাঁধ। না পোড়ালে সোনা খাঁটি হয় না। না ঘষলে চন্দনের গন্ধ বেরোয় না। এ সবই জানা কথা বটে, কিন্তু এই জানাটা এতদিন শুধু মাথায় ছিল, এখন অনুভূতির ভিতর দিয়ে এই জ্ঞানটিকে পরিপাক করতে হবে। মনের উপরে যত বড় আঘাত যে-কোন দিক থেকে এবং যে-কোন কারণে আসুক না কেন, সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ঘটছে শুধু তোমার কল্যাণের জন্য—এই কথাটিকে প্রাণপণ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে থাকবে। বারেবারে এই কথা স্মরণ করে সব আঘাত নীরবে যত সহ্য করতে পারবে, তত দ্রুত আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে। Mental plane-এ ঝড়-ঝাপটা সহ্য করাই স্বামিজীর গড়া আমাদের সঙ্ঘের সাধুদের বিশেষ তপস্যা। অপর সাধুরা physical plane-এ শীত-গ্রীষ্ম, খাওয়া-পরার কষ্ট প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তিতিক্ষা অভ্যাস করেন। এইটিই তাঁদের প্রধান তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধন। আমাদের মঠে যেসব সাধক working centre-এ থাকেন তাঁদের physical hardship সহ্য করতে হয় না বললেই চলে। দে—র তো কথাই নেই। সেখানে এদিকটা তো বেশ আরামের। এজন্যই আমাদের mental plane-এ hardship সহ্য করার জন্য কোমর বেঁধে লাগা উচিত। শ্রীভগবানের ব্যবস্থা জেনে এই সব তিতিক্ষা সাধন করাই আমাদের একমাত্র তপস্যা। এ তিতিক্ষার সীমা নেই।

Infinite patience, infinite forbearance এলেই জানবে উপলব্ধির চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছ।

আর এক কথা। কখনও কিছু ঘটলে একান্তে বসে বেশ ভাল করে বিচার করে দেখতে হয় নিজের ত্রুটি কিছু আছে কিনা। অনেক সময় নিজের দোষ নিজের কাছে ধরা পড়ে না। অহঙ্কার, অভিমান, প্রতিষ্ঠা-কামনা প্রভৃতি অন্তরালে থেকে অনেক সময় আমাদের বড় ফাঁকি দেয়; অধ্যাত্মপথ বড় কণ্টকাকীর্ণ করে ফেলে। নিজের দোষ দেখতে পেলে তা সংশোধন করার চেষ্টা আপনিই আসবে। আর হাজার খুঁজেও নিজের ত্রুটি যদি ধরা না পড়ে তাহলে ন্যায়-অন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত প্রভৃতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অকারণ আঘাতটিকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম কল্যাণময় ব্যবস্থা জেনে হজম করে ফেলতে হয়। আমাদের সহনশক্তি বাড়াবার জন্যই যেন এই ব্যবস্থা। সহনশক্তি বাড়লেই অমৃতত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা। সব অবস্থাতেই চিত্ত প্রসন্ন রাখার নামই যোগ। এইরূপ যোগস্থ হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগের ভিতর দিয়ে নিজের মোক্ষ ও জগতের হিতসাধন করাই স্বামিজীর আদেশ। যোগ বাদ দিয়ে কর্ম তো অনেকেই করে, তাতে কি আর জ্ঞান, ভক্তি, ঈশ্বর-লাভ প্রভৃতি আসে? খুব যখন মনে লাগবে, যখন দেখবে সহ্য করতে আর পার না, তখন নিরালায় বসে ঠাকুরের কাছে কাঁদবে। এর অতিরিক্ত কিছু যদি কর, তা হলে জানবে যা করছ তা at the cost of your spiritual growth. ভয় পেয়ো না। পথ ক্ষুরধার হলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহাশীষ সর্বদা তোমাকে রক্ষা করবে। তিনিই সহ্য করার শক্তি দেবেন যদি তোমার attitude correct হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সহ্য করার শক্তির জন্য।

এখানকার সব কুশল। আমার শরীর এখন ভালই মনে হচ্ছে। আন্তরিক স্নেহ জানবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ

[৩]

[জনৈক ত্যাগী প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
পোঃ টাকী, জেলা ২৪-পরগণা
১২-১-১৯৪২

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পেয়েছি। কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তির সঙ্গে জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত লড়াই করতে পারলেও জীবনটা কতকটা সার্থক হয়। এই আসক্তির কাছে ভয়ে আত্মসমর্পণ করলে জীবনের অনেকখানি মাটি হয়ে যায়। তাই যাবতীয় দুর্বলতা দূর করে দিয়ে সিংহবিক্রমে এ আসক্তির সঙ্গে লড়াই করতে বলা ছাড়া আর কোন কথাই মনে আসছে না। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" নিজেকে হীন, দুর্বল প্রভৃতি ভাবা কিছুতেই ঠিক নয়। তুমি মহাপুরুষের আশ্রিত, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তোমার শুভসঙ্কল্পের সহায়ক। এসব বাজে কথা নয়। আসক্তির সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে থাকলে নিশ্চয়ই গুরুকৃপায় তুমি জয়ী হবে। এ লড়াই প্রায় সকলকেই করতে হয়। এ লড়াই করতে করতেই অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হয়। এর ফলেই মানুষ দেবতা হয়ে যায়। তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে। অত অল্পে ভয় পেয়ে শ্রেয়মার্গ পরিত্যাগ করা কিছুতেই তোমার শোভা পায় না। একটা উঁচু আদর্শের দিকে তোমার লক্ষ্য আছে বলেই ত এই struggle; নচেৎ কোন্ দিন গড্ডলিকাপ্রবাহে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে। সেই উঁচু আদর্শকে আমরণ আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প কর। একটা জীবন এই লড়াই করেই কেটে যাক না। তাতেও অনেক লাভ, অনেক দূর এগিয়ে থাকতে পারবে। "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

স্বামিজীকে স্মরণ করো, তিনি তোমাকে তেজ-বীর্য দিয়ে উদ্দীপিত করবেন। জগতের কল্যাণের জন্য এক জীবনের তুচ্ছ ভোগ না হয় বিসর্জন দিলে। মহাপুরুষরা সবাই তাই করেছেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে চল। হাজার বার পড়ে গেলেও সেই পথ ছাড়বে না, এবং ঐটিই পরম কল্যাণের পথ জানবে। যদি কোন সঙ্গ, সংস্পর্শ, এমন কি, কর্তব্য এই পরম কল্যাণের পথে একটুও বাধা দেয়, তাহলে তা বর্জন করতে কোনপ্রকার দ্বিধা করো না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য লোকে যেমন করে বিষ ছুড়ে ফেলে দেয়, ঠিক তেমন করে এই সব সংস্পর্শ ও কর্তব্যাদি ছুড়ে ফেলে দেবে। ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য—একথা ভুললে চলবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর একথা বারবার স্পষ্ট করে বলে গেছেন। আর কামিনীকাঞ্চনই হচ্ছে ঈশ্বরলাভের সব চেয়ে বড় অন্তরায়। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" নিজের জীবনকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করে দাও। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ভোগে তোমার অধিকার নেই—এই কথা তোমার মনকে বারবার শোনাবে।

এখানে কাছেই একটি দোতলা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। পূর্বের মত শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা হয়। দশ-বারোটি ছেলে এখানে আছে। এখানকার সব কুশল। আন্তরিক স্নেহ জানবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ

[৪]

[সঙ্ঘের জনৈক ব্রতীকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোম
পোঃ হাসনাবাদ, জেলা ২৪-পরগণা
১-৭-১৯৪২

স্নেহাস্পদেষু,

··· পরমারাধ্য রাজা মহারাজের জীবনীটি খুব ভাল লেখা হয়েছে বলে মনে হল না। তবে তাঁর কথা যেভাবেই বল inspiring হবে সন্দেহ নাই। লেখাটা dignified হলে আরও ভাল লাগত।

Aryan Path-এর সমালোচক ভদ্রলোক আগাগোড়া বইটি পড়েছেন বলে মনে হল না। 'Beacon Light' অধ্যায়টি তাঁর নজরে এসেছে কিনা সন্দেহ। Christianity-র প্রতি bias ত আছেই।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে দুচার কথায় মত বলা শক্ত। তবে আমার মনে হয় তিনি হিন্দুদর্শনকে orthodox Western Philosophy-র সমপর্যায়ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন—বিশেষতঃ 'Life Divine' পুঁথির মারফত। অনুভূতি প্রভৃতিকে rationalize করে Philosophy-র কোঠায় আনার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গোঁড়ামি যদি কমে এবং পাশ্চাত্য দর্শনের গণ্ডীটি যদি প্রসারিত হয় তাহলে ভালই। Philosophy-র ক্ষেত্রে বর্তমান জগতের আসরে ভারতের গৌরব এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতেও পারে। এটা কম কথা নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের মারফত সাহিত্যের আসরে, মহাত্মাজীর মারফত রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের বৈশিষ্ট্য বর্তমান জগতে সমাদৃত হয়েছে ও হচ্ছে, পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রেও শ্রীঅরবিন্দের Philosophy-র মারফত তেমনি ভারতের বৈশিষ্ট্য সমাদৃত হবে আশা করা যায়। কিন্তু মনে থাকে যেন আমি Philosophy-র কথা বলছি, ধর্মের কথা নয়। ধর্ম-প্রচারে

আচার্যদের অভ্রান্ত বাণীই একমাত্র পথপ্রদর্শক। মনীষীর প্রবর্তিত **Philosophical system**-এ ভুলভ্রান্তির স্থান আছে। কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি যে সব **Philosophical system** খাড়া করে গেছেন, পরবর্তীকালের critic-দের নজরে ঐগুলির ভিতরেও গলতি ধরা পড়েছে। শ্রীঅরবিন্দের system of **Philosophy** এই শ্রেণীরই। এতে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু এর পিছনে তাঁর অসাধারণ মনীষা ছাড়া আধ্যাত্মিক অনুভূতিও আছে—যেমন স্পিনোজা-র ছিল—এবং এর ভিতর দিয়ে ভারতীয় ভাবধারার বহুল প্রচার তিনি করেছেন।

Compensation (গৌরীপুরের জমি ও ঘরবাড়ী বাবদ সরকার-প্রদত্ত খেসারতি) মন্দ হয়েছে কি ! ওরা **valuation**-এর ওপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে ধরেছে। ··· সর্বসমেত মাসিক ভাড়া ৯০০৲ এবং এককালীন খেসারতি ১৮,৯১০৲ ধার্য হয়েছে। দুই বৎসরে প্রায় ৪০,০০০৲ পাওয়া যাবে। গভর্ণমেণ্ট অন্যায় কিছু করেছে বলে ত মনে হয় না। ···

এখানকার সব কুশল। আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ

[৫]

[জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম
পোঃ হাসনাবাদ, জেলা ২৪-পরগণা
১৬-৭-১৯৪৩

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার পরীক্ষা কেমন হয় জানিও। পত্রের মারফত তোমার প্রশ্নটির আলোচনা করা কঠিন। সাক্ষাতে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে এ জটিল বিষয়টিকে পরিষ্কার করে নিতে পারলে ভাল হত। যাই হোক, সংক্ষেপে এ বিষয়ে দুচারটি কথা বলছি।

স্বামিজী কোন কিছুরই detailed plan দিতে আসেননি। তিনি শুধু আদর্শের দিকে সকলকে আকৃষ্ট করার জন্য ভাব (ideas and ideals) ছড়িয়ে গেছেন। এখন তাঁর ভাব অবলম্বন করে যে-কোন ক্ষেত্রে এগুবার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

তাঁর একটি প্রধান কথা এই যে ভারতীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্মের (আধ্যাত্মিকতার) উপর। এই প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করতে হবে। এই ভারতের কল্যাণের পথ। এটি শিথিল হলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া জগৎকে আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্যই ভারত এতদিন বেঁচে আছে। আর এই শিক্ষার প্রভাবেই চটকদারী অথচ আত্মঘাতী বর্তমান মানবসমাজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই বিষয়ে অপরকে শেখাবার মত পুঁজি ভারতের আছে। শুধু এখন আছে তাই নয়, যুগে যুগে এখান থেকে আধ্যাত্মিক ভাব বেরিয়ে গিয়ে মানব-সভ্যতাকে শোধিত করেছে।

এই ধর্ম (বা আধ্যাত্মিকতা) ফাঁকা কথা নয়। কারও মুখের কথায় এটি উড়ে যাবার মত জিনিষ নয়। এর সারবত্তা স্বামিজী স্বয়ং উপলব্ধি করে

তারপর তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। কার্ল মার্কস্ যদি ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, জন্মান্তর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি না করে থাকেন, তাহলে তাঁর দুর্ভাগ্য বলতে হবে। বেদে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য এবং এযুগের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যে সত্য উপলব্ধি করে ঘোষণা করেছেন—তা কোন পণ্ডিতের যুক্তির প্রভাবে লোপ পেয়ে যাবে না, বরং জগতের সুধীসমাজ যথাকালে এই চরম সত্যের সন্ধান পেয়ে মানব-সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারবে।

আর একটি কথা স্বামিজী বলেছেন। সেটি এই যে ধর্ম সম্বন্ধে একটা প্রয়োজনবোধ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। "Religion is a constitutional necessity." দুদিন পাঁচদিন কোন ব্যক্তি বা সমাজ ধর্ম বাদ দিয়ে শুধু খাওয়া-পরার অভাব মোচন করে দিন কাটাতে পারে বটে, কিন্তু এই-ভাবে বেশিদিন কাটানো অসম্ভব। ভোগের ভেতর দিয়ে বাসনা বেড়েই যায়। সে পথে মানুষ শান্তি কখনও পায় না; আর যতক্ষণ শান্তি না পায় ততক্ষণ মানুষকে ছটফট্ করতেই হয়।

স্বামিজীর এই অভ্রান্ত বাণী থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় যে যদিও পাশ্চাত্য-খণ্ডে কোন রাষ্ট্র থেকে ধর্ম নির্বাসিত হয়ে থাকে, সেটা সাময়িক মাত্র; নিশ্চয়ই সেই রাষ্ট্রে আবার খাঁটি ধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানকার লোকের প্রাণের টানেই এরূপ ঘটতে বাধ্য।

ওদেশে ইদানীং ধর্ম একটা ব্যবসামাত্র হয়ে উঠেছিল। ধর্মের নাম করে mass-কে exploit করা হত। কার্ল মার্কস্ এই প্রকার ধর্মের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, তাই এরই নির্বাসনের ব্যবস্থা তিনি দিয়েছিলেন। যথার্থ সত্য-ধর্মের সন্ধান পেলে হয়ত তিনি সেই ধর্মের প্রবর্তনের কথা বলতেন। সেইকথা বলতেই এই যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন।

মার্কস্ অনেক খাঁটি কথা বলেছেন। তবে ইতিমধ্যেই তাঁর কথার

নানারকম ব্যাখ্যা বেরিয়েছে। লেনিন একরকম বুঝেছিলেন, বার্ণার্ড শ আরেক রকম বুঝেছেন, ষ্ট্যালিন এক রকম বুঝেছেন, ট্রট্স্কি আরেক রকম বুঝেছিলেন। যাই হোক, কার্যক্ষেত্রে practical application করতে গিয়ে রাশিয়াতেই প্রথম যেভাবে সুরু হয়েছিল তা থেকে এখন অনেক modification হয়েছে। ভবিষ্যতে রাশিয়াতেই মার্কস্‌-এর theory কী রূপ নেবে তা কেউ বলতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক দেশেই ঐ মূল theory-র নানা রকম modified application হওয়া স্বাভাবিক। ভারতে আধ্যাত্মিকতার ভিতের উপরে ঐ theory-র যতটা গ্রহণ করা সম্ভব ততটা নেওয়াই বোধ হয় ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর। পণ্ডিত জহরলালও একথা বলেছেন যে আমাদের দেশের উপযোগী modification করে তা apply করতে হবে।

যারা বলে যে কার্ল মার্কস্‌-এর সব কথা ষোলআনাই নিতে হবে, তাদের খুব গভীর দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না।

বস্তুতঃ Capitalism এবং Imperialism-এর প্রতিবাদ (antithesis)-রূপেই Sovietism-এর আবির্ভাব। আবার Sovietism-এর প্রতিবাদরূপে (আরও intenser type of Imperialism) Nazism এবং Fascism-এর আবির্ভাব। এইভাবে thesis এবং antithesis-এর ঘাত-প্রতিঘাতে নূতন নূতন synthesis হবে। সমাজ বা রাষ্ট্র-গঠনের শেষকথা এখনও বলা হয় নাই। যতদূর মনে হয়, বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর জগতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হবে, এবং তারই পূর্বাভাস একদিকে ধর্ম বাদ দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অপর দিকে বেদান্তের মহিমা নূতন করে ঘোষণা করা। এই দুটিই জগতে এই যুগের significant epoch-making ঘটনা। তৃতীয় ঘটনা বর্তমান লড়াই (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)। এই তিনটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মানব-সমাজ বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদে গিয়ে পৌছুবে আশা করা যায়।

রাশিয়ায় কমিউনিজম্ দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন; বর্তমানে সেখানে Dictatorship of the proletariate চলছে। স্বামিজীর ভবিষ্যৎ বাণীও এইরূপ—ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের রাষ্ট্রচালনার যুগ পরে পরে অবসান হয়েছে; বৈশ্যেরও হয়ে এলো। এর পরেই শূদ্রের (proletariate) পালা।

স্বামিজী গণশক্তি-জাগরণের কথা বলেছেন। Mass-কে খাইয়ে-পরিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে! কিন্তু ধর্ম বাদ দিয়ে নয়। ধর্মই আমাদের জাগরণের শক্তিকেন্দ্র। নিজেদের হাতে শাসনভার এলে অল্পদিনেই এই অঘটন ঘটবে, এবং এই দেশেই খুব সম্ভব বেদান্তের আধ্যাত্মিক সার্বভৌমিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদের অপূর্ব সৌধ রচিত হবে, এবং এরই অনুকরণ জগতের দেশে দেশে হবে।

শুধু West নয়, শুধু East নয়—দুইয়েরই মহার্ঘ্য সম্পদের যোগে (true Vedantic Religion and true Socialism) ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ গঠিত হয়ে মহিমান্বিত হবে। বস্তুতঃ সমাজের মধ্য দিয়ে বেদান্তের ঐক্য প্রতিষ্ঠার নামই খাঁটি Socialism. কার্ল মার্কস্ এই সত্য ধরতে পারেননি, তাই তাঁর interpretation materialistic.

চিঠি বড় হয়ে গেল। অথচ সব কথা বলা হল না। সাক্ষাতে আলাপ ছাড়া এসব বিষয়ের আলোচনা করার শক্তিও নাই, অবসরও নাই আমার।

অত্রস্থ কুশল। আন্তরিক স্নেহ জানবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ

[৬]

[জনৈকা ভক্ত-মহিলাকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোম
২৭৯/৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
২৩-৯-১৯৪৩

কল্যাণীয়াসু,

এখানে এসে যথাসময়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছেছি।……এবার তোমাকে বড় ক্লান্ত ও বিমর্ষ দেখে ভারি চিন্তিত হয়েছি। শরীরটার একটু যত্ন লওয়া দরকার। ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। শরীরটা ভাল হলে মানসিক উদ্বেগের কারণগুলি সহজেই হজম করে ফেলে তুমি সব সময়ই প্রফুল্ল থাকতে পারবে। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতা, এবং পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহাপুরুষ মহারাজের বিশেষ কৃপা তুমি পেয়েছ। তুমি জানবে তুমি খুবই সৌভাগ্যবতী। সংসারের ঝড়ঝাপ্‌টা দুদিনের। এতে তোমাকে কাবু করতে পারবে না কখনই। সব ভার শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খুঁটি পাকড়ে থাকবে। কোন ভয় নাই। ভবিষ্যতের ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ো না। যাই কিছু ভালমন্দ ঘটুক না কেন, সবই তোমার পরম কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ঘটছে জেনে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকবে।

এখানকার সব কুশল। আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
নির্বেদানন্দ

[৭]

[জনৈকা ভক্ত-মহিলাকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
২০, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা
১৭-৯-১৯৫২

কল্যাণীয়াসু,

আপনার ২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে আপনি শ্রীমানের খবরে কতখানি ব্যথিত হয়েছেন বুঝলাম। মায়ের প্রাণে কতটা লাগতে পারে তা যদি ছেলেরা বুঝত তাহলে সংসারে দুঃখের মাত্রা অনেক কমে যেত। বিশেষতঃ আজকাল ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটা হাওয়া বইছে। নিজের ইচ্ছায় সবাই চলতে চায়। কৃতী ও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের তো কথাই নাই। তার উপর এরূপ কোন ছেলে যদি পাশ্চাত্য-সমাজের মাঝখানে থাকে, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় চলাটা তার কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হতে পারে।

অবশ্য শ্রীভগবানের কাছে আপনি প্রার্থনা করে দেখতে পারেন তিনি যদি আপনার মনের মত পথে শ্রীমানকে ফিরিয়ে আনেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বোঝা কঠিন। কাকে কোন্ পথ দিয়ে কেন ঘোরান তিনিই জানেন। অবশ্য তিনি যা করেন আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্যই—আমরা তা বুঝি আর না বুঝি। আমাদের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয় তা আমরা অনেক সময়ই বুঝি না। নিজের খেয়াল বা বাসনা মিটলেই মনে হয় মঙ্গল হচ্ছে, অন্যথা নয়। কিন্তু তিনি আমাদের দুঃখকষ্ট প্রভৃতির ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর দিকেই যাতে মনটা যায় তারই ব্যবস্থা করে কল্যাণের পথে আমাদের চালিত করেন।

তাই মনে হয় আপনার প্রার্থনা-সত্ত্বেও তিনি যদি শ্রীমানকে আপনার রুচি-বিরুদ্ধ পথে নিয়ে যান, তাহলে সেইটেই মঙ্গলময়ের বিধান মনে করে সহ্য

করে নেওয়াই আপনার কর্তব্য। প্রাণভরে শ্রীমানকে আশীর্বাদ করবেন যাতে সে সুখী হয়—যে পথই সে বেছে নিক না কেন। সবটাই শ্রীভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে এইটি জেনে শ্রীমানকে ঐরূপ আশীর্বাদ করতে পারলে প্রাণে শান্তি পাবেন।

শ্রীভগবান আপনার মনে শান্তি দিন—ইহাই তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা। স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি জানবেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
নির্ব্বেদানন্দ

[৮]

[জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম
২০, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা
৫-১২-১৯৫৩

দুতিন দিন হলো তোমার ২৯শে নভেম্বরের লেখা চিঠি পেয়েছি। দোটানার মধ্যে থাকবে কেন? যে পথে পা দিয়েছ সে পথেই এগিয়ে চল। ওটাকে প্রেয়ের পথ মনে করবে কেন? শ্রেয়লাভ ওখানেও হয়। অর্জুন তো শ্রীকৃষ্ণের কাছে শ্রেয়লাভের উপদেশ চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে বলেননি। বরং কর্তব্য চুটিয়ে করতে বলেছেন—শুধু কামনাশূন্য হয়ে। ঈশ্বরলাভের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারীদের যে সব অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন 'কথামৃত' থেকে সেগুলি বারে বারে পড়বে—মনে বল পাবে। শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' বইখানি যোগাড় করে যদি

পড়তে পার তাহলে বেশ হয়। মোটকথা, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঐ পথেও শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার হাত ধরে আছেন। একটু-আধটু ভোগ করিয়ে নিয়ে তোমার প্রারব্ধ কাটিয়ে তিনি তোমাকে নিজের দিকে নিয়ে যাবেন। এই বিশ্বাস সর্বদা অন্তরে রাখার চেষ্টা করো।

তুমি এবারে বেলঘরিয়া দেখে যেতে পারনি। কাজ সেখানে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় আগামী বৈশাখের প্রথম দিকে বিদ্যার্থী আশ্রম সেখানে তুলে নেওয়া যাবে। সেই সময় সেখানে বেশ ঘটা করে মিলনোৎসব হবারও কথা চলছে।......আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

তোমাদের

নির্ব্বেদানন্দ

[৯]

[জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম

পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪-পরগণা

২০-৪-১৯৫৬

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পড়ে খুবই ব্যথিত হলাম। সংসারের স্বরূপটাই এই রকম। স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতায় এরই স্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোক এই ছবি দেখেও দেখে না। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন—উট কাঁটাঘাস খেয়ে চলে, যদিও মুখ কেটে দরদর করে রক্ত পড়ে। তুমি খুবই ভাগ্যবান যে ভগবৎ-কৃপায় সংসারের জালাময় স্বরূপটা তোমার কাছে ধরা পড়েছে। নিজেকে হতভাগ্য মনে করবে কেন? আমি তো দেখছি তুমি

খুব ভাগ্যবান। শ্রীভগবান স্বয়ং তোমার চোখ খুলে দিচ্ছেন। ভয় কি? সংসারের কাছ থেকে সুখের প্রত্যাশা না করে কাজ করে যাও এবং সব রকম জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে নাও। তাঁরই উপদেশ—"শ, ষ, স, কি না সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয় সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।" তিনি তোমার প্রার্থনা শোনেন এবং তিনিই তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং কোন কারণেই দমবে না। তাঁকেই একমাত্র আপনার জেনে অপরদের প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে করে যাবে।

আমার শরীর একপ্রকার চলে যাচ্ছে। এখানকার অন্যান্য কুশল। আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি গ্রহণ করবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ

[১০]

[জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম
পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪-পরগণা
১৫-১১-৫৭

স্নেহাস্পদেষু,

অনেকদিন ধরেই তোমার কথা মনে হচ্ছিল। বলাবলি করছিলাম—৺বিজয়া-সম্মেলন, ৺কালীপূজা, কোনটাতে আসতে পারলে না, অসুখ-বিসুখ করল নাকি? যাই হোক, তোমার ১০-১১-৫৭ তারিখের চিঠি পেয়ে সব পরিষ্কার হলো। খুবই উদ্বেগের ভিতর তোমার দিন কাটছে বুঝতে পারছি।

এতদিন ধরে যোগ্যতার সঙ্গে তুমি কাজ চালিয়ে এসেছ ; কাজেই শ্রীভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন আশা করি। যদি বিপরীত কিছু ঘটে তা তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে জেনে সহ্য করে যাওয়াই কর্তব্য। নিশ্চয় ওরই ভেতর দিয়ে তোমার বিশেষ কিছু মঙ্গল হবে।······শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা কর যাতে তিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

এখানকার সব খবর ভাল। ৺কালীপূজার দিন রাত তিনটা অবধি প্যাণ্ডেলে ছিলাম। তার ধকোল কাটাতে দিন পনেরো গেছে। উপস্থিত শরীর মোটামুটি ভাল। আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি গ্রহণ করবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ

[১১]

[জনৈক বাল্যবন্ধুকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম
পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪-পরগণা
২-১১-১৯৫৮

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই মু—, বহুকাল পরে গত পরশু সন্ধ্যায় তোমার পত্রখানি পেয়ে সব খবর জানলাম।···তোমার কথা আমার বেশ মনে আছে। তবে এতকাল কোন খোঁজখবর পাইনি। যাই হোক, লঙ ফেলো-র ভাষায়, "Let the dead past bury its dead." স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Spit out your actions, good or bad, never think of them again. What is done is done. Throw off superstitions. Have no

weakness even in the face of death. Do not repent. Do not brood over past deeds, and do not remember your good deeds ; be azad (free)." আবার তিনি বলেছেন, "God is the abstract compound of all that is merciful and good and helpful ; that should be the sole idea." তাই পরমকারুণিক ভগবানকে আমাদের পরম আত্মীয় মনে করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই সে প্রার্থনা পূরণ করবেন। মানুষ ভুল করে অজ্ঞানের বশে। আবার ভগবানই অনুতাপ দিয়ে মনকে শুদ্ধ করে নেন। কোন ভয় নেই।

দীর্ঘকাল high blood pressure এবং diabetes-এ ভুগে ভুগে বর্তমানে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি ; চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। পুনরায় আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

তোমাদের

নির্ব্বেদানন্দ

[১২]

[জনৈক প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিত]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম

পোঃ বেলঘরিয়া, জেলা ২৪-পরগণা

৩-১১-১৯৫৮

স্নেহাস্পদেষু,

স্নেহের ভূ—,... ছোটছেলে হাঁটতে গিয়ে কতবার পড়ে যায়, কিন্তু আবার ওঠে ; যতক্ষণ না ভালভাবে হাঁটতে শেখে ততক্ষণ উদ্যম ছাড়ে না।

Perfect হয়ে আমরা কেউই আসিনি। কিন্তু perfection-এর ideal-এর দিকে লক্ষ্য রেখে struggle করাই আমাদের কাজ। এবং এইভাবে অনবরত struggle করলে ভগবান আমাদের প্রয়াস সার্থক করে তোলেন। তাই একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার জো নেই। গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন, "উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" তিনি অনুতাপ দিয়ে আমাদের জাগিয়ে রাখবেন। জীবনটাই একটা continued struggle for perfection.

এখানকার অন্যান্য খবর ভাল। আমার শরীরটা কিছুদিন যাবৎ খুব দুর্বল, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছাদি গ্রহণ করবে। ইতি

তোমাদের

নির্বেদানন্দ
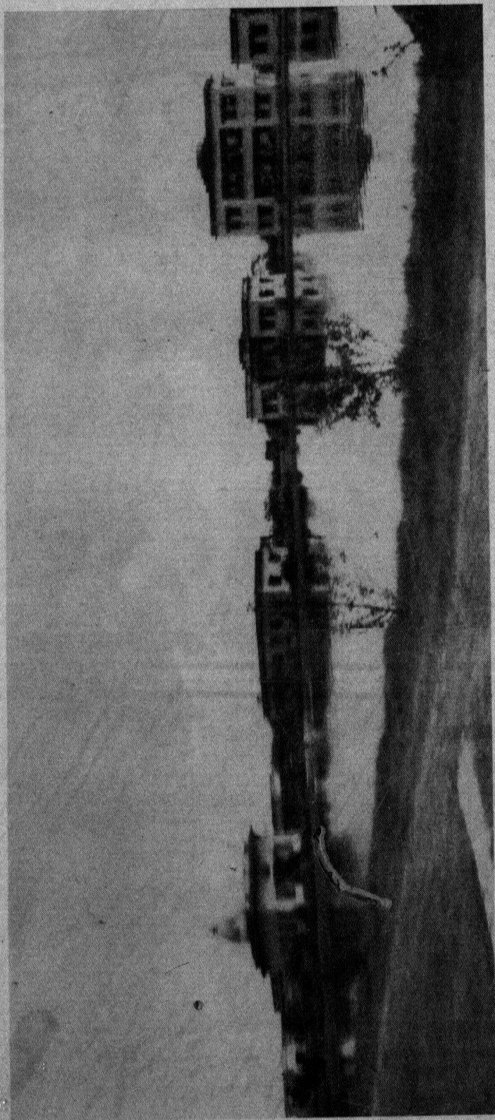
বিদ্যার্থী আশ্রমের একাংশ

A PRAYER

[*Vidyarthi, Puja Number 1344*]

O Mother Durga, Thy annual visit reminds us of Thy unfailing Grace. We, Thy 'prodigal' children, have strayed far out of the holy path of our hallowed ancestors, who, in all faith and sincerity, knew how to receive and worship Thee.

Our minds are impure and distracted, and hopelessly possessed by the sordid thoughts of worldly things. Our vision does not extend beyond the reach of the senses. Our lips curl with contempt and hauteur at the suggestion of things Divine. We have no regard for the sacred scriptures, nor for the seers and prophets. Lust, lucre and fame are all that we care for. Selfishness and vanity, hatred and dissensions compose the dismal picture of our individual as well as collective life.

No wonder that such a heavy layer of unclean thoughts has made our minds impervious to Thy Divine Light.

Yet, Thou, in Thy infinite mercy, dost not forget to bless Thy children even in their moment of spiritual torpor.

O. Divine Mother, kill the demon of impurities that is reigning supreme in our hearts and bathe us in the nectar of Thy Divine Love. Take off the dark veil of self-deluding ignorance and endow our minds with the perpetual glow of spiritual knowledge. Shake off our lethargy, dispel our 'Tamas' and hurl us headlong on the path of Thy Divine Work. Inspire us to 'throw our self overboard' and to proceed to serve suffering humanity, realizing it to be a sacred manifestation of Thy Holy Self. Let us realize that we are the children of Immortality,

that we are no less than holy sparks out of Thy Divine Effulgence. Bless mankind, O Divine Mother, so that it may throw off its mask of brute instincts and manifest the glory of its Divinity through all its aspirations, thoughts and activities.

Om Shantih!

PEACE OR PLEASURE?

[*Vidyarthi, Puja Number 1346*]

The other day I met an old friend, a quondam professor of the City College, bed-ridden for well over two years. He had had a fall from a tree, and this had damaged his spine beyond cure.

We found him prostrate on his bed in a corner of a humble cottage, his own home. The picture all round the premises was that of a typical Bengal village during the rains. A narrow and barely passable road led to the house, which we reached by wading through mud and muck.

But the whilom professor was a perfect contrast to all that we saw about him. There was no gloom, not a trace of any dark shade on his bright countenance. A man doomed to remain an invalid for life, yet giving no sign that he had even a scratch on his little finger!

Indeed, his mind was bubbling with joy. Would you believe it? He talked of other things and other people with extreme interest, as if he had absolutely nothing to say about himself. No complaint, no grievance, no tale of sufferings, no charge against God or humanity for the irreparable break-down of his health and apparent frustration of his life! While answering pointed queries regarding his ailments, he just spoke out a few things, thoroughly unconcerned — in fact, as jovial as ever. He was quite glad to let us know that he could be made to sit up on a chair or on the bed with a supporting cushion behind his back! Yes, he had practically nothing to worry over, nothing to rue. Everything about him was all right!

This is no fiction. A perfectly true picture from life. There was nothing outside that might possibly contribute to the professor's joy. No castle, no title, no purple robe, not a single article of luxury to relieve one's eyes in that dowdy cottage. Combine a tottering financial condition with shattered health and you get all that the professor possesses by way of his assets on the material plane. Yet, if we were to believe our eyes, he was beaming with joy. In a setting of extremely rugged simplicity, at which a sensitive Miss Mayo might instinctively turn up her nose, we found human material that could be called the salt of the earth. A man defying disease, sorrow and death! A man beyond the reach of the slings and arrows of outrageous fortune! A man who knew how to keep himself immersed in happiness in spite of all odds against him! A man certainly to be envied even by kings and dictators!

Yes, here we get a living example of what contentment stands for. Contentment, the dream of poets and philosophers, cannot be had in the market even by emptying the king's treasury, nor can it be wrested by any wantonly aggressive power. Contentment wells up from within. Those who can resign themselves thoroughly to the Divine Will get it in abundance without asking. But such resignation is no easy job. Desires stand in the way.

So long as desires have the whip hand we are kept on the trot along a wrong track. We confuse pleasure with happiness and make a mess of the whole thing. We gamble with life, staking all that we possess on vanity and selfishness. Our pleasure-hunting senses give us no rest. Momentary titillation of nerves and exhilarating spasms of the heart are mistaken for happiness, and our life becomes a mad pursuit after ever-flitting pleasures.

And we very rarely feel at ease. Pain, trouble, worry, disappointment cross our path almost at every step. Moreover, desires multiply and perpetually keep up a racking sense of want. Hope alone comes to our rescue. Absurd dreams of brighter days ahead alone keep us erect. Woe for the man whose hope also fails! For then he finds refuge only in death. Life becomes a miserable failure. A tragedy of errors for man who has the fountain of eternal Bliss within him. The king going about begging for a morsel of rice!

If we want seriously to be happy, we cannot afford to be so keen about our pleasures. Our senses have to be controlled and turned inward. Vanity and selfishness must be reduced to dust. Our desires must be chastened and gradually subdued by the practice of resignation to the Divine Will. This is the road to real joy, happiness, contentment, peace, bliss. There is no mistake about it. The wrong track will lead us nowhere but to pain and perdition.

BEARING OF HINDUISM ON INTERNATIONAL PEACE

[Paper sent to an International Peace Conference in 1932]

Hinduism does hold that there may be occasions for righteous war. So long as human nature is not radically transformed, evil-doers will have to be quelled for the peace and security of human society, and these necessary efforts may at times assume the proportions of even world-wars. A radical transformation of the entire human society is something which the Hindus never expect.

Teachings

Hinduism holds that a soldier fighting for a righteous cause is performing a meritorious act. Moreover, this religion maintains that man can rise to such a stage of spiritual perfection that he can kill people without being touched in the least by sin.

Yet, Hinduism has ideas and ideals that tend primarily to put an end to strifes and discords.

Nature appears to work out her plan of warring varieties even on the human plane. In external nature there seems to be a perpetual process of forging varieties, and in internal nature there is the incessant claim of the ego for superiority, special esteem and privilege on behalf of each variety. Conflicts between individuals as well as between groups become inevitable. Nothing less than faith in the Unity behind nature and a corresponding readjustment of internal nature can be expected to minimize these conflicts.

Hinduism emphasizes the truth of Unity behind the apparent diversities of nature. Nature, consisting both of matter and mind, is only an appearance; the only

reality is God. The real self of man is no other than God, his mind and body are mere forms.

Man suffers and makes others suffer only because, obscured by primal ignorance, he does not recognize his real self and identifies himself with his body and mind, which are mere forms. Hinduism asks man precisely to get rid of this ignorance and realize his essential unity with the rest of creation. This state is what the Hindus call 'Moksha' or liberation from the bonds of nature, and this, in their eyes, is the goal of human life.

In order to attain this goal, one is required to take his stand on the truth of his unity with all and train his mind not to emphasize the superficial diversities of nature. He is required to look upon all as manifestations of God, and love and serve all without any distinction of caste, creed or colour, even as he loves and serves himself.

Thus the path of self-sacrifice and service has been chalked out by Hinduism for every individual. This will work out his own perfection by manifesting his Divine Self and certainly contribute towards the peace and well-being of society. For the sake of being freed from the bonds of nature, for attaining eternal peace and blessedness, the individual has to love and serve others, trying all the while to feel his essential unity in God with all that exist.

Struggle and fight for selfish ends may be a necessity for the evolution of brute life; but the path of human progress right up to the eminence of a Buddha or Jesus lies through renunciation and service. Conscious practice of these can completely reverse the egocentric nature of man and make him perfectly immune from all impulses of envy and hatred. The ideal man, according to Hinduism, is he who sees 'the self in all and all in the self'.

If such a programme for individual life could be adopted on a worldwide scale, universal peace would become a settled fact in a short time. But we consider that to be an empty dream. Mankind cannot be expected to change its nature by a miracle. A few will, of course, struggle for spiritual growth and try to live up to high ideals, but the majority is sure to tread the rut-bound path of self-aggrandizement, fight, coercion and competition. Yet, if within all groups of the human society vigorous efforts be made even by minorities to realize the living Unity behind nature through love and selfless service, something substantial may be attained towards minimizing discords between the different groups.

In the history of Hindu civilization we find several epochs when by the intense efforts of saints and seers these lofty ideals of selflessness and service were made very prominent both in individual and collective life. During these epochs the entire Hindu society gave wonderful demonstrations of concord, harmony, liberality and tolerance. The original Hindu programme of life in all spheres as a graded course of renunciation and service for manifesting the divinity in man would get a fresh lease and sanction during these periods, and the group-mind also would give evidence of a fresh inspiration and broadening of outlook.

Attitude towards others

This explains how the Hindus could receive with open arms the persecuted and refugees of other religions and other nations. The persecuted Israelites and Zoroastrians did find a peaceful shelter on the soil of the Hindus. In its attitude towards other religions, Hinduism has all along been tolerant to a degree. The Hindus believe that all religions lead alike to the same goal, namely,

God, the only Reality, who appears through different names and different forms to different devotees.

Prayers

In the Hindu scriptures one finds abundant mention of the truth of One Existence, and the necessity of realization of the same for individual salvation. Prayers for universal peace and well-being, though not quite so profusely mentioned, have found a place in the Hindu scriptures. A few extracts rendered into English will show the universal character of these prayers:

"May all be happy. May all be free from disease. May all realize what is good. May none be subject to misery."

"May the wicked become virtuous. May the virtuous attain tranquillity. May the tranquil be free from bonds. May the freed make others free."

"May all be free from dangers. May all realize what is good. May all be actuated by noble thoughts. May all rejoice everywhere."

"May good betide all peoples. May the sovereigns rule the earth following the righteous path. May all beings attain to their welfare. May all the world be prosperous and happy."

During the glorious epochs of spiritual revival the chords of the Hindu heart would be made to emit such a sweet note of universal peace and harmony.

But each of these periods of spiritual revival was closely followed by a period of decadence. Owing to the natural gravitation of man towards selfishness and superficialities, the real spirit of religion has at times been almost buried under meaningless non-essentials. People would lose sight of the central truths, misunderstand and misinterpret the sacred texts and foolishly

allow even grossly unspiritual elements to masquerade in the name of religion.

Our organization working in a way for universal peace

Hindu society had been passing through such a phase of decadence, when the life and teachings of Sri Ramakrishna (1836–1886) resuscitated the spirit of Religion, and society has since been showing sure signs of rising from its temporary torpor.

The lofty ideas and ideals of Hinduism have once again become clear in the light of Sri Ramakrishna's wonderful realization of spiritual truths, and it is to preach and practise these that this Ramakrishna Order of monks has been established. We believe that the ideas and ideals of our religion will again be the moving forces of the Hindu society, purge it to a considerable extent of the impurities accumulated during a couple of centuries, and contribute towards invoking universal peace and harmony, for which such a keen anxiety is being felt all round the world.

Our organization is dedicated to working towards this glorious end, in its humble way, through humanitarian service and preaching of the message of the grand living Unity behind the apparent diversities on the surface of creation.

If, through all the groups of mankind, vigorous efforts are made to emphasize the underlying unity more than the apparent multiplicity of nature, and also to urge individual as well as collective life to tread the path of sacrifice and service as the only path of human progress, we believe that some anxiety at least over the future of the human race may be set at rest, and our race may advance a step forward towards all-round peace and happiness. An era of universal peace and well-being, of

universal brotherhood of man, may be a dream, and this dream may perhaps never be realized. But it can never be denied that concerted efforts for realizing such a dream, for bringing about concord and harmony, will go to reduce human sufferings to their minimum; and this itself is quite a significant achievement, for which the best efforts of all lovers of humanity should by all means be concentrated.

SRI RAMAKRISHNA

[*Read over the A.I.R., Calcutta Station, in February 1931*]

Permit me, dear listeners, to speak to you a few words on the significance of Sri Ramakrishna's life on the occasion of his ninety-sixth birthday that came off on Thursday last (Feb. 19). Sri Ramakrishna was born in an out-of-the-way village of Bengal in 1836, and he passed away in 1886, after having lived a life of intense spirituality. In the course of only a few decades his life and teachings have stirred thousands of human hearts in various parts of the earth. Max Muller dwelt on Sri Ramakrishna's wonderful life in order to introduce it to the West, and the renowned French savant, Monsieur Romain Rolland, has recently brought out an elaborate book, in which he has presented Sri Ramakrishna as a modern Avatar, a man-god just like Buddha or Jesus.

As I stand before the radio to speak about the significance of Sri Ramakrishna's life, I feel like putting to you a simple query, namely, 'what is it that has made the radio so very popular?' Well, I believe the answer will come straight from everyone of you that the radio has brought us all closer together and is about to make us feel that we belong to one human family, and this is why the radio is considered to be one of the most blessed gifts of science. Yes, scientists made strenuous efforts to pull down the barrier of space that kept us apart for scores of centuries, and they have at last succeeded in doing away with at least a portion of the barrier so that our voice can now reach the farthest corners of the earth. Undoubtedly this is one of the greatest triumphs of modern science.

Yet this is not all that we want. We want peace. Simply coming closer together physically cannot make us happy. For, if we come closer together and begin to quarrel and break one another's neck, that certainly is not a very happy situation. People would rather choose to live in peace in smaller groups, if that be possible, just as they have been trying to do since creation. But our position is worse. We have no choice left to us. Science has boiled down distance once for all, and humanity has been literally pressed into a compact mass. Now we have no option but to see that we do not draw our swords and fly at one another. For that will make our existence indeed very miserable.

Just as we have pulled down a portion of the barrier that divides us physically, the higher interest of humanity demands urgently that we should spare no pains to remove the barrier that divides us on the mental plane also. Our hearts must be tied up together by bonds of love and fellowship so that we may really feel that we belong to one family. This is precisely what humanity wants at the present moment more seriously than anything else.

All prejudices that stand like so many Chinese walls between castes, creeds and colours have to be blown up so that the hearts of men all over the world may beat in perfect unison. Selfishness in individual and collective life, which is at the root of all dissensions, should not be allowed any further to soil the pages of human history with brothers' blood. We have to banish for ever the materialistic outlook on life that makes us believe that we are born only to eat, drink and be merry and to have no concern with God or humanity. Yes, all that makes us narrow and self-centred must leave the

precincts of human society. The triumphs of science must be followed quickly by a triumph of inner spirit of man in order to herald an era of peace and goodwill.

In support of this idea I think I shall do well to quote a few pointed words from the pen of one of the most popular writers of the day, I mean Mr. H. G. Wells. While concluding his 'Outlines of the History of the World' he makes a strong appeal to mankind for bringing about a world federation. In this connection Mr. Wells writes, "Our true God now is the God of all men. Nationalism as a God must follow the tribal gods to limbo. Our true nationality is mankind . . . Sooner or later that unity must come, or else plainly men must perish by their own inventions . . . To a certain small number of men and women already the attainment of a world peace has become the supreme work in life, has become a religious self-devotion. To a much greater number it has become at least a ruling motive . . . Perhaps, now, most human beings in the world are well disposed towards such efforts . . . Out of the tragedy and the confusion before us there may emerge a moral and intellectual revival, a religious revival, of a simplicity and scope to draw together men of alien races into one common and sustained way of living for the world's service. Religious emotion—stripped of corruption and freed from its last priestly entanglements—may presently blow through life like a great wind, bursting open the shutters of the individual life, and making many things possible and easy that in these present days of exhaustion seem almost too difficult to desire . . . Presently education must become again in intention and spirit religious, and that the impulse to devotion to universal service and to a complete escape from self, which has been the

common underlying force in all the great religions of the last five-and-twenty centuries—an impulse that ebbed so perceptibly during the prosperity, laxity, disillusionment and scepticism of the past seventy or eighty years—will appear again, stripped and plain as the recognized fundamental structural impulse in human society."

So Mr. H. G. Wells has made it very plain that we should for our very existence strive strenuously after inaugurating an era of peace and goodwill by eliminating all that go to divide us mentally. He points out clearly that this happy consummation can be brought about by a great moral and religious revival that may stir up a fresh impulse to devotion, service and self-effacement.

... a gigantic spiritual wave that can sweep off ...ice, doubt and scepticism and bathe human hearts ... nectar of Divine love is what we require most ...tly at this stage of our civilization. And, believe m... this blessed spiritual wave has been set in motion b... the glorious life of Sri Ramakrishna. His life and teachings have the potency of wiping out all invidious distinctions between castes, creeds and colours, and really uniting all races and all nationalities into one human family. If the radio has become so popular by removing the physical distance between us all, how far more attractive is Sri Ramakrishna's life that tends to contribute immensely towards bringing our hearts together?

If you look back upon history you will find that at the top of each wave of spiritual revival there is the life of an intensely spiritual personality like that of Buddha or Jesus. Yet history provides us with records of spiritual revivals whose influence was felt only by sections of

humanity. Now the time has come when the whole of humanity will have to be stirred to its depths, when the underlying force of all the great Religions on earth will have to be brought into play. This is why this time it must be a gigantic tidal wave of spirituality, and on its crest we must find the luminous personality of a prophet whose equal the world has never seen. If you go through Romain Rolland's biography of Sri Ramakrishna, I am sure you will be convinced that Sri Ramakrishna's life is pregnant with the possibilities of stirring up such a tidal wave of spirituality whose influence may be felt by the entire human society.

Sri Ramakrishna, the latest man-god in the history of the spiritual evolution of man, did not stand for any sect or any particular creed like any one of the prophets that had preceded him. His life was verily a parliament of religions. He found out the key to the entire range of spiritual experience of man and discovered a wonderful harmony underlying all religions. To him God was more real than anything else on earth. He could feel God, see God and become one with God. To him God without form was as real as God with form. He fathomed the depths of spiritual consciousness and realized that when everything else vanished, when time, space and causation ceased to exist, the Formless Self remained, and that it was none but the Formless God—the infinite Ocean of Existence, Consciousness and Bliss. Again, this selfsame God would appear before his pure mind in the various forms in which devotees chose to worship Him so long. He took up, one after another, various spiritual practices prescribed by the different branches of Hinduism as also Christianity and Islam, and had the intense satisfaction of experiencing the Truth underlying them

all. Standing on the bed-rock of his own realization, he announced to mankind the happy tidings that God is One, whom different religions have taught men to worship in different names and different forms. He saw clearly that just as water drawn from the same tank is called by various names by different races of men, so the selfsame God is called by different names by different races. His unique spiritual experience established once for all the fact that all paths prescribed by all religions lead alike to the same blessed goal of God-realization.

When humanity is being torn between doubt and scepticism on the one hand and religious fanaticism on the other, it is highly significant that we have before us an intensely spiritual life as broad as the sky and as deep as the ocean. Indeed, within the brief span of fifty years Sri Ramakrishna lived the entire spiritual life of mankind. His spiritual experience comprehends the spiritual experiences of Buddha and Shankara, Chaitanya and Ramanuja, Jesus and Mohammed. The Monistic, qualified Monistic and Dualistic realizations of the Vedic Rishis were all within the sure grasp of this wonderful personality. The lives of all saints and all prophets have literally been lived over again by Sri Ramakrishna. The spiritual experiences of all his illustrious forerunners appear to be so many different threads forming the warp and woof of the splendid texture of Sri Ramakrishna's realization—and on this texture is woven the harmony of all religions.

Sri Ramakrishna is undoubtedly born to throw lustre on all religions so that they may dispel the gloom of doubt and scepticism that has been gathering round human society. He has appeared just in time to revitalize all creeds so that humanity may be saved at this critical

moment of its civilization from the fatal grip of materialism.

Just like any other prophet, Sri Ramakrishna did transmit spirituality to all sincere aspirants that came near him. His life was a blazing fire of spirituality. It gave light and warmth to all sincere seekers who had the blessed chance of meeting him.

A more accurate picture of purity and renunciation the world has never seen. In his early days of intense spiritual practice he renounced wealth as an obstacle in the path of God-realization, and so strong and one-pointed was his will that to the end of his life his nerves would be shocked even by an unconscious touch of a coin. So phenomenal was the purity of his mind that his nervous system, like an extremely delicate instrument, would record by an excruciating pain the touch of an impure man. Though married in his youth, he literally lived a life of absolute sexlessness. His wife stayed with him and served him as a disciple till the last days of his life, and received from him in return the worship of a devotee, combined with the care and attention of a spiritual preceptor. Indeed, each phase of Sri Ramakrishna's life is a fresh chapter of revelation of the depth and potency of human mind!

Lastly, his love for man was as phenomenal as his purity and love for God. He could never breathe a curse or condemnation. The slightest consideration of self or the faintest impulse of vanity or hatred never disturbed the surging flow of his Divine love. To him the talk of human mercy appeared to proceed from human vanity. He realized man as a manifestation of God and asked all to serve man with love and reverence. He saw Divine presence even in a public woman, and

thus it was absurd for him to hate anyone. He loved all, prayed for all, and showered his blessings upon all. No sex, no colour, no creed, no way of life could raise the lightest barrier between him and any other man on earth.

On the occasion of the ninety-sixth birthday of this God-man, who came undoubtedly to quicken the spiritual pulse of humanity and unite us all by a tie of love and fraternity, the monks of the Ramakrishna Mission of Belur send their message of peace and goodwill, concord and harmony, to all men and women irrespective of caste, creed, colour or community. Let us all turn to God and pray that He may inspire us to manifest the Divinity within us and dedicate ourselves to the service of humanity. Let brute instincts of man cease for ever to disturb human society, and let us all meet in love and peace to erect the magnificent edifice of universal Religion and universal Brotherhood, of which the foundation-stone has been laid by the blessed life and teachings of Sri Ramakrishna.

SWAMI VIVEKANANDA ON INDIA AND HER MISSION

[*Prabuddha Bharata, Golden Jubilee Number 1945*]

India is an unhappy country. Circumstances appear to have conspired to keep her down. Political servitude, economic depression, communal dissensions, social iniquities, and cultural anarchy have made her people miserable. The depth of their misery and humiliation is appalling. In this setting, even the good things they have inherited from the past get easily misinterpreted and undervalued. Their social customs are branded as downright barbarism, and their religious beliefs as rank superstition. Even their complexion appears to be a serious drawback. As a matter of fact they have to live almost like pariahs ('untouchables') in the society of the dominant peoples of the world.

Yet, nearly fifty years back, Swami Vivekananda came forward to inspire his countrymen with hope, faith, and courage by making them conscious of their potential strength and glory. He asked them not to look at themselves through borrowed spectacles and pointed out the errors of judgement made by many foreigners regarding the real worth of their culture. He stood almost like a living challenge from Mother India and presented the other side of the shield, showing unmistakably that India had an eminence of her own and a unique mission to fulfil for the progress of mankind.

The Swami took his reading from an entirely different stand. He did not, like others, measure India's strength in terms of material well-being. He looked deep beneath the surface of things. To him India was not a mere

geographical nor a political entity. He discovered that she was and would continue to be the spiritual nursery of the world. Underneath the tormented life of political turmoil and material wants, of cultural chaos and ideological confusion, he detected a steady undercurrent of spirituality that might again develop into a tidal wave and sweep over the world as it had done in the wake of Buddha's life.

This was why he exhorted his countrymen to be proud of their cultural heritage and to stand by it instead of feeling small for their material backwardness. To foreigners he presented the following facts. India is not inhabited by savages who have to be reclaimed in the light of any imported civilization. Rather, it is a fact that India has a history and a culture almost unparalleled in the world. Her history is to be reviewed not by decades or centuries, but by millenniums. Even Buddha, who was only a 'rebel child' of the ancient Vedic Faith, was six centuries ahead of Christ. Indeed, Indian culture has been traced to an age when the ancestors of the modern nations had hardly emerged as civilized men.

Even in such a hoary past, the Swami pointed out, India had her Vedas holding out some of the loftiest and subtlest metaphysical truths, such as 'One alone exists, sages call It by various names'[1], 'All this (universe) was pure Existence at the beginning'[2], 'The self is none other than the Absolute'[3]. Such a penetrating vision of the fundamental unity of the universe, which science and philosophy have not yet been able to grasp and towards which these may be said to be surely and steadily conver-

[1] cf. Rigveda, I. 164. 46.
[2] cf. Chhand. UP., VI. 2. 1.
[3] cf. Brih. UP., II. 5. 19.

ging, is the very hallmark of the Vedic literature that had its origin some thousands of years before the birth of the modern nations. Such a hoary history, such a glorious record of cultural achievement, India has to her credit.

The Swami went further to explain that Indian culture was not only the oldest on earth but also the most precious asset of mankind. Even when his own countrymen, lured by alien ideas and ideals, started condemning everything Indian as something uncouth, and rushed to change their skin by adopting exotic manners, customs, tastes, and fancies—even at this hour of complete blackout of the cultural self-consciousness of the so-called educated Indians,—Swami Vivekananda had the boldness to hold up Indian culture as a priceless heritage of which India might very well be proud. India may be materially poor, but she is spiritually rich. Her worth is to be assessed not by the standards of material wealth and brute power but by those of spiritual eminence. Thus tested, her position is unassailable.

As a matter of fact all through the ages, particularly during the different epochs of her spiritual resurgence, lofty ideas and ideals, together with her precious contributions to fine arts, and positive sciences,[4] spread far and wide beyond her borders and gave a cultural lift to the peoples of various lands. India may very well be said to have been the mother of civilization in the East; and the growth of civilization in the West as well owes much to her contributions through Palestine, Greece, Egypt, and Arabia. Even now she has something substantial to offer towards the progress of human civilization, and this in spite of her abject material condition.

[4] Vide. Dr. P. C. Ray's 'Hindu Chemistry', Vol. I.—Introduction and Dr. R.C. Majumdar's 'Hindu Colonies in the Far East'.

Being convinced of this, the Swami cried halt to his countrymen in their cultural march towards the West. He warned them, moreover, of the disastrous consequence of cultural alienation. He drew their pointed attention to the fact that their very life-centre lay in their age-old unique culture characterized by a thoroughly spiritual outlook. Spirituality was precisely their forte. It had been the channel through which their national energy had been flowing for scores of centuries. If they now wanted to change the course of their cultural life, the result would be the total extinction of their race. And if they followed it, they would become revitalized and nothing would be able to resist their progress in any direction.

The Upanishadic sages mentioned two distinct cultural ideals, namely, the 'eternally good' (*shreyas*) and the 'temporarily pleasing' (*preyas*). The first ideal, namely, *shreyas*, inspires man to curb his ego, restrain his brute impulses, and manifest the divinity within him. It prescribes the gradual transformation of the brute-in-man into God-in-man. The second ideal, *preyas*, on the other hand, is egocentric; it prods man to remain a brute, with all its greed, lust, and ferocity, whose only business is to cater for selfish ends, to propitiate the lower self.

Man has two 'self's, as it were. Of these, one is real, and the other apparent. The real self of man is none other than the philosopher's Absolute. It is God Impersonal. He who realizes this self finds himself in all beings and every being in himself.[5] He loves all beings as his very self. He cannot hate or hurt anyone. Eternal peace dwells in his heart. His thoughts and feelings are broad

[5] cf. Gita, VI. 29.

ging, is the very hallmark of the Vedic literature that had its origin some thousands of years before the birth of the modern nations. Such a hoary history, such a glorious record of cultural achievement, India has to her credit.

The Swami went further to explain that Indian culture was not only the oldest on earth but also the most precious asset of mankind. Even when his own countrymen, lured by alien ideas and ideals, started condemning everything Indian as something uncouth, and rushed to change their skin by adopting exotic manners, customs, tastes, and fancies—even at this hour of complete blackout of the cultural self-consciousness of the so-called educated Indians,—Swami Vivekananda had the boldness to hold up Indian culture as a priceless heritage of which India might very well be proud. India may be materially poor, but she is spiritually rich. Her worth is to be assessed not by the standards of material wealth and brute power but by those of spiritual eminence. Thus tested, her position is unassailable.

As a matter of fact all through the ages, particularly during the different epochs of her spiritual resurgence, lofty ideas and ideals, together with her precious contributions to fine arts, and positive sciences,[4] spread far and wide beyond her borders and gave a cultural lift to the peoples of various lands. India may very well be said to have been the mother of civilization in the East; and the growth of civilization in the West as well owes much to her contributions through Palestine, Greece, Egypt, and Arabia. Even now she has something substantial to offer towards the progress of human civilization, and this in spite of her abject material condition.

[4] Vide. Dr. P. C. Ray's 'Hindu Chemistry', Vol. I.—Introduction and Dr. R.C. Majumdar's 'Hindu Colonies in the Far East'.

Being convinced of this, the Swami cried halt to his countrymen in their cultural march towards the West. He warned them, moreover, of the disastrous consequence of cultural alienation. He drew their pointed attention to the fact that their very life-centre lay in their age-old unique culture characterized by a thoroughly spiritual outlook. Spirituality was precisely their forte. It had been the channel through which their national energy had been flowing for scores of centuries. If they now wanted to change the course of their cultural life, the result would be the total extinction of their race. And if they followed it, they would become revitalized and nothing would be able to resist their progress in any direction.

The Upanishadic sages mentioned two distinct cultural ideals, namely, the 'eternally good' (*shreyas*) and the 'temporarily pleasing' (*preyas*). The first ideal, namely, *shreyas*, inspires man to curb his ego, restrain his brute impulses, and manifest the divinity within him. It prescribes the gradual transformation of the brute-in-man into God-in-man. The second ideal, *preyas*, on the other hand, is egocentric; it prods man to remain a brute, with all its greed, lust, and ferocity, whose only business is to cater for selfish ends, to propitiate the lower self.

Man has two 'self's, as it were. Of these, one is real, and the other apparent. The real self of man is none other than the philosopher's Absolute. It is God Impersonal. He who realizes this self finds himself in all beings and every being in himself.[5] He loves all beings as his very self. He cannot hate or hurt anyone. Eternal peace dwells in his heart. His thoughts and feelings are broad

[5] cf. Gita, VI. 29.

as the sky, deep as the ocean, and pure as the crystal. Far beyond the reach of envy or pride, doubt, misery, or fear, he lives like a pole-star for guiding humanity towards peace and blessedness. Love and compassion remain to be the only motive force of all his acts. The prophets, seers, and saints of the world are luminous instances of men having a clear vision of their real self. The paths pointed out by them are intrinsically the same, namely, the path of eternal good or blessedness (*shreyas*).

Man, however, is so constituted that ordinarily he is not aware of his essential divinity. He does not know that he exists eternally as pure spirit, as God Impersonal. He mistakes the body, the mind, and the senses as parts of his being. So, instead of feeling his essential unity with everything, he stands out as a separate entity and finds himself at war with the rest of the universe that appears to crush him out of existence. His illusory ego wants to dominate the world, ransack and grab it for its sensual enjoyment. He runs after the *preyas* ideal. But so long as he, in his ignorance, pursues this ideal, he does not find happiness, and brings untold miseries to others.

Now, emphasis on these two distinct ideals, 'eternally good' and 'temporarily pleasing', has given rise to two different types of civilization, which may be characterized as divine (Daiva) and monstrous (Asurika), respectively. In Hindu mythology one finds stories of clashes between the upholders of the two distinct ideals. The followers of the monstrous type of civilization were variously called Asura, Daitya, Danava or Rakshasa. They developed mighty power but directed it towards exploitation, self-aggrandizement, and sensual enjoyment. They cared only for their own immediate material well-being and not a whit for their spiritual progress. Casting all

ethical principles of self-restraint to the wind, they would scare the followers of the *shreyas* ideal by their heartless tyranny and terrific orgies. But soon a great leader of the divine group, like Rama or Krishna, would come forward to smash the gigantic power of the monstrous group and restore the peace and spiritual well-being of the people.

This is the lesson of Hindu mythology, and it points unmistakably to the fact that, in the days of yore, India went in for the *shreyas* ideal and built the entire structure of her civilization on this ideal. Even as far back as the Vedic age, India discovered that the *shreyas* ideal alone could bring peace unto mankind, and stressed the need of faith, purity, selflessness, love, charity, and unity for rearing up a healthy and progressive society. The idea behind the social structure laid by them was to help each individual to advance spiritually from where he stood. To the builders of this society, the sages, human life meant a march towards perfection, towards the complete manifestation of the divinity within. Their idea of a healthy society was an organization that would help each individual according to its capacity in its spiritual march. The ideas and ideals of the Indian civilization are still there. They are eternal. Beneath the crudities that crept into the Indian society during periods of spiritual decadence, Swami Vivekananda discerned lofty spiritual ideas and ideals as the very basis of its structure. The Indians have to bring them out on the surface as well, when all that is crude, heartless, and weakening will disappear and they will become as healthy, virile, and vigorous as in the heyday of India's glory.

The modern dominant nations, on the other hand, appear to be pursuing the *preyas* ideal. Their outlook is

materialistic, though most of them may sometimes swear by religion. In the course of the last three centuries in the materially advanced countries religion has been relegated to the background, and there it remains not as a living force for moulding spiritual lives, but rather as an effete institution of crude dogmas and rituals that have very little appeal to the modern mind, and this again is used more or less like a 'Sunday Cloak'. Among many the mention of God or anything supermundane appears to have become almost a taboo, except, of course, by way of swearing. The immediate material well-being of their nationals is their sole concern and for this they are out for grabbing more wealth and more power. The politicians at the helm of the states seem to be loyal more to Machiavelli than to any code of ethical or spiritual laws. Their end is to safeguard and expand the material interest of their nations, and any means, however low, that may serve this purpose is welcome. All sorts of dirty jobs become sanctified in the name of national interest. Spirituality is bartered openly for a mess of pottage. Men sink to the brute level and start revelling in fratricide and vandalism. The earth groans in agony.

The choice of the *preyas* ideal is at the root of this evil. The pursuit of material prosperity at the cost of spiritual well-being can lead the human race only to its extinction. The craze for the moment all over the world is to race recklessly through this suicidal course. 'Survival of the fittest' is their slogan. But this is a law of the jungle. Only brutes evolve according to this law. On the human plane it may produce at best gigantic brute-men, monstrous supermen who cannot but jeopardize the peace and security of mankind. The modern dominant nations are on the wrong track. They have raised, no doubt,

splendid structures, but alas! all on the loose sand of the *preyas* ideal. Swami Vivekananda felt that the entire civilization of the West at the moment was on the top of a volcano which might brust any moment and reduce to ashes the fruits of their age-old labour. He warned them that if their civilization were not thoroughly overhauled and placed securely on spiritual ideas and ideals, the entire structure would come down with a crash like a tower on sand. One devastating world war coming at the heels of another is, perhaps, a pointer to the stern truth of the Swami's reading. Who knows?

Indeed the *preyas* ideal can give rise only to the Asurika (monstrous) type of civilization. Its upholders are dominated by the greed and ferocity of brutes, only magnified and organized, maybe a bit refined on the exterior, and even sanctified by a diabolical twist. So long as this ideal is not replaced by the *shreyas* one, there cannot be any peace, individual, national, or international, and the votaries of the Asurika type of civilization, if not edified in time, run the risk of disappearing altogether like the ancient Romans, Greeks, Egyptians, Babylonians, and Assyrians.

This is the calamity towards which the modern dominant nations are forging ahead, dragging the entire world with them. This has to be averted. Humanity has to be rescued from the fatal grip of materialism.

Herein lies precisely the mission of India. She has to hold aloft her banner of the *shreyas* ideal instead of yielding to the world-wide craze for gaining material ends at the cost of spiritual well-being. She has to preach both by precept and example how the pursuit of this ideal can give birth to a superior type of civilization. She has to demonstrate the benign glory that comes in its wake.

Men cannot become good by Acts of Parliament, nor by force of any kind. And till men become good, at least the leading ones, there cannot be peace on earth. Only if they are helped to grow spiritually towards perfection, peace on earth may be secured. For the very existence of mankind, therefore, the spiritual well-being of the people should become the foremost concern of every nation. The law of the 'survival of the fittest' has to be replaced on the human plane by that of self-sacrifice and service. It was to this that the great spiritual personages of the world pointed by their hallowed lives and teachings. Buddha offered his head for saving the life a goat. Christ on the cross prayed for the pardon of his ignorant assassins. It is by such complete effacement of the lower self that man can become divine. The path of self-sacrifice and service leads to this goal. This undoubtedly is the correct path of human progress. The spiritual teachers of the world, all prophets, seers, and saints, are the infallible guides on this road.

Religion consists in following the footprints of the great spiritual Masters and not merely in subscribing to a set of dogmas. Rama and Krishna, Buddha and Christ, Lao Tzu and Shankara, Mohammed and Chaitanya, Nanak and Ramanuja, and such others are the luminous models after which men have to fashion their lives; and all organizations, political, economic, or social, must aim at giving maximum scope to individuals for doing this. Every other interest of human life has to be subordinated to the supreme demand for spiritual progress. The great religions of the world have to be reinstalled in their glory. Purged of crudities imported by spiritually blind priests and preachers, they must again play the role of mighty purifiers of the human race.

India has her Vedanta that contains the rationale of all religions. The fundamental spiritual ideas and ideals held out by the Vedanta can breathe fresh life into all religions. The watchwords of the Vedanta, namely, the essential divinity of man and oneness of the universe in spirit, are the secure planks on which all religions may take their stand and shake hands with one another, banishing for ever all narrow and fanatic, sectarian and communal ideas that have been darkening the pages of human history through the ages. These Vedantic truths explain how the selfsame God is pointed at by all the religions of the world. The same Universal Spirit, the philosopher's Ultimate Reality, is presented in different garbs by different religions. And He is within man as the essence of his being, as his higher self. Man has to bring out his essential divinity and become perfect in all his bearings. This is the goal towards which, consciously or unconsciously, he is moving. Nothing less than that will ever be able to give him that peace and happiness for which he has been breathlessly yearning and struggling all through his life. This is the blessed goal towards which the human race has to bend its steps.

Science and rational philosophy are all right so far as they go. But they cannot take us to the deeper and central truths. They leave us almost at the outskirts of the universe, within the bounds of the intellect, within the domain of time, space, and causation. Absolute Reality lies beyond all these, and It can be realized as one's very soul and as the soul of the universe. It is through the intuition of a pure heart that such realization can be achieved. This intuition is just another faculty of man, which, developed by necessary training, can

lead him, step by step, towards the realization of the great transcendent truths. The training consists in the purification of the heart by gradual self-effacement. 'Blessed are the pure in heart for they shall see God,' said Christ. And this is no diplomat's hoax, it is the utterance of a simple truth by a seer. It is the statement of a spiritual law. A pure heart develops intuition and through that one realizes God, the Ultimate Reality, and attains thereby eternal peace and blessedness. Besides the Hindus, the followers of Buddha and Lao Tzu as well as the Sufi saints and the Christian mystics believed in this. This faith has to be revived and humanity has to be led on to rely more on pure intuition than on mere intellect for its further evolution on correct lines.

All the religions on earth teach us in detail how we may purify our hearts and approach divinity. If there is anything in them that does not help us cleanse our hearts, broaden our outlook, make us humble and selfless, and instil universal love in us, that has nothing to do with religion, and that may very well be abjured without any loss to anybody. Thus purged of non-essential crudities, the religions have to stand on the fundamental spiritual truths and exert their benign influence all over the world for lifting up mankind from the brute plane.

India has to lead the way. Even her masses have an unshakable faith in things spiritual. She has not yet been led astray from the ancient track by the siren calls of materialism. She has the potency of extricating the soul-stirring spiritual ideas and ideals from the mass of crudities that has accumulated round her religions through centuries of spiritual inanition and of dynamizing with them her entire national life. When this is done

India will stand rejuvenated and her unique civilization, illumined by the *shreyas* ideal, will serve over again as a beacon-light showing the correct path of human progress.

Indians have to do something more than what was possible in their past. On the secure basis of spirituality they have to erect an entirely new structure suited to the requirements of the modern age. They have to utilize every bit of material knowledge that modern science has discovered, they have to utilize the power of organization and resourcefulness of the West, and on the solid rock of spiritual ideas and ideals they have to build a magnificent civilization, evolving new economics, new sociology, and new politics. Into the *shreyas* ideal of the East the really good and useful elements of Western civilization have to be fitted as far as that is possible. This will go, as Swami Vivekananda predicted, to stir up a mighty spiritual renaissance all over the earth, rescuing humanity from the spells of the *preyas* ideal that would otherwise inevitably lead to its extinction. It is to fulfil such a great mission that India has been living through millenniums.

This is how Swami Vivekananda has made his countrymen conscious of the epoch-making achievements of their past, the potential strength of their present and the glorious mission of their future. In fact he laid a grave responsibility on the shoulders of every blessed child of this land. They have to fall in line and march under the glorious banner of the *shreyas* ideal. This will bring every thing in its train, even material prosperity so far as it may be had without depriving and injuring others. And this will go a long way towards ushering in an era of peace and concord, harmony and co-operation all over the earth.

THE SPIRITUAL ELEMENT IN OUR EDUCATIONAL OBJECTIVE

[*Shiksha* (*U.P.*), *April 1949*]

We have just been released from political bondage. We have yet to go a long way before we may come to our own. Momentous social and economic readjustments have to be made before we may securely stand on our feet and keep pace with the advanced nations of the modern world, so far as our material progress is concerned. While doing this, are we to radically transform ourselves after the patterns of these nations or to evolve a pattern of our own suited to our genius, temperament and traditional culture? This is a very serious problem which has to be solved once for all, without any shade of doubt or ambiguity, before the entire objective of our education may be fixed.

We cannot possibly change our skin altogether without jeopardizing our very existence as a distinct and useful unit of the human society. In the course of his recent message to the Andhra University Sri Aurobindo wrote, "There are deeper issues for India herself, since by following certain tempting directions she may conceivably become a nation like many others evolving an opulent industry and commerce, a powerful organization of social and political life, an immense military strength, practising power-politics with a high degree of success, guarding and extending zealously her gains and her interests, dominating even a large part of the world, but in this apparently magnificent progression forfeiting her Swadharma, losing her soul. Then ancient India and her spirit might disappear altogether and we would

have only one more nation like the others and that would be a real gain neither to the world nor to us . . . It would be a tragic irony of fate if India were to throw away her spiritual heritage at the very moment when in the rest of the world there is more and more a turning towards her for spiritual help and a saving Light."

Peace-loving people all over the world are now looking out for something substantial that may successfully arrest the present ominous march of events. Roger Babson, the noted economist who foresaw the crash of the stock market in October, 1929, has recently predicted that another depression and probably another war are on the way. While doing this, he said, "Depression's inevitable: war isn't—but it surely will come unless the nations can develop a world government with authority to regulate such things as tariff and immigration—until the world's businessmen stop worrying about profits, the working men about their wages, and the politicians about votes." "In other words," he said, "a spiritual awakening is the only solution of the problem." Mr. Babson seems to have hit the right nail on the head. For, no surer remedy can be found for the present precarious state of things all over the world than what he has suggested.

This was precisely what Swami Vivekananda had the keenness to foresee in the late nineties of the last century. He felt the paramount need of a spiritual awakening of the people of the world for ushering in an era of peace and concord, even for preserving the very existence of the human race. As a matter of fact, he said in the course of a speech delivered in London that the Western world, in spite of its epoch-making material progress, appeared to him to be sitting on the top of a volcano that might

burst any moment and destroy it, unless it cared to readjust itself on a firm spiritual basis.

Since the Swami's warning, one world war has followed another in quick succession, and signs are not lacking to portend still another in the near future. What can stop this suicidal course of mankind? What can avert the approaching crisis in the history of human civilization? Nothing less than a spiritual reawakening of the human race can possibly do it, as the Swami would have us believe.

On the face of it, this appears to be a tall demand. Yet it is not an impossible one. Perhaps, it is the inevitable step ahead in the course of human evolution. Obviously, as long as the nations of the world will not be able to shake themselves off from the fatal grip of greed, jealousy and hypocrisy, peace and security cannot but remain a far cry. Humanity has to grow wiser, otherwise it is doomed to become extinct. The sovereign, and perhaps the only remedy, namely, spiritual reawakening, has to be tried in right earnest, if humanity is to continue its existence.

This is a very stiff job no doubt, yet Swami Vivekananda wanted us to believe that it was quite a feasible one. In India he discovered a mighty spiritual potential, and he believed intensely that when this would be released India would become vitalized, and like an awakened leviathan, she would be able to work wonders by resuscitating the spiritual consciousness of the world outside. By waking up her dormant spiritual energy she was to rescue human civilization from the impending crash, this was what the Swami visualized. And this, according to him, is precisely the mission for fulfilling which she has been living through scores of centuries with her ancient cultural heritage intact. To ensure

substantial amity among the various peoples of the world, to rear up a real brotherhood of nations, is her sacred task, and this it will be possible for her to perform only through a spiritual reawakening of her national life.

Moreover, India cannot afford to cut herself away from her age-old cultural moorings. That, according to Swami Vivekananda, will spell her death. Spirituality is the very life-centre of her people. She has been trained through the ages to sacrifice everything for spiritual ends. Renunciation and service are the channels through which her national energy has been flowing through centuries. Even now, a selfless life dedicated to disinterested service of mankind is honoured in this land more than any of the earthly dignitaries. This was why Mahatma Gandhi could easily become the idol of our people, though to a typical, sophisticated Westerner he might appear as nothing more than a 'half-naked fakir'. This shows the bent of our mass mind created by persistent training through millenniums.

In our ancient Gurukul system spiritual and secular education went together. In the Mundaka Upanishad one finds: 'Dve Vidye Veditavye Para Chaivaparacha'. 'Para Vidya' stands for spiritual education, and 'Apara Vidya' for secular education. Such a combination should even now be revived as the central feature of any healthy programme of education in this land.

'Para Vidya' really means knowledge of the Self. This knowledge alone dispels all ignorance, all weakness, and manifests the Divinity within man. This is the highest goal to be reached. Then alone perfection is attained. "Education is," as the Swami pointed out, "the manifestation of the perfection already in man." Hence, 'Para

Vidya' is an indispensable factor of any process of real education.

Of course, it is not up to anyone and everyone to reach this goal. Yet this blessed ideal should not be lost sight of. Everyone should be taught to value it as the highest ideal of man and inspired to advance towards it as far as possible. It is a priceless legacy handed down to us through scores of generations by the sages of old, and we cannot afford to throw it away only because the Western countries are not in a mood to appreciate its value. Such a spiritual ideal set before our people is sure to qualify them to function as the standard-bearers of universal peace and harmony and thereby to fulfil the sacred mission of this land.

Let us take a more concrete view of the thing. Mahatma Gandhi was a chip of the old block. He followed in the footprints of our old spiritual giants like Buddha and Shankara, Ramanuja and Chaitanya. In this age of doubt and sophistry, his life is a blazing record of what may be achieved by pursuing the spiritual ideal in the midst of intense activity on the material plane. Let not his life be looked upon as a mere freak of nature, as an accidental aberration from what is normal. In his autobiography he has clearly shown how all that he achieved was the result of a determined effort for moulding his life according to the pattern left by the spiritual masters of old. In other words, he re-educated himself in the ancient school, supplementing 'Apara Vidya' by 'Para Vidya'. And by this process, he grew up to the stature of a superman of the correct type, namely, the 'Deva' type, as opposed to the 'Asurika' type represented by Hitler or Napoleon.

May we not take a leaf out of the Mahatma's book?

His life may very well serve as an exemplar? People may hold different opinions regarding the details of his creed; yet none can deny that his life was pitched very high in the spiritual plane as an admirable synthesis of work and worship, that he was a householder and a Sannyasin rolled into one, a Karma-yogin dedicated to the service of humanity. May not our educational programme be so chalked out as may give the necessary incentive to our people for emulating this blessed life? That perhaps will be his fittest memorial. For this will ensure the continuity of the lofty ideal he stood for and died for. Such a programme will fit in with the genius of our people, touch the inmost chord of their heart and wake up their latent spiritual potentialities. The Mahatma's devotion to God, country and humanity, his spirit of tolerance, sacrifice and service, his unwavering regard for truth, purity and self-control have to be stamped upon the national mind. At this critical moment of the world's history, he has shown the path India should tread for the peace and well-being of the entire human race.

Particularly, when we are about to broadcast education among our masses, we should take special care to see that they may not lose their grip on their age-old spiritual ideas and ideals. By no means should they be made to swallow any type of Godless education. That will spell disaster. The individuality of our people lies in their characteristic culture based on some lofty spiritual ideas and ideals. If they lose this individuality, they run the risk of becoming extinct.

Hence, our educational programme should be so planned that it may enable our people to remain loyal to their spiritual ideals and at the same time to master

all that is necessary for making them intensely practical like the materially advanced nations of the modern era. They have to be eqipped for the dual task of ensuring their material progress as well as of demonstrating effectively before the world the supreme worth of their spiritual heritage in securing peace and harmony among the various nations. Love of God, country and humanity, sympathy, tolerance, impeccable honesty, and uncompromising regard for truth have to be combined in their character with the dynamism of the Western countries. Our education should be 'essentially man-making, character-building assimilation of ideas', as Swami Vivekananda put it. And through education our national character has to be built upon the best elements of Eastern and Western culture. Retaining all that is precious in our own spirituality-centred civilization, we have to glean from the West whatever will be found to be valuable and congenial. In this way we have to turn out a new type of manhood, vigorous yet calm, mighty yet tolerant and sympathetic, idealistic yet practical to the backbone. Such a blending of the East and the West, of 'Sattva' with 'Rajas', self-poise with dynamism, is what is needed for an epoch-making resurgence of our national life at this critical hour. of human history. Swami Vivekananda's stirring appeal to us all as well as Mahatma Gandhi's significant life point unerringly towards such an objective of our nation-building plan. It will be a terrible mistake if we do not heed these pointers and shape our educational programme accordingly.

HINDU WOMEN'S PATH AHEAD

[*Written to enlarge on an earlier book-review by himself in the 'Modern Review', January 1938*]

Although it is becoming a fashion in certain quarters to cavil at Hindu society, there are many, even among foreigners, who do not see eye to eye with the 'mischief-mongering Mayos and Southgates'. Aline Masters's article on 'Hindu Women' published in the Modern Review for December, 1937 is to the point. She is clear, precise and emphatic in her appreciation of the soundness of the basic structure of Hindu society. She asks all to be very cautious before passing any verdict on the Hindus "whose social system is the magnificent outcome of centuries of thought and experience". Perhaps she has hit the right nail on the head.

Indeed, so far as the fundamentals of their social system are concerned, the Hindus stand on solid ground, and they can very well afford to ignore the senseless flings of short-sighted or perverse critics. But regarding the superstructure they have no reason to be self-complacent. Even a sympathetic onlooker like Aline Masters had to observe, "The passage of time has wrought an unwholesome change in the system". To ignore this issue is to wink at facts. Well-wishers of Hindu society, since the days of the great Raja Ram Mohan, have been laying their fingers on the various abuses that have crept into the system in course of the 'passage of time'. Poets, novelists, journalists and preachers have been dilating upon this theme for well over a century. Hindu society by this time should be well aware of the fact that its superstructure requires overhauling and that very urgently.

Obviously, this overhauling does not mean pulling down the entire structure. The basic structure is quite sound; the fundamentals require no tampering. Rather, one should note the remarkable fact that it is exactly where Hindu society has slackened its grip on the fundamentals, that it has let in abuses. Aline Masters appears to be perfectly right in concluding, "Abuses have crept in chiefly through failure to grasp the fundamentals." This genesis of the current abuses of sound and age-old fundamentals gives a clue to the path of the needed reform. A clear grasp of the lofty ideas and ideals underlying the Hindu social system is what is required for the necessary overhauling of the superstructure.

Some of the very serious and pressing problems of the modern Hindu society may be ascribed to its 'failure to grasp' one of these fundamentals, namely, the principle of chastity. The solution of these pressing problems requires, therefore, a bold and careful scrutiny of this fundamental principle together with its modern application. And this may be expected to throw some light on the path along which Hindu women should advance.

The ancient builders of Hindu society were firm in their conviction that chastity was the very life-force of a society, that on it depended, to a considerable extent, the potency, happiness and general well-being of social life. This was why they made chastity the very corner-stone of the Hindu social structure. And surely the ancients made no Himalayan blunder. Self-restraint is the sine qua non of human progress. The history of the cultural advance of humanity is nothing but a record of the gradual chastening of the human heart through the progressive realization of the blessings of self-restraint.

Chastity is nothing but self-restraint in sex life, and as such it is undoubtedly a sound achievement of the human being on the path of his evolution on the mental plane. Moreover, it has been found, through centuries of experiment, to be a safe guarantor of domestic bliss and social equilibrium. Unless Hindu society at the present moment wants seriously to climb down to the brute plane, it has no reason to eschew this fundamental principle and follow the siren call of Bertrand Russell and his camp-followers.

The fundamental principle of chastity is quite sound. But regarding its application one should note very carefully the obvious fact that the undoubted blessings of chastity may be enjoyed only by that society where it is preserved by both the sexes. Any inequality in this respect is bound to upset the social order. Rigorous self-discipline in sex life is sure to become quite a normal thing when both the sexes take it up with equal zest for the supreme necessity of preserving the essential potency of social life. But when this discipline is thrust upon only one of the sexes, it is bound to be resented by that sex as an undesirable pressure. Thus the precious discipline of chastity, owing to its one-sided application, has every chance of being looked upon by mistake as a social iniquity. A natural revolt against this apparent iniquity may end in throwing overboard the fundamental principle of chastity itself. This means stepping back to the brute plane where chastity is nobody's concern. The instinctive desire for equality is sure to demand that the discipline of chastity must be undergone by both the sexes or by none. Of these two alternatives, the second demand is dangerous, inasmuch as it leads to the cultural suicide of society. And the middle course, namely, the

application of self-restraint to one of the sexes is unstable, and has every chance of gravitating towards the brute plane through the easier realization of the second alternative.

The present-day Hindu society seems to be following heedlessly this risky and unstable middle course. The rigours of self-restraint appear to be the sole concern of women. The ideal of the chastity of Hindu women, stretched to an amazing degree of fineness and exactitude, contrasts conspicuously with the long rope allowed to the masculine wing. While society is indifferent to the libertinism of men, it is vigilant enough to scourge with unfailing precision even helpless female victims of male passion. Fancy an innocent girl supposed to be condemned for life by the touch of a ruffian. The society that could not give her the necessary protection asserts its right of punishing her for something for which she was not in the least responsible. She is lost for ever. Her own parents have to disown her. They have perforce to slaughter their humane instincts on the altar of social rigour and shut their door on her face. There is no shelter for her anywhere within Hindu society. She is compelled by circumstances beyond her control to seek refuge in death, physical or moral. What is more shocking is the fact that when she is forced to lead a life of shame, society does not stand in her way. Is this not conniving at the wickedness of the male section? Inequality in the application of the principle of chastity can perhaps go no farther.

This is clearly a travesty of the original ideal. This one-sided imposition of the rigours of chastity, proceeding obviously from the selfishness of the power-holding male section, is a monstrous perversion of the fundamental

idea. As such it is bound to give rise to a tremendous reaction and upset the social order as soon as the repressed wing will find strength to assert itself. With the spread of education and consequent dawning of self-consciousness, signs are not wanting to show that Hindu women are becoming keen to alter this state of things. The enlightened section is already out with the advanced wing of the women of the world to achieve equality and liberty in its relations with men. They are bent upon wiping off the invidious distinction obtaining between the two sexes. Indeed, equality and liberty are the demands of this age in every sphere of human life, and these can hardly be ignored any longer. The voice of Hindu women claiming equality with men is a natural social phenomenon of this age and cannot be stifled. It is destined to grow in volume and intensity till something substantial is done for reshuffling the inequitable social plan.

Equality has to be achieved. Tyranny and repression have to go. There is no mistake about it. But what will be the exact form of equality between the sexes so far as the principle of chastity is concerned? That is the question of all questions. One shudders to think what the consequences will be if, by mistake, the vanguard of feminine liberty looks upon the licence of characterless men as a privilege to be won by their struggle for equality. One hasty step may turn the women's laudable movement for equality and liberty into an ignominious race for lining up with the male libertines.

This will be courting disaster. Equality achieved at the cost of chastity will be no solution of the social problem. It is bound to lead the entire society through a welter of loose morals to ultimate extinction. Chastity and equality

have to go together. Indeed, if Hindu society is to be kept intact, if its health and longevity are things to be cared for, Hindu women must not forget for a moment their age-old mission of preserving the spiritual vitality of this race. For this mission they have courted untold sufferings through centuries, and for this mission they have still to work even when they are struggling for equality with men. They must stand firmly as ever on the basic structure of chastity, and bring the other wing to the same level with them. This will also be achieving equality—perhaps equality of the right type.

Of course, this will require a tremendous organized pressure from the feminine wing. For tyrants hardly know how to correct themselves unless they are forced to do it. Yet this has to be done for the very life of the society. In Hindu women lies the force before which men will have to bend their knees. Once Hindu women, conscious of their supreme mission of preserving the spiritual balance of their social life, assert themselves, their organized action is sure to bring the erring section of Hindu men within the necessary limits of moral law and order.

Anyway, one need hardly doubt that the future of Hindu society is in the hands of its women. Much depends on how they move on. Their path ahead is obscured by the mist of confusion regarding fundamental ideals. For the very life and well-being of society they have to step forward very cautiously along the path in which there is a healthy combination of both the ideals of chastity and equality. That alone can and will solve many of the pressing social problems of the day. If they forget for a moment their age-old mission and thoughtlessly take a step in the wrong direction, they will incur the risk of

missing their footing and dragging the entire society down to the abyss of cultural death. They should beware of this danger and proceed very cautiously. Instead of confusing the issues and rushing to give up their sacred role of protecting the spiritual life of society, Hindu women should strenuously strive to compel the frivolous section of Hindu men to climb down from the dizzy heights of pleasure-seeking. This will give Hindu society a fresh lease of long and healthy life by purging it of many of the abuses that have crept into it through the passage of time owing to its 'failure to grasp' one of the very fundamentals of its existence.

SHAFARI'S LOGIC

[*Vidyarthi, Agrahayan 1338*]

Shafari was a society star. He was a redoubtable man. His speech was all fire and his writings brimstone. He had a very fine pose of a rationalist, and he loved always to be original. He was up in arms against whatever had anything to do with traditional belief. And so wonderful was his command over arguments that he could easily prove and disprove things just as he desired. Even well-observed and established facts would be blown up by Shafari's logic. Before the volleys of his arguments, there were few who would not become literally thunder-struck.

One day Shafari was listening to a friend's narration of a recent visit to Benares. As soon as the friend said that the turret of the Viswanath temple had been found covered with real gold, Shafari knit his eyebrows, puckered his lips and said solemnly, "Nonsense! there cannot be any such temple in Benares. I am not such a fool as to swallow whatever you may say. Well, gold is not so cheap a commodity as you think. If there be so much gold on the turret of a temple in British India,—then why has the British Government given up the gold standard? Surely you make me laugh. Better try to entertain some village grannies with your silly story."

The friend was rather a simple man. He became absolutely nonplussed at this unexpected explosion of rational thought. Still he pulled himself up and said with some emphasis, "Well, this is no story. I have seen gold there with my own eyes."

Instantly followed a very polite rejoinder, "My dear

friend, how can you believe your eyes? Our vision often deceives us. I am sure you were under the spell of an hallucination. At the present moment there cannot be a single grain of gold outside France and America. So it is quite clear that you must have been dreaming when you made this precious observation."

This time the friend became really helpless. Yet he made another effort by saying, "Well, I am not the only person that has been to Benares. Ask anyone who has visited that temple. Everybody will tell you what I have said. Obviously, whoever goes to the temple cannot be supposed to be befooled by hallucination."

At this Shafari burst into a sardonic laughter and remarked with an air of hauteur, "My dear sir, don't try to cow me down by your volume of opinion. There are thousands who would pass through a desert and invariably mistake a mirage for a lake. Very few people indeed can properly use their eyes. The evidence of one such man outweighs that of millions of fools. And I am sure no such man will ever think of saying that there is gold on the turret of the Viswanath temple."

The disconcerted friend silently rose from his seat and before taking his leave put in very humbly, "I wish you could go to Benares yourself and verify the truth of my statement by your own cautious observation."

At this Shafari turned up his nose, shrugged his shoulders and blurted out, "I have no time, my dear sir, to go on a fool's errand. When my reason refuses to accept such an absurd story, why should I spend my precious time, energy and money after a wild-goose chase? No, no, I cannot waste my energy even for the fun of pricking the bubble of your hallucination."

The friend naturally gave way before this master-stroke

of rational thinking. So he uttered a simple "Thank you" and left the place. On his way back he kept musing, "Perhaps it would be better if I could deal a blow or two on Shafari's nose. My fist would certainly succeed where my lips failed."

II

Sir Oliver Lodge perhaps wonders why his invitation to scientists for a careful study of spirit phenomena should go unheeded. Perhaps he will find an answer if he turns to the following page from Shafari's brilliant diary.

"Yes, there was a day when people used to believe in spirits, ghosts and hobgoblins. That day, however, thanks to the army of scientists, has vanished with the dark ages. Modern civilization has taken the scales off our eyes, and we can see clearly what is what. Well, life is a function of the protoplasms in a living cell, and mind is at best a bye-product of chemical changes in the contents of the brain. So it is quite clear that there cannot be either life or mind outside a physical body.

"Of course, Sir Oliver claims to have observed phenomena of life and mind in so-called spirit-bodies. But I am absolutely sure that the poor old scientist has been duped by a set of wily impostors, or obviously some cells of his own brain must have gone out of order. Surely none but cranks can seriously believe to have seen such absurd phenomena.

"Sir Oliver has invited scientists to verify his statement by observing some seances under test conditions. Too good of him, no doubt, and scientists ought to thank him for this kind invitation. But he should remember that scientists have very little time to spare for satisfying the idle curiosity of a crank; they will more profitably make

a careful study of the derangement in Sir Oliver's brain, when that will be available."

In a recent Centenary meeting of the British Association Sir Oliver Lodge has predicted before an assembly of noted scientists that the day is fast approaching when science will discover the fact that interstellar space is filled with life and mind.

This news was promptly entered into Shafari's diary with the following remark:

"What a splendid augury this! Perhaps in the next Centenary of the British Association cards will have to be sent out all round the interstellar space inviting the departed members of the Association for taking part in its deliberations. I wish the Royal Society could find a degree of crankhood for Sir Oliver."

III

One day Shafari was listening to the following discourse on modern science. He waited patiently right up to the end and gravely surveyed the startling disclosures.

"In course of this new-born century positive science has given fair promise of becoming negative. Sir James Jeans, a plenipotentiary of the realm of modern science, has already sent out a message to the effect that science, so far, has been studying shadows on a four-dimensional continuum of a reality of much higher dimensions. Thus with one sweep Jeans brushes aside the scientists' claim of having brought reality within their sure grasp. Science has been facing shadows so long and not reality.

"The nineteenth century scientists were firm in their belief that they could explain the entire universe with nearly seven dozens of elements and half a dozen elementary forces. To them the universe was nothing but a

huge machine composed of myriads of atoms played upon by material forces, and every step forward was determined accurately by the previous state of things.

"But before the brilliant charges of Soddy and Rutherford, Bohr and Einstein, Schrodinger and Heisenberg, the machine has tumbled down like a pack of cards. The constituent units, namely, the atoms, have given place to electrons and protons, which have so far successfully eluded the chase of scientists. They have been observed to be like charges of negative and positive electricity, behaving in a droll fashion, sometimes resembling particles and sometimes waves. The queerest conduct, however, of these tiny units of the material universe is that their position and velocity appear to lie on two different planes. If you lay your grip on one, the other slips through your fingers.

"No wonder, therefore, that Sir James Jeans says that scientists have been dealing so long with the behaviour of shadows and not of reality, which obviously belongs to a different plane. Jeans goes so far as to guess that the material universe is perhaps built up of something like mind-stuff. As a matter of fact, he confesses that his scientific vision is more akin to Berkleyan philosophy than to nineteenth century science.

"What causes the break-up of the radio-active atoms is still a mystery. Why does one particular electron out of thousands fly off from atoms of uranium and radium to join the army of alpha particles radiating from them? No external agency, not even the cosmic rays, has yet been found responsible for knocking out the electrons. What pulls the trigger within a radio-active substance, and what determines which shot will be fired first—these puzzling questions are remaining unanswered. And if no

satisfactory explanation be forthcoming, the fate of the deterministic theory is doomed.

"Then again, the accepted theory that an atom absorbs a whole quantum of energy leads to a similar puzzling situation. What is it that determines which particular atom will absorb the quantum of energy? The determination in all such cases appears to be more of a volitional than of a mechanistic character.

"So it is no wonder that Sir James Jeans has been bold enough to say that 'the universe begins to look more like a great thought than a great machine'."

After the discourse was over, Shafari left the hall quietly, walked up to the nearest broadcasting station and sent out the following precious message:

"Scientists beware! A wave of lunacy is just now passing through the laboratories of the world."

IV

"Do you think that I am still in my swaddling clothes, and that you can with perfect ease force down my throat whatever you want to make me swallow?"—snarled Shafari before a divine, who had just made a mention of God in course of his conversation.

Not knowing that the art of disproving God was a feather in Shafari's cap, the theologian mildly enquired, "Do you seriously mean to say that you do not believe in the existence of God?"

Shafari — "Most certainly I mean to say that."

Theologian — "May I ask why?"

Shafari — "Of course you are perfectly at liberty to make that query; and my answer is quite simple. Simply because God is unscientific and illogical, I can have no faith in Him."

The theologian became interested and asked very politely, "May I know how you prove that God is unscientific?"

Shafari was waiting for this. He at once shouted at the top of his voice, "Unscientific, because the scientists have not yet been able to give us a chemical composition of God." Discharging the first volley Shafari straightened himself and sat akimbo staring imperiously at the divine.

The divine was flabbergasted. However, he paused for a while and said, "I think, dear sir, you will do well to look at things through a pair of up-to-date glasses and not through your nineteenth century spectacles. Have the scientists as yet given us the chemical composition of a single reality? They have been so long studying the composition of shadows. Molecules, atoms, and even your electrons and protons are no more than shadows of reality on a four-dimensional continuum. Science, according to the confession of its own sponsors, has not been able to approach reality. So God, being unscientific in the sense you mean, may yet have the glory of being real."

Shafari was not quite prepared for this. Yet he stuck firmly to his gun and let go another volley, "My dear sir, don't you talk about modern science. I have, indeed, a very poor opinion of it. The scientists of this age are surely making a muddle of science. Their babel about electrons and protons, relativity and any number of dimensions is making Dalton and Lavoisier turn in their graves. Look here, whatever your modernists may say, you must admit the fact that God is unscientific at least because the reality of God has not been established by the scientific methods of experiment and observation."

Amazed at the swiftness with which Shafari had tilted

the angle of his gun, the theologian said with an emphasis, "It is precisely through observation that God has been realized. Just as you see a star through telescope, so you can realize God through a pure mind."

"There you are," said Shafari, "that is just what I have been driving at. Your God is to be seen through a mind. So God must be either a dream or an hallucination. For one cannot possibly see anything else through one's mind."

The theologian calmly observed, "Even 'the objectivity' of all things 'arises from their subsisting in the mind of some Eternal Spirit', as Sir James Jeans has put it. The physical universe is a manifestation of the cosmic mind. So please don't talk lightly of the potency of mind. I do repeat with all the emphasis that I can command that through one's mind alone, when purified, one can get a glimpse of reality. This is a statement of fact, and it has been tested times without number. And it is open to verification by your own observation as well."

This time Shafari made a terrific explosion, "How dare you ask me to verify a myth? Have I no other business on earth? I am not a Tom, Dick or Harry. I have plenty of things to do. I cannot spend my precious time simply to make a fool of myself by taking up an absurd experiment."

The theologian appreciated Shafari's rationality; still he made another venture, "Very well, I understand your position, so far as the unscientific aspect of God is concerned. Will you now be pleased to explain how God is illogical?"

With the air of a victorious general, Shafari replied, "My position is always very clear, and you will have absolutely no difficulty in understanding it. Now, regarding your query, I think it will suffice to say that

the word 'God' has neither connotation nor denotation, because no substance like God can either be deduced by syllogism or established by inductive methods."

The theologian put in very courteously "But, my dear sir, the reality of God is an well-observed fact. God has been realized by all seers, and His existence may be proved by direct experience by anyone who seriously wants to do it. So the fact of His existence rests on inductive methods as much as any other fact."

"Will you please stop mentioning your God and His existence?" roared Shafari. "This simply gets on my nerves. I can never stand any mention of God, who is most obviously both unscientific and illogical."

The theologian realized that he had been jostling with a veritable frog-in-the-well by mistake, and swiftly retired from the place. He remembered the sage maxim of Vedanta, "One must not try to settle by arguments matters that lie beyond the reach of the intellect."

SCHOOL DISCIPLINE

[*Shiksha* (*U.P.*), *July 1949*]

Boys in a class have to be attentive, orderly, and obedient to the teachers. This is essential for good class-work. The first task before the teacher, therefore, is to see that he can maintain good discipline in the class.

How to maintain this discipline is a problem. Teachers have two opposing methods open to them. The one is the method of terror, and the other that of love.

Law and order in a state have been found to be established either by striking terror into the hearts of the people by a brutal display of power and authority, or by winning their hearts through a sympathetic understanding of their grievances and loving care and attention in removing these. Of these two methods, the method of terror is taken recourse to by people in authority, simply because, at first sight, it appears to be easy and effective.

But the history of mankind has proved conclusively that the doctrine of terrorism defeats its own end in the long run by alienating the minds of the oppressed from the authorities and driving them to a point of rebellion. This method, moreover, tends to emasculate the subjects and brutalize the authorities. It is demoralizing to both the parties concerned. It is anti-social in its effects in so far as it directly tends to breed hostility between man and man and give rise to human suffering. Says Alexander Bain: "Authority, government, power over others, is not an end in itself; it is only means. Further its operation is an evil, it seriously abates human happiness." This is why this method, though common in ancient and

medieval statecraft of Europe, has been banned by most of the modern states, and the gulf between the ruler and the ruled is about to be bridged. Bain observes, "By degrees we have become aware of various errors that ran through the former methods of discipline in the several institutions of the state, as well as in the family. We have discovered the evil of working by fear alone, and still by fear of painful and degrading inflictions."

Even in jails, people are beginning to think seriously of introducing humane methods. Reform of criminals through terrorism has been found to be an absurd proposition by some of the modern states. The problem of jail reform has actually thrown open a new field of research. Experimental psychology is being applied to study the inner workings of the criminal mind and to discover effective remedies. The angle of vision of the modern man has changed considerably. Humanity is becoming conscious of the infinite potentialities of man and of its duty of giving each individual proper scope to manifest its inner perfection. Writes J. J. Findlay, Professor of Education, University of Manchester: "The adult community is taking upon itself not only the burden of children but also of those classes of the community, who, although no longer children in age, remain children in morals or in intellect. The great army of the criminal, the abnormal, the defective and the insane, stand on the same footing in education. They are children and they demand from the community the same pity, the same training and teaching, the same control and restraint, which we afford, to our little ones. Blessed are the weak, for they, too, shall inherit the earth."

In the semi-barbaric stage of Western civilization,

when the terroristic method was freely used by the rulers of states, feudal lords, and other dignitaries, and even by religious and social reformers it is no wonder that this method was made the very hinge of school discipline as well. It was only in the nineteenth century that the dictum, 'spare the rod, spoil the child' was seriously questioned. The new attitude towards repressive measures affected the school as much as other institutions of state. Bain, in the last quarter of the nineteenth century, wrote of this new attitude in his 'Education as a Science': "The philosophy of society now endeavours to formulate the limits to authority and to the employment of repressive severities. Not only is authority restricted to the mildest penalties that will answer its purpose, but its very existence has to be justified in each case that arises. So far as circumstances allow every one in authority should assume a benign character, seeking the benefit of those under him using instruction and moral persuasion so as to stave off the necessity of force."

Teachers began to realize the fact that their relation with pupils was something different from that between the rulers and the ruled, and that a sympathetic understanding of pupils' need and capacity was to play an important part in education. The business of thrusting information through a terroristic discipline began to give way before that of drawing out the pupils' potentialities through loving and sympathetic help. In many of the Western states corporal punishment in schools came to be prohibited by legislation, and in many others severe restrictions were put upon its use.

The pupil is to be helped to grow. For this the mood of attention and application has to be worked up in the pupils' minds. Many contrivances have been made to

converge towards this end. Healthy physical surroundings, tact and personality of the teacher, effective methods of teaching, varieties of reward and punishment, are made to evoke, charm, cajole, compel this attitude of attention and application.

The teacher has to find a way to the pupil's heart; for then half the battle is won. If a teacher can create interest in his lessons, maintain a dignified yet amiable disposition, and remain in a mood of helping and not of ruling the boys, he will have very little difficulty in winning the love and reverence of the boys. And obedience is certainly of the best form when it proceeds spontaneously out of reverence for the teacher. The teacher's personality is indeed a mighty factor. Its effect, of course, is in proportion to his power of combining a stately, imposing and dignified bearing with a 'likeable exterior, a winning voice and manner, a friendly expression.'

The teacher has to be careful of his own movements before he can expect to control the movements of his pupils. A teacher sitting erect or standing all the while without any sign of restlessness, and talking neither too loudly, nor rapidly, nor lavishly, can by his posture and speech alone induce a good deal of concentration in the pupil's mind. Boys have an instinctive regard for a man of principle. Teachers careful about their dress, manner, speech and movements, and serious about making their lessons easy and interesting, will find class-management an easy affair.

Oscar Browning's (Principal of Cambridge University Day Training College) caution to teachers is worth quoting in this connection: "Remember that the class over which you are placed has implicit confidence in you, looks upon you as the standard of truth and justice, and

assimilates itself to the model you place before it. Endeavour to retain and strengthen this confidence and do nothing to forfeit it. Be sympathetic with the young natures you are set to guide along the thorny paths of knowledge and let mercy always season justice. Try to cultivate by your own example the high principle of 'work for work's sake' and develop the ideas of honour and duty as the best education you can give your pupils. Be friendly with them without lapsing into familiarity, and sometimes unbend from the high position in which you are placed. A brow of severity is not always needed ....Secondly avoid illicit punishments. If you are not allowed to inflict corporal punishment, limit yourself to the method allowed you. Other punishments are degrading to you and may be injurious to the class."

The fear of punishment is the worst incentive to growth. It tends to make the boys either timid, cringing, and servile, or sullen and rebellious. Rousing a sense of honour and duty, creating interest in lessons through proper methods of teaching, and even stirring up the potent desire of gaining distinction and surpassing others through place, praise and prize—all these together with the teacher's personality should be made to substitute punishment as far as practicable. Self-confidence, self-reliance, self-respect and even self-assertion to a certain extent have to be cultivated with great care—for these are the very tissues of manhood. Fear is weakness; it should not be allowed to take root in the pupils' minds. Let them become absolutely fearless, if possible, and yet learn to behave properly from a sense of honour and duty. This is the frame-work of sound character, and teachers should strive to help each pupil to rear it up.

Yet necessity of punishment will certainly arise. But

in this connection one should always remember that "It is a rule in punishment to try simple penalties at first; with the better natures the mere idea of punishment is enough; severity is entirely unnecessary. It is a coarse and blundering system that knows of nothing but the severe and degrading sorts."

The first and often the best form of punishment is reproof. Simple forms of disgrace in the shape of shameful positions and humiliating isolation come next in order. Confinement and detention from play are mighty correctives for refractory elements. Social boycott by his fellows is perhaps more cutting than any amount of flogging. Tasks or impositions are the usual punishments of neglect of lessons. Bain writes: "With all these various resources ingeniously plied emulation, praise, censure, forms of disgrace, confinements, impositions, the necessity for corporal punishments should be nearly done away with. The presence of pupils that are not amenable to such means is a discord and an anomaly; and the direct remedy would consist in removing him to some place where the lower natures are grouped together. There should be reformatories, or special institutions for those that cannot be governed like the majority . . . There should be no difficulty in sending away from superior schools all such as could not be disciplined without the degradation of flogging."

It should, however, be noted in this connection that according to the latest findings of experts the correct psychological approach to the problem of ensuring discipline is to stir up voluntary efforts of the pupils for some form of self-rule. Dr. Montessori observes: "The child who has never learned to act alone, to direct his own actions, to govern his own will, grows into an adult

who is easily led and must always lean upon others." The growth of real manhood, therefore, demands that discipline should be self-imposed as far as that is practicable.

The prominent traits of the children and adolescents should be utilized for encouraging, particularly in residential institutions, self-imposed discipline. A fair share of the school administration may very well be left to them in order to wake up their sense of responsibility. They may have their own courts for trying the delinquents. They may be trained in democracy as well by letting them have committees for organizing social functions, such as looking after games and sports, nursing the sick and attending guests.

It is interesting to note that the pupils' vows, the inspiring influence of the teachers' character and other environmental factors associated with the ancient Gurukul system were psychologically correct, as they tended to rouse voluntary efforts for self-control. The revival of that system as far as that is possible under modern conditions deserves our serious attention and endeavour.

NEW ERA OF SPIRITUAL RENAISSANCE

[Concluding presidential speech at the All-Orissa Religious Convention held in connection with the Sri Ramakrishna Centenary Celebrations at Cuttack in 1936]

Ladies and gentlemen,

To speak anything at this stage of the meeting is surely to inflict so much hardship upon you all, and this is why I think I should take only a few minutes to say just a few words by way of concluding this function. I do not know how to thank adequately the organizers of this Centenary Celebration at Cuttack for the very nice conception and very skilful and smooth execution of this grand Religious Convention. I believe their efforts have succeeded completely in leaving a permanent impress upon the minds of all who have come to attend this function. Then let me express my feelings of love, respect and compliments as well as gratitude to all the speakers who have very kindly taken the trouble of attending this function and enlightening us on so many precious themes in connection with the different creeds and religions represented in this Convention.

No doubt it is very difficult for all people to get beyond sectarianism and communal grooves while thinking or talking about religion, but it is to be admitted that from the hoary days of the Vedas that declared: "Ekam Sad Vipra Vahudha Vadanti" (Truth is one: sages call It by various names) humanity has been striving to a considerable extent to respond to a genuine note of universal religion, whenever that has been struck by religious sages or prophets. In our age, that note of universal religion has again been struck very clearly and intensely

by Sri Ramakrishna, and this is why we find that so much enthusiasm has been aroused through the length and breadth of India by his life and teachings on the occasion of his Birth Centenary. Well, you may say, "We are Indians; spirituality is the key-note of the mission of our national life, and hence there is no wonder that the highly spiritual life of Sri Ramakrishna has generated a sympathetic vibration." But what about the foreigners who have by thousands flocked to the Birth Centenary Celebrations of Sri Ramakrishna? So we have to think seriously of the significance of this rather astounding phenomenon that has occurred almost in every part of the world.

We are Indians. Naturally, India looms large before our eyes. But we have to remember that however large India may look due to our natural liking for our country, our traditions and culture, the fact cannot be denied that to the vast mass of humanity this country is no more than a tiny dot on the world's atlas. Little do they know about us, and much less about our culture and tradition, and unfortunately there are some among the foreigners who really carry a very poor impression about us and our culture. They look upon India as a poor wretched country peopled by dark savages, who have to be reclaimed, civilized, taught to talk and behave like human beings.

Yet, in spite of this meagre knowledge about India, inspite of the mistaken notions and consequent scorn and contempt of some of the foreigners, it is a fact as clear as daylight that some of the prominent thinkers of modern Europe, and hundreds of scholars and savants from almost all the big continents of the world have rallied in this Birth Centenary Celebration

of a poor Brahmin priest of the nineteenth century who came from an out-of-the-way place in Bengal. Obviously, there must be something in Sri Ramakrishna's life and teachings that appeals to the heart of humanity. He must have expressed in simple language some universal ideas that pierce through the hard crust of creed and colour and touch the very core of the heart of humanity. This is why the late lamented French savant Dr. Sylvain Levi rightly observed that as Sri Ramakrishna's heart and mind were for all countries, his name was a common property of mankind. Because Sri Ramakrishna really lived for the whole world, his message produces an echo in the mind of every blessed individual of the human race. His religion represented a synthesis of the ancient and the modern outlook. As a matter of fact one can look upon him as the very personification of the spirit of catholicity, and hence if we reflect on his life, I think the very object of this Convention goes a long way towards fulfilment. He by his deep and extensive realizations reinvigorated the teachings of ancient seers and prophets, and stamped them with the fresh hallmark of truth. He has ushered in a new era of spiritual renaissance. Faith in religion has been revived by his life, which was actually lived before our very eyes. When the world was beginning to doubt the authority of the scriptures, question the very authenticity of the truth of the ancient teachings, Sri Ramakrishna revived the faith of humanity in the ancient wisdom.

Let me recount a few of the fundamental lessons he taught, which do not belong to any particular creed or religion, but which really represent the very essence behind all religions and creeds. I shall review only a few lessons of this character before you by way of

appropriately concluding to-night's function. The first lesson that we learn is that God is real. This is nothing new. Indeed, he did not come to preach any new lesson. He simply revived and added weight to the old lessons that were about to be swamped by the free thinking of modern 'enlightened' humanity. God is real, nay more real than anything else. As a matter of fact, the reality of everything else is only a manifestation of His reality. The second lesson that we learn from him is that God can be realized by man. Man can see God, touch God, talk with God. In fact, realization of God is the very goal, the consummation, towards which all human beings are advancing consciously or unconsciously, and realization of God is the consummation towards which we should continuously advance, because this alone can bring us peace and blessedness both in individual and collective life. And, mind you, this realization of God should never be confused with hallucination, as may be suggested by modern men who deal with mental science, because there is a great distinction between the two. Hallucination is only a trick of the mind, and takes us nowhere, whereas God-realization has a permanent value. It gives us eternal freedom. For realizing God one can take up, one can follow, any of the courses described by the ancient prophets and pointed out by the various existing creeds of the world. There is absolutely no question of traditions. There is perfect uniformity and unanimity so far as the essence and goal of religion are concerned.

Then we learn perhaps the most magnificent lesson, viz., that the value of human life is to be measured by the degree of its spiritual progress, and not by its material or intellectual achievements. Hence culture of the spiritual

life with all sincerity should claim our attention more than anything else on earth. One should never think that such an outlook will stand in the way of material progress, because, far from it, this outlook will help us to improve the state of things about us in other departments of our life—materially and intellectually as well as spiritually.

From these few lessons it is clear that Sri Ramakrishna's life and teachings in short tend to turn our minds towards God, and this is exactly what is needed at the present moment to lift humanity from its present state of chaos and confusion of ideals. Such a life of blessing and spirituality has been lived before our eyes, and let us stand to-day with bowed heads in memory of that life and pay our reverence to the different religions and creeds of the world. Let us take a start from now to secure the blessings of a spiritual life along with the other opportunities of this sphere, and proceed with firm resolve towards the attainment of God, the Supreme Light of infinite bliss. Then alone can our cares and anxieties cease, and then alone can religion create an atmosphere of peace and amity all over the earth. With these words I declare the Convention closed.

STRAY THOUGHTS

[*Vidyarthi, Puja Number 1341*]

The world is not so big now as it was even twenty years back. Flying through the air at a tremendous speed is now an established fact; and this alone has practically squeezed the globe into a smaller and more compact thing. Distance, surely, is a relative concept; greater speed means shorter distance.

Just fancy those days when people had practically to make their wills before setting out an a journey to the holy city of Benares from a Bengal village. Isn't it surprising to find the same holy city within the reach of a few hours' flight from Calcutta? With a favourable schedule, you can now go to Benares in the morning, take your bath in the Ganges, pay your homage to Viswanath and come back to Calcutta in the evening, if you so desire. And this is not a fast trip.

If you have, say, three weeks at your disposal, you can make a holiday trip to London by air, stay there for about two weeks and come back in time to attend your business. (Now it takes less than nineteen flying hours, including stoppage.)

Provided you have enough money to meet the expenses, you can fly about the world like a butterfly. Even the consideration of money is tending to be less serious. The time may not be very far when a flight round the world will come within the range of practicability of a man of moderate means.

The aeroplane can go straight as the crow flies and move at a tremendous velocity. Naturally trains, steamers, motor cars and all other means of locomotion appear to

be very poor things indeed! And what would you think of bullock-carts?

Yet people are not satisfied with the present speed of aeroplanes. Occasional races are being held to give an incentive to experts for attaining greater speed. Isn't it simply amazing?

* *

Yet this is not all. Scientists are determined to reduce distance by various other means. Take for instance the miracle of the radio.

If you shout at the top of your voice, how far do you expect your voice to reach? Well, not more than a few hundred yards. But with the help of the wireless apparatus your speech can be broadcast all over the world. A concert in Brazil or a speech in America is distinctly audible in Calcutta.

How many men can you possibly address in a meeting? Well, if you possess a very loud and distinct voice you can, at the best, command an audience of two thousand. But with the help of the radio a leader can be heard by every member of an entire nation.

Yes, it is possible for you to hear your friend talking at the other end of the world. Naturally you will like the idea of seeing him as well. It will be nothing less than a miracle if you can converse with your friend in America and see him as well. Yet this is fast becoming a fact through the blessings of television. Perhaps in course of the next few decades it will be quite a common affair for a Calcutta journalist to watch the proceedings of a meeting of the House of Commons in London, without stirring an inch from his own office.

Thus under the magic spell of science the world is tending to become a small and compact thing. People inhabiting different continents can now very well look upon one another almost like next-door neighbours.

Indeed, no flight of imagination is any longer required to think of the world as a single house built for the residence of one human family. Just like the different compartments of the same house, each section may have some special physical features (including complexion) and a bundle of special habits. That rather breaks the monotony and adds to the beauty and grandeur of the human family. Dark, brown, yellow and white complexions really produce a wonderful harmony, if we look upon the entire human race as one complete whole. As science is forcing upon us the idea of the compactness of the world, let us train our spiritual vision to realize the fundamental unity of the human race.

The Divine Mother like a master artist, has designed this beautiful world and filled it with the human race (as also animals, plants and minerals). It is by Her will that the scientists are bringing about their miracles. It is by Her will that the idea of universal brotherhood is dawning upon the consciousness of man. Let us all bow down at Her feet with deep reverence and pray for the spiritual vision that may enable us to look upon all Her children as our brothers and sisters.

A FOREWORD

[*Vidyarthi, Puja Number 1346*]

...We all know how during the Durga Puja day the members of a Bengali family rush from distan places to their home for a hearty union. It has beer therefore, quite in the fitness of things that the ol and new students of our Home have rushed to mee though not physically, through the Puja Number of th 'Vidyarthi'. Yes, this Puja Number has sealed a sort c intellectual union of all the members of this Home old and new...

The present issue enriched by contributions fror ex-students somehow takes our mind back to the pas of the Home. Different batches of students appear t pass before our view. All those, who at one time o other came within the orbit of this Home, seem to b related to us for life. Yes, a golden thread of love an unity ties them securely with the present and eve future students of this Home.

I refuse to call them ex-students. It pains me. Th word has a ring of pathos in it. The particle 'ex' suggest a thing of the past—a rather painful severance fror the present. Well, some may say that their student-lif is a thing of the past, that they are no longer student and that this is why they are fittingly called ex-students True. But why insist so much on the student aspect c the thing? Can't we look upon them as members of thi Home? In that case there will be no chance of tha particle 'ex' coming in and putting up a wall o separation. Everyone who had occasion to spend a portion of his student-life within the range of this Hom

influence is a member of this Home, obviously a member for life. Is it not absurd for anybody to call himself at any time an ex-member of his own home? A bond of union lasts through life, unless, of course, it is transcended by Sannyasa or snapped unfortunately by any heartless process of disowning. Well, the Students' Home may very well be considered as one's second home, to which he is tied for life by a bond of love. One may rather call it a spiritual home. Its membership extends in ever-widening rings. That goes to expand our heart. And this is the surest sign of spiritual growth.

In a way I may also claim to be an ex-student of this Home. Surely the oldest ex-student. This may appear to be news to many. Let me explain. I did spend a portion, in fact the last two years, of my student-life in a milieu that eventually has evolved into this Students' Home. The Home was then in its cradle. Not even baptized—it had no name. Yet the features of the Home were coming up, one after another, though in a hazy outline. Yes, I have no mistake about it—it was this very Home in its nursery. Indeed it is a pretty hard job to get at the exact source of a river. Much more so in the case of an institution.

Minute things elude our grasp. And, moreover, we are prone to ignore them. We have an innate love for big things. And for formal things too. Bulk, name, seal, printed rules and reports, committees and boards and all other things of the kind must come in to lift up an institution before we may possibly recognize it. Yet these are no more than trappings. They are only on the surface. Reality lies beneath these knick-knacks. It is an irony that the form of a thing captures our imagination and claims to be the only reality about it.

The body grows, changes. One is known by his body, his appearance. But more important than the body is its builder, the subtle life-force, the 'elan vital', which escapes our notice. A man's life-history begins as soon as a microscopic cell starts its mysterious process of body-building in an unseen region made secure by a mother's love and suffering. An institution too is a sort of organic growth. It also has a life-force which is more important and, in a sense, more real than its outer growth. As soon as it leaves, a gigantic institution will tumble down—a heap of ruins, a lifeless mass. The Students' Home came into existence as soon as its mysterious life-force started working by Divine Will.

This takes us beyond the nursery stage, even beyond the stage of the formal birth. It corresponds to the first stirring of life in the mother's womb. To be precise, the last days of my student-life were associated with this stage of the Students' Home. Hence, as sure as anything, I am an ex-student of this Home.

Being the oldest of the lot, I think I am entitled to give a lead to all ex-students who came after me in changing the rasping title of 'ex-student' by the sweeter one of 'member'. We along with the present students are all members of this Home, of a happy spiritual family, so to say. We have met together through the medium of the Puja Number of the 'Vidyarthi'. May the Divine Mother, in Her infinite Love, bless us all so that we may manifest the divinity within us.

A FEW LETTERS

[1]

[*Written to a devout follower of Islam*]

R. K. Mission Calcutta Students' Home
20, Harinath De Road, Calcutta
2-12-1944

Dear Sir,

Many thanks for your kind letter of the 20th ultimo that reached me only a couple of days back, after being censored in the way and redirected from the Publisher's address.

I fully appreciate your idea of bringing out a book illustrating the basic unity of Islam and Hinduism. I wish I could put in my humble service towards realizing this laudable idea. But, unfortunately, I find myself absolutely incompetent for the task. One must have a good first-hand knowledge of the holy texts of both the religions before one may make any venture in the line. As I lack this essential prerequisite, it is not for me to go in for this work.

Undoubtedly the work is a noble and much-needed one. A good deal of confusion and misunderstanding between the two major communities of India may be cleared by the process. Indeed, there is no doubt about the fact that there is perfect unity so far as the fundamentals of the different religions are concerned. When people will come to realize this fact, communal bickerings will vanish like a bad dream. Hence, any work that may help men all over the earth to grasp this fact is certainly a step in the right direction for ushering in an era of peace, amity and goodwill.

This is why I shall really be very happy if you can find out the right person for working out your noble idea. Of course, it may be rather difficult to find a capable person versed in the holy scriptures of both the religions. If such a writer be not available, may I suggest an alternative? A book on Islam on the lines of 'Hinduism at a Glance', illustrating how the fundamentals of Islam are in unison with those of Hinduism, may serve the purpose. And this should issue from the pen of a devout follower of Islam, for that will give it the necessary sanction. From your letter it appears that you have the necessary competence for taking up such a work yourself. If you undertake this work you can, of course, count upon my humble assistance, if that is at all necessary.

I must thank you over again for your kind words of appreciation conveyed through your letter.

With sincere love and best regards.

Yours sincerely,
Swami Nirvedananda

[2]

[*Written to a Civil Judge, Poona*]

R. K. Mission Calcutta Students' Home
20, Harinath De Road, Calcutta
15-5-1946

Dear Sir,

Many thanks for your kind appreciation of the book 'Hinduism at a Glance' through your letter dated 28-4-46.

Yes, I 'really believe what is written in our Shastras about the Siddhis.' Sri Ramakrishna as well as Swami

Vivekananda seems to have given a fresh sanction to such belief. Once Sri Ramakrishna offered all the Siddhis to Swami Vivekananda, who refused to accept them when he learnt from the Master that the Siddhis were of no value to a spiritual aspirant and that they rather proved an obstacle on the path of spiritual progress.

Swami Vivekananda's 'Raja Yoga' explains the possibility of developing supernormal powers. As a matter of fact, Swamiji himself demonstrated in his life, though on very rare occasions, the validity of supernormal powers like television, prevision, transmitting spirituality by a touch, etc.

In the lives of Trailanga Swami and Bhaskarananda Swami of Benares we get numerous instances of their display of many of the Siddhis.

I do not know of any living Siddha (possessor of Siddhis) at the moment. I have no desire to find them out.

Television, prevision, curing disease by mental power are facts recognized even in the Western world of this day. As a matter of fact, occultism has become a craze of some societies like the Christian Science Movement in Western countries. You may kindly look up the chapter on Belief in Aldous Huxley's book 'Ends and Means'.

Siddhis cannot be expected to replace science. They are extremely hard to acquire, while science is open to all. Supernormal powers wielded by a few cannot be expected to bring about a covetable state of things.

For solving any earthly problem, men may very well exert themselves to their utmost with their normal powers and seek the help of God, who is the source of all Siddhis, through earnest prayer. If by God's will any

one with Siddhis appear on the scene and solve the problem miraculously, surely it is a welcome thing. However, so long as we are faced with a problem, every one of us has to strive in his own way with all the powers at his command to solve the problem instead of idly awaiting the arrival of a person with supernomal powers for helping us out of the impasse.

Yours sincerely,
Swami Nirvedananda

[3]

[*Written to a European lady devotee*]

R. K. Mission Calcutta Students' Home
20, Harinath De Road, Calcutta
18-3-1953

My Dear Mrs. G—,

...From your letter I understand that you have not yet got back your usual liveliness. I wish I could restore it. I believe if you can hold out a little with patience, this phase will pass away quickly and by the grace of God you will find a source of pure joy in everything about you. Why should a pure soul leave the world of its own accord? One should resign oneself to the will of the Lord. He feels for us more than anybody else, and guides us towards the haven of peace. Particularly those who have come under the benign care of Sri Ramakrishna's children need not worry even if for a time the world seems to be insipid. It is just a passing phase of gloomy thoughts which is bound to be followed by a happy and peaceful mood. Believe me revered Swami Vijnanānandaji

Maharaj is holding you all the while and will protect you whenever you are in difficulty. I know you have a strong mind which will get over this troubled state within a short time.

Visiting sick and old people and playing on the Sitar seem to be excellent leisure-hour occupations that you have hit upon for chasing away the present ennui.

I hope to see you whenever you come to Calcutta and meanwhile shall be glad to hear from you from time to time.

With warmest affection and best wishes.

Yours in the Lord,
Nirvedananda

[4]

[*Written to a European lady devotee*]

R. K. Mission Calcutta Students' Home
Ram Babu's Garden
P.O. Sukchar, Dt. 24-Parganas
4-4-1954

My Dear Mrs. G—,

...Your report of that place (Sewagram) is really charming. They are striving to mould their lives after the highest human ideal and this is sure to generate a spiritual force that is so needed at the present moment for readjusting on right lines the affairs of the world.

I should like to interpret the Christ's picture referred to by you in a slightly different way. The bleeding burning heart shows how Jesus felt intensely for the pangs of the worldly people. This excruciating pain proceeded from a boundless sympathy which is the pre-

rogative of an Incarnation. But at the same time there can be no mistake about the fact that in this heart was the Kingdom of God with eternal peace and ineffable bliss. Otherwise how could he, while being crucified, ask God to forgive his persecutors?

Now the kingdom of God is within every one of us. Infinite bliss is the very character of our Real Self. Of course, one has to strive hard to have a glimpse of one's Real Self. The cravings of the mind have to be lulled; the little ego has to be blown up; and then and then only one can enjoy everlasting peace and beatitude. And all these can be had through Divine grace. For getting to that coveted goal all that we have to do is to resign ourselves completely to God's will. We are to think of Him, talk of Him, work for Him and accept His dispensation with equanimity.

Surely such an attitude cannot be had at one's sweet will. Even this requires continued patient practice, backed by firm determination. At one stage worldly things appear to be hollow and unattractive and the aspirant becomes subject to a wave of depression. He does not know that he has made a substantial progress towards spiritual development, for he has seen through the vanity of the world. Only the subtle cravings in his mind stand in the way of his mental peace. If he sticks to his spiritual practice a little longer, he is sure to get beyond this temporary slough of despondency and start enjoying bliss welling up from within.

Yes, we enjoyed our trip to Kamarpukur and Jayrambati. Perhaps you have seen in the papers how lady devotees inaugurated the Holy Mother's Birth Centenary by a Convention in the University Institute Hall on Friday last. Delegates have come from different parts of

India and they have a heavy programme of work. Many more will come from abroad in course of the Centenary year. Perhaps you know all these. I don't know whether you are joining the rest of the delegates during their pilgrimage to Jayrambati on the ensuing festival over there from the 7th to the 9th April.

This has been a pretty long letter. So I should now stop. I am all right. Trusting you to be your jolly old self,

Yours affectionately,
Nirvedananda

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬	১৫	লোকাঃ	লোকঃ
১১৩	৫	জ্ঞানিনাং	শুচীনাং